ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যি সত্যিই 'আনন্দরূপ' ছিলেন। 'আনন্দময়' নয়, 'আনন্দরূপ', স্বয়ং 'আনন্দ'। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈঃ উঃ ৩।৬।১)। ব্রহ্মই আনন্দ, আনন্দই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হয়েছিলেন, কারণ তিনি ব্রহ্মকে জেনেছিলেন— 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৯)। শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানেই যেতেন সেখানেই আনন্দের হাট বসে যেত। দলে দলে সেখানে লোক এসে জড় হত, কিসের যেন দুর্বার আকর্ষণ! আনন্দরূপের কথা শুনে আনন্দ, গান শুনে আনন্দ নৃত্য দেখে আনন্দ। তাঁকে দেখলে আনন্দ, তাঁর কথা চিন্তা করলেও আনন্দ। তাঁকে ঘিরে সর্বদা এক আনন্দের পরিমণ্ডল বিরাজমান। তিনি সব আনন্দের উৎস।

স্বামী প্রভানন্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন, তার কয়েকটিকে নিয়ে এই বই। 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ'—বইয়ের এই নামটি সার্থক নাম, কারণ প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-রূপটি সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হচ্ছে তাঁর আনন্দরূপ'। এই দিক থেকে 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। যে-দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখি না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভিনব, তা লেখকের ভাব ও ভাষার নৈপুণ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ চিত্র ফুটে ওঠে। বইখানি সব শ্রেণীর পাঠককে আনন্দ দান করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলিকাতা-৭০০০২৯

লোকেশ্বরানন্দ

আমার সমস্ত সারস্বত কর্মের প্রথম ও প্রধান প্রেরণাদাতা
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ
পরমপূজনীয়
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজকে
সর্বাঙ্গ প্রণাম।

নিবেদন

দুঃসাধ্য এক সেতুবন্ধন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ ও অতীন্দ্রিয় এক আন্তর জগতের মধ্যে সুগম সেই সেতুপথ। প্রাচীন ও নবীন, লৌকিক ও অলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও ঐহিক তাঁর জীবনসেতুতে সুসমন্বিত। সর্বদাই তিনি ঈশ্বরে আত্মস্থ। সমাধিস্থ ও প্রকৃতিস্থ দুই স্তরেই তাঁর স্বচ্ছন্দ সঞ্চারণা। সর্বদা ভিতরে তাঁর যোগস্থিতি, এমন কি যাবতীয় লোককল্যাণকর্মেও ঘটেছে তার আত্মপ্রকাশ। ফলে তাঁর জীবন কিঞ্চিৎ রহস্যাবৃত হলেও আনন্দঘন ও অনিন্দ্যসুন্দর। সাধন-ভজনে, পোশাকে-আসাকে, চলনে-বলনে সমগ্র জীবনচর্যাতেই তিনি অনন্যস্বতন্ত্র।

চিৎ-জড়ের সম্মিলনে বিরচিত এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জগৎ-মালঞ্চ। সেখানে মানুষের মাঝখানে, লোকায়ত এই জনজীবনের একজন হয়ে আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছেন প্রায় একান্নটি বছর। তিনি অকাতরে বিতরণ করেছেন আনন্দ। মহৎ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত নৃত্য নাট্য চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পের চর্চা আনন্দপিপাসু মানুষকে দিয়েছে অমৃতের স্পর্শ। জগৎ-মালঞ্চের চিৎ-জড়-গ্রন্থির রহস্য অপাবৃত করে বিরাজমান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ। অপ্রতিরোধ্য রূপশুদ্ধ শক্তিমান পরমপুরুষ। নূতন যুগের যুগপুরুষ। তিনি বোধে বোধ করেন যে, বিশ্ববৈরাজ্যের সর্বত্র অনুস্যূত পরমসত্য একটিই, সৎ-চিৎ-আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সত্যই 'অণোরণীয়ান্', তিনিই 'মহতো মহীয়ান্'। তাঁরই বিচিত্র স্ফুরণ, বাহ্য ও আন্তর জগতের সব কিছুতে। এবং তারই শ্রেষ্ঠ অভিপ্রকাশ মানুষের মধ্যে। চিৎ-জড়ের মেল-বন্ধনে বাঁধা মানুষ। সে জানে না যে তারই মধ্যে প্রসুপ্ত সেই পরমসত্য, সকল আনন্দের অমল উৎস। জানে না যে একমাত্র সেই সত্যের উপলব্ধিতেই জীবন চির আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে। এই স্বর্ণসম্ভব সত্য সম্বন্ধে বেহুঁসপ্রায় মানুষকে মানহুঁস করাই ছিল কল্যাণচিকীর্ষু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা, একক অন্বিষ্ট। শুধু তাই নয়। এ বিষয়ে মানবদরদী শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষমতানৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তাই বলেছিলেন, "পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে দিয়ে ভাঙ্গত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।" এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পী। জীবন-শিল্পীরূপেও গ্রহণ করেছে বিশ্বের মানব সমাজ।

দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র দুরবগাহী হলেও তাঁর সকল আয়াস-প্রয়াসের মধ্যে উৎসারিত হত অফুরন্ত উজ্জ্বল আনন্দধারা। স্থান কাল

ভেদে আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনন্দোৎসার যে কত বিবিধ বিচিত্র আনন্দাবর্ত সৃষ্টি করেছে তারই আংশিক পরিচয় অপটু হাতে পরিবেশনের চেষ্টা করেছি। এই আনন্দাবর্তে অবগাহন করে ও সদানন্দময় মহৎ জীবনের অনুধ্যান করে পাঠক যদি সামান্যতম আনন্দরস গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই লেখক নিজেকে ধন্য জ্ঞান করবে।

প্রায় পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ফাঁকে লেখক এই গ্রন্থের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছে। 'উদ্বোধন' 'বিশ্ববাণী' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তার এই বিষয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ। সেসময়ে কোন গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ছিল না। সেই নিবন্ধগুলির কয়েকটি সঙ্কলিত করে বর্তমান গ্রন্থ।

এই কাজে যাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণতম সহাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ, স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, প্রয়াত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী মহারাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। গবেষক অধ্যাপক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসুর উৎসাহদান এবং 'মাষ্টারমশায়ের' পৌত্র শ্রীঅনিল গুপ্ত, সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আলোকশিল্পী শ্রীব্রজকিশোর সিন্‌হা ও শ্রীপার্থসারথি নিয়োগীর বিবিধ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করছি।

শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট রচনা করেছেন। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারের ব্রহ্মচারী তরুণ ও তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য ভিন্ন এত অল্প সময়ে গ্রন্থ প্রকাশনা সম্ভব হত না। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা জানাই। প্রকাশক শ্রীঅরুণকান্তি ঘোষের তত্ত্বাবধানে প্রেসের কর্মিগণ সযত্নে ছাপানোর কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

প্রধানত স্বল্প সময়ে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য সমাপ্তির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু প্রমাদ থেকে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

এই গ্রন্থ থেকে লেখকের প্রাপ্তব্য সকল অর্থ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৃদ্ধ ও রুগ্ন সাধুদের সেবায় ব্যয়িত হবে।

স্বামী প্রভানন্দ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণের নামরহস্য

ধর্ম ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাবানুভূতির প্রধান আশ্রয়, সেই চিরন্তন ভাবানুভূতি আশ্রয় করেই বিংশ শতাব্দীতে এক অভূতপূর্ব সর্বভারতীয় জাগরণ ঘটেছিল, যে জাগরণ বিশ্বমানসে ক্রমেই বিস্তারলাভ করেছিল। এই জাগরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে আজ ইতিহাস-বিখ্যাত। তাঁর জীবন ও বাণীর অমোঘ প্রভাব উত্তরোত্তর এত বহুধা বিচিত্র ধারায় বিভিন্ন রূপে বিশ্বের আঙ্গিনাতে ছড়িয়ে পড়েছে যে বিস্মিত লেখক তাঁর জীবনকাহিনীকে বলেছেন একটি phenomenon—যেন একটি প্রতীতব্যাপার। এই সুমহান জীবননাট্যের যে নায়ক তাঁর নাম নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে।

কোন সন্দেহই নেই যে প্রথমদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে 'রামকৃষ্ণ' তাঁর পিতৃদত্ত নাম। কিন্তু কালক্রমে অনুপ্রবেশ করে সন্দেহের বীজ। এবিষয়ে সম্ভবতঃ তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়রামের অবদানই প্রধান। কিন্তু অধিকাংশ অন্তরঙ্গ ভক্তের মনের ভাব ছিল, "দর্শনেই কৃতার্থ, আমাদের পক্ষে নামতথ্য উত্থাপনে কৌতূহল হয় নাই।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, পৃঃ ৬৩) শ্রীরামকৃষ্ণ নাম কে দিয়েছিলেন, এবিষয় নিয়ে কেউ তখন তেমন মাথা ঘামাননি, প্রয়োজনও বোধ করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে কি অন্তরঙ্গ মহলে কি বাইরের পরিবেশে তিনি 'পরমহংস' নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রথমদিকে পত্রপত্রিকাতেও উল্লেখ থাকত Ramkrishna, a Hindu devotee known as a Paramhamsa. (The Indian Mirror, dated Feb 20, 1876) আরও উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—'শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস' (ধর্মতত্ত্ব ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭), 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' (ধর্মতত্ত্ব ২৮ জানুয়ারী, ১৮৭৮), 'শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস' (সুলভ সমাচার, ২৯ এপ্রিল, ১৮৮২)। কিছুকাল পরে দেখা গেল শুধুমাত্র 'পরমহংস' বা 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস' শব্দের ব্যবহার। যেমন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ধর্মতত্ত্ব লিখলেন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের অত্যন্ত

কঠিন রোগ।' ঐ পত্রিকা ২৮শে এপ্রিল তারিখে লিখলেন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয় অপেক্ষাকৃত অনেক আরাম হইয়াছেন।' নামের ব্যবহারের যে পরিবর্তন এবং সেইকারণে সম্ভাব্য ভুলভ্রান্তির যে সম্ভাবনা তা নিরসনের জন্যই যেন The Indian Mirror, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় পরিষ্কার করে লিখলেন, 'Ramkrishna Bhattacharji, better known in the Hindu community as Paramhamsa of Dakshineswar'. নতুবা সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র 'পরমহংস'ই প্রচলিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সংবাদ। সেখানে পাই, 'পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়।' 'পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য্য ছিল', 'পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন।' ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'বেদব্যাস' লিখেন, 'তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে...' 'ক্রমে পরমহংসের অল্প অল্প বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল' ইত্যাদি। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় 'সখা' পত্রিকাও লিখেন, 'পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, 'ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন।' ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার The Theistic Quarterly Review, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যাতেও সাধারণভাবে শুধু 'পরমহংস' ব্যবহার করেছেন, যথা, 'Each form of worship···is to the Paramhamsa a living and most enthusiastic principle of personal religion.'

তারিখ অনুযায়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অনুসরণ করলেই দেখা যাবে প্রথমদিকে উল্লেখ রয়েছে, কেশবচন্দ্র বলছেন 'পরমহংস মশাই', এদেশের গৌরী পণ্ডিত বলছেন, 'কোথা গো পরমহংসবাবু?' বিদ্যাসাগর বলছেন 'পরমহংস' ইত্যাদি। কখনও কখনও কেউ ভক্তির আতিশয্যে 'পরমহংসদেব'ও ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তিনি পরমহংস বা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যেও 'পরমহংস' শব্দটিই ব্যবহার হত, যার স্থান পরবর্তীকালে অধিকার করেছিল ঠাকুর বা 'শ্রীঠাকুর' বা 'শ্রীজী'। অন্তরঙ্গদের মৌখিক আলাপ আলোচনাতেও দেখা গেছে, ঠাকুরের দেহ থাকাকালীন সময়ে ত বটেই, তাঁর মহাসমাধির পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত

পরমহংস শব্দের ব্যবহার। মৌখিক কথাবার্তাতে যেমন অন্তরঙ্গ ভক্তদের লেখাতেও তেমনি পরমহংসদেব শব্দটির চল ছিল সমধিক। পাঠকের পরিতৃপ্তির জন্য তুলে ধরা যাক কয়েকটি নমুনা। স্বামী বিবেকানন্দ ৩০।১১।৯৪ তারিখে লিখছেন, 'The writer...keeping the very language of Paramahamsa,' আবার ২৭।৪।৯৬ তারিখে লিখছেন, 'পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান।' ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের পত্রব্যবহারেও প্রথম দিকে দেখা যায় 'পরমহংস' শব্দের প্রতুলতা, ক্রমে সেখানে 'শ্রীঠাকুর' বা 'শ্রীরামকৃষ্ণ' ইত্যাদি স্থানাধিকার করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রামচন্দ্র দত্তের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে রথযাত্রার দিন অর্থাৎ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই। অবতরণিকাতে লেখা হয়েছে, 'পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি।' এই গ্রন্থে প্রধানতঃ 'পরমহংস' শব্দেরই প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্য স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'—পূর্বকথা ও বাল্যজীবন প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩২২ সাল এবং 'সাধকভাব' ফাল্গুন, ১৩২০। গুরুভাব পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ—যথাক্রমে শ্রাবন ও আশ্বিন, ১৩১৮। 'পূর্বকথা ও বাল্যজীবন' খণ্ডে প্রধান চরিত্র 'গদাধর,' অন্যত্র তিনি 'ঠাকুর' বা 'শ্রীশ্রীঠাকুর' নামেই প্রধানতঃ অভিহিত হয়েছেন।

স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবন-কথা' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর। এই গ্রন্থে লেখক 'পরমহংসদেব' ও 'শ্রীশ্রীঠাকুর' শব্দদুটির সার্থক সহাবস্থান ঘটিয়েছেন। একটি নমুনা তুলে ধরা যাক, "অবশ্য নিরঞ্জন ঘোষ প্রতিদিন পরমহংসদেবের দ্বারপালকরূপে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন।... অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর নিরঞ্জনের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন..." (পৃঃ ৭৬) অন্যথায় তিনি 'পরমহংসদেব' ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শব্দের ব্যবহার এইসকল ক্ষেত্রেই ছিল খুবই সীমিত।

শ্রীঠাকুরের বসওয়েল অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও তাঁর অমূল্য ডায়েরীতে পরমহংসদেব বা 'প' মাত্র ব্যবহার করেছেন। এমনকি কথামৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা যখন লেখেন তখনও পরমহংস শব্দের ব্যবহারই ছিল প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিজের প্রথম সাক্ষাতের পটভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, 'তখন সিঁধু বলিয়াছিলেন, গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।' তাঃ

মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর ডায়েরীতে ব্যবহার করেছেন 'Paramhamsa'.

এই 'পরমহংস' শব্দ-ব্যবহারের উৎস সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ সংখ্যায় লিখেছেন,"সাধুরা রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলিতেন এবং অনুমান হয় তোতাপুরী এই উপাধি প্রদান করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকালেও তৎ তৎ সাম্প্রদায়িক উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তৎসমুদয় এত গোপনভাবে রাখিয়াছিলেন যে আমরা কখন তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি নাই।...পরমহংস বৈদান্তিক সাধকদিকের চরমাবস্থাকে বলে। অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা জ্ঞানে সচ্চিদানন্দকে সার বোধ করাই পরমহংসের কার্য।"

অন্যান্য ঘটনার সংঘাতসমূহ বিশ্লেষণ করেও বুঝা যায় পরমহংস নাম পূজ্যপাদ তোতাপুরীজীর প্রদত্ত। তোতাপুরীজী দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেও কেউ কেউ পরমহংস ব্যবহার সুরু করলেও এই নামের ব্যাপক প্রচলন সুরু হয় তোতাপুরীজীর নিজস্ব ব্যবহারের পর থেকে। এর পূর্বে তিনি পাগলা বামুন, ছোট বামুন, ছোট ভট্টাচার্য ইত্যাদি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে তিনি কবে এবং কিভাবে রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন। দেখা যায় তাঁর জীবিতকালেই কোন কোন পত্রপত্রিকায়, বিশেষতঃ দেহান্তের পর বিভিন্ন লেখাতেও শুধুমাত্র রামকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহৃত হচ্ছে। ম্যাক্সমূলার, টনী, ডিগবী সাহেব প্রভৃতির লেখায় তিনি Ramakrishna বা Ramkrishna। পরবর্তীকালে অধিকাংশের লেখায় বা কথাতে তিনি শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণদেব।

এই রামকৃষ্ণ নাম তাঁকে কে দিয়েছিল? এবং তার বিশেষ কোন কারণ ছিল কি? এ বিষয়ে মতামতের অন্ত নাই। এ বিষয়ে প্রচলিত প্রধান মতামতগুলির সংক্ষেপে আলোচনা সর্বপ্রথম করা প্রয়োজন।

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্তের' লেখক রামচন্দ্র দত্তের মতে "তাহাকে সকলে গদাই বলিয়া ডাকিত ; কিন্তু প্রকৃত নাম রামকৃষ্ণ ছিল। ...গঙ্গাবিষ্ণুর মাতা রামকৃষ্ণকে গদাধর বলিয়া ডাকিতেন।" (পৃঃ ২-৩) লেখক এবিষয়ে বিস্তারিত কিছুই আর বলেননি।

(২) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দ লেখেন, "অনন্তর জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র স্থির করিলেন এবং গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে শ্রীযুক্ত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করেন।" (১। পৃ ৭৭)

তিনি আরও লিখেছেন যে শ্রীঠাকুর অদ্বৈতবেদান্তে সিদ্ধিলাভের পর "জাতিস্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর-পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" (২। পৃঃ ৩৩০-১) ঐ গ্রন্থের ৩১৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকাতে পাই, "আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক, শ্রীযুক্ত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।"

অপর এক জীবনীলেখক ভগিনী দেবমাতার মতেও গদাধরকে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন তোতাপুরীজী। (Sri Ramakrishna and his disciples p. 43) লেখিকার তথ্যের উৎস স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

(৩) অপর একটি মতের প্রবক্তা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তিনি লিখেছেন, "তবে গদাধরের রামকৃষ্ণ নাম একটা রহস্য। যাঁর নাম তোতা, সেই নামবিরোধী মায়াবাদী, যিনি ঠাকুরকে দৈবীমায়া বলিতেন, তিনি যে আনন্দযুক্ত কোন নাম রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। তবে হয়ত, শ্রুতিমধুর বা রুচিকর নয় বলিয়া এবং অগ্রজদিগের নামের প্রথমে রাম শব্দটি থাকায় বোধ হয় পরমভক্ত মথুরানাথ 'রামকৃষ্ণ' নাম রাখেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৬৩)

(৪) উপরোক্ত মত অনুসরণ করেই যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন লিখলেন,

গয়াধামে গদাধর করি দরশন।
পাইলেন কোলে হেন কুমার রতন ॥
সেই হেতু রাখিলেন নাম গদাধর।
ডাকেন গদাই বলি করিয়া আদর ॥
গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত।
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভুবনে বিখ্যাত ॥ (পৃঃ ৭)

এখানে প্রশ্ন উঠেছে, যে গুরু এই নাম দিয়েছিলেন তিনি কে? কেনারাম ভট্টাচার্য, না ভৈরবী ব্রাহ্মণী, না তোতাপুরী, না অন্য কেউ?

(৫) অপর একটি বিশিষ্ট মত প্রকাশ করেন প্রিয়নাথ সিংহ ওরফে গুরুদাস বর্মন। তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত' প্রথমে উদ্বোধনে ধারাবাহিকভাবে বের হয়;

গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে ১৩১৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে পাই, এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান ঠাকুরের জীবনে ন্যূনাধিক ত্রিশ বছরের সেবক ও সঙ্গী হৃদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা যা' বরাহনগর মঠবাসিগণ সযত্নে একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। এই গ্রন্থে আরও পাই, "বালকের নাম রাখা হইল রামকৃষ্ণ। কিন্তু ক্ষুদিরাম পুত্রকে পূর্বদৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিতে ভালবাসিতেন, কাজেই অন্যান্য সকলেও বালককে ঐ নামেই ডাকিতে লাগিলেন।" (১ম ভাগ, পৃঃ ১০)

সুতরাং প্রাগুক্ত তথ্যাদি হ'তে জানা যায় যে রামকৃষ্ণ নাম ছিল পিতৃদত্ত, নতুবা গুরু তোতাপুরী-প্রদত্ত নতুবা প্রথম রসদ্দার ও সেবক মথুরানাথ-প্রদত্ত।[১]

(৬) উপরে আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্যের ধারা অনুসরণ করে বিশ্লেষণমূলক বিচারের সাহায্যে শশিভূষণ ঘোষ আর একটি ধাপ এগিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের রাখ্যাশ্রিত নাম সম্বন্ধে তাঁর অভিমতটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। স্বামী সারদানন্দজী আলোচ্য গ্রন্থকার সম্বন্ধে লিখেছেন যে, শশিভূষণ যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রথম রামকৃষ্ণ মিশন এসোসিয়শনের বেশ কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থকার লিখেছেন, "বিশেষ কারণবশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের সকলেই তাঁহাকে গদাধর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁহার বংশানুক্রমিক নাম তাহা বংশাবলী দেখিলেই বুঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাশি-নাম **শম্ভুচন্দ্র** রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকা আচার্য্যের ও নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণের প্রস্তুত কোষ্ঠীতে তাঁহার রাশি নাম **শম্ভুরাম** লিখা আছে। কোষ্ঠীগণনা করিবার সময় জ্যোতিষীগণ জাতকের রাশি অনুসারে কোন একটি নাম রচনা করিয়া থাকেন। অম্বিকা আচার্য্যের কোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মসময়ের গণনা নয়, ইহা ৪০।৪১ বৎসর পরে তাঁহার পীড়ার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কুম্ভরাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য জ্যোতিষমতে তাঁহার নামের আদ্যঅক্ষর গ বা শ দুইটি বর্ণের একটি হওয়া

১। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত'-গ্রন্থের সম্পাদকের মতে "ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয়ের মতে এই নাম শ্রীমৎ তোতাপুরী-প্রদত্ত। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল ঠাকুরেরই নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ঐ নাম মথুরবাবু দিয়াছিলেন।" (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৩ এর পাদটীকা)

উচিত। সুতরাং তাঁহার রাশিনাম শম্ভুরাম হইতে পারে এবং গদাধরও হইতে পারে। পিতা তাঁহার নামকরণের সময় বিশেষ কারণবশতঃ গদাধর নাম রাখেন, তাহাতে তাঁহার রাশিনামেই নামকরণ হইয়াছে। পিতা কর্তৃক তাঁহার যে শম্ভুরাম বা শম্ভুচন্দ্র নাম রাখা হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩১)

এখানে লেখক বলেন যে 'রামকৃষ্ণ' শ্রীঠাকুরের বংশানুক্রমিক নাম, কিন্তু এ নাম কে কোন সময় দিলেন সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। সত্যকথা, তদানীন্তন গ্রাম বাংলায় পুরুষদের সাধারণতঃ 'ডাকনাম' ও 'রাশনাম' ব্যতীত তৃতীয় নাম শোনা যেত না। কিন্তু জ্যোতিষী গণনার ভিত্তিতে শ্রীঠাকুরের নাম শম্ভুচন্দ্র বা শম্ভুরাম রাখা হয়েছিল, এর ঐতিহাসিক সত্যতা যতখানি, তার চাইতে অনেক বেশী রয়েছে কল্পনার ধোঁয়াসা। অপরপক্ষে রাশি-ভিত্তিক হোক বা পিতা ক্ষুদিরামের গয়াধামের দিব্যদর্শনের জন্যই হোক শ্রীঠাকুরের বাল্যনাম যে গদাধর বা গদাই ছিল এবং শম্ভুচন্দ্র বা শম্ভুরাম ছিল না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বরঞ্চ শ্রীঠাকুরের বাল্যকালের নাম প্রকৃতপক্ষে 'রামকৃষ্ণ' ছিল কি না এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

(৭) প্রাগুক্ত আলোচনা থেকে 'রামকৃষ্ণনামের' তিনটি সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। কিন্তু চতুর্থ এবং একমাত্র উৎস বলে পরবর্তীকালে দাবী করে বসেছেন নূতন এক ভাগীদার। ১৩৪৩ সালে স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দ গিরি তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী' গ্রন্থে দাবী করেছেন "মহামায়ার অংশভূতা শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেব্যাখ্যাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত গুরু, তিনি পাদুকাপ্রদান এবং শিষ্যের নামকরণ যে করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিবার আরও শাস্ত্র ও ব্যবহারসঙ্গত হেতু আছে।" (পৃঃ ৪২) তিনি আরও লিখেছেন, " 'রামকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষর নাম পূর্ণাভিষেককালীন ব্রাহ্মণী-কর্তৃক প্রদত্ত। ব্রাহ্মণীর তথা ঠাকুরের কুলদেবতার নাম 'শ্রীরাম'; সুতরাং 'রাম' এই কথাটির নির্বাচন সহজানুমেয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবলক্ষণ দেখিয়া চতুরাক্ষরী 'রামকৃষ্ণ'-নাম যে নির্বাচিত হইতে পারে তাহাও সুখবোধ্য।" (পৃষ্ঠা ৫৭) এই লেখকের যুক্তিতে শ্রীঠাকুরের ডাকনাম ছিল গদাধর বা সংক্ষেপে গদাই, কুষ্ঠী-প্রমাণে তাঁর রাশ্যাশ্রিত নাম 'শ্রীশম্ভুনাথ' এবং 'রামকৃষ্ণ' নাম তাঁর গুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী-কর্তৃক প্রদত্ত। স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তির মধ্যে তিনি বলেছেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মতে দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ মতে সম্ভবতঃ ১৮৬৩।৬৪

খৃষ্টাব্দে। কথামৃত বলেন, ব্রাহ্মণী তোতাপুরীর পূর্বে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন শ্রীঠাকুরের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করেছিলেন ১৮৫৭।৫৮ খৃষ্টাব্দে। (লীলাপ্রসঙ্গ সাধকভাগ ১ম সংস্করণ) কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৫৫।৫৬ খৃষ্টাব্দে, যে সময়ে রাসমণি জীবিত ছিলেন (পৃঃ ৫৭)। যথেষ্ট তথ্যাদি যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করলেও আমরা দেখতে পাই যে লেখকের এই রসাল দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের যে সময় তিনি দাবী করেছেন তা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়।

(৮) আবার সুচিন্তিত লেখক ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ"-গ্রন্থে একটি মনোজ্ঞ তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন "'যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ' তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত দেববাণী। এই বাণীতে নিজেই তিনি নিজনামের প্রকাশক, বলা যায়। এই শ্রীরামকৃষ্ণ-নামই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায়, চিন্ময় নামীর সঙ্গে চিন্ময় নাম একদিন স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াছিলেন ভক্তহৃদয়ে, ঋষিহৃদয়ে স্বয়মাবির্ভূত বেদমন্ত্রের মত, ইহাও বলা যাইতে পারে।" (পৃঃ ১৭) এবং উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন, 'কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।' এই তত্ত্বানুসারে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজনামের প্রবর্তক হলেও নামটি সরাসরি দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ তাঁর ঋষিসদৃশ পিতা।

এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের বিভিন্ন দাবীদাওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে এবার আমরা আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুসরণ করব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পরিশিষ্টে (বর্তমান সংস্করণে) দেখা যায় ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধন আরম্ভ হয়েছিল ১২৬৭ সাল অর্থাৎ ১৮৬০-১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এবং তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ ঘটেছিল ১২৭১ সাল অর্থাৎ ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে। এদিকে অপর একটি নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায়। রাসমণির দেবোত্তর দলিল রেজেষ্ট্রি হয়েছিল ১২৬৭ সালের ৮ই ফাল্গুন অথবা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এই দলিলাংশের মধ্যে পাওয়া যায় ১২৬৫ সাল অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সে সময়ে শ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেবের মন্দিরে পূজা করছিলেন। দলিলে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যে'র নামে বরাদ্দ রয়েছে নগদ ৫ টাকা এবং বাৎসরিক ৩ জোড়া কাপড় ও ৪৷৷০ টাকার ব্যবস্থা। এই দলিলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই শ্রীঠাকুরের 'রামকৃষ্ণ' নাম প্রচলিত

হয়েছিল। সুতরাং রামকৃষ্ণনামের উৎস ব্রাহ্মণী বা পুরীজী কেউই নন।

অপর একটি দাবী রামকৃষ্ণ নাম দিয়েছিলেন মথুরানাথ। এবিষয়ে ইদানীং-কালের অন্যতম জীবনীকার মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে লিখেছেন, "...খুব সম্ভবতঃ রামকুমার ও রামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মথুরবাবু [জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামের সহিত মিল রাখিয়া] ঠাকুরের নাম রামকৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।" (পৃঃ ৭০ পাদটীকা)। দুঃখের বিষয় লেখকের এই একান্ত ব্যক্তিগত মতের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে' মথুরানাথ প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি তাঁর ভাবভক্তি দৃঢ় হয় যখন তিনি বুঝতে পারেন যে "ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন ; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন।...মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৯৪-৫)। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে মথুরানাথের এই ধারণার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর অন্যতম অলৌকিক দর্শন —ঠাকুরের দেহে শিব ও কালীরূপ দর্শন, যা ঘটেছিল ১৮৬০-১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪৪৫)। ইতিপূর্বেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দলিলের মধ্যে 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের' সুস্পষ্ট উল্লেখ রামকৃষ্ণ-নামে মথুরানাথের ভূমিকার দাবী নস্যাৎ করে। সুতরাং অদ্বৈতাশ্রম-প্রকাশিত 'Life of Sri Ramakrishna' গ্রন্থে 'Most probably it was given by Mathur Babu...as Ramlal, the nephew of Ramakrishna says on the authority of his illustrious uncle himself' (পৃঃ ৫৩, পাদটীকা) প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীঠাকুরের বংশ রাম-অনুরাগী, রামের উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৪৫) রামোপাসক এই বংশের অধিকাংশ পুরুষের নাম স্বভাবতঃই 'রাম' নামের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই মনে করা অনুচিত হবে না যে শ্রীঠাকুরের পিতৃদত্ত আসল নাম রামকৃষ্ণ, 'গদাধর' ছিল ডাক-নাম মাত্র।

তৃতীয়তঃ কেউ সন্দেহ তুলতে পারেন যে, যদি ঠাকুরের পিতৃদত্ত নাম 'রামকৃষ্ণ'ই হয়, তাহলে তাঁর লেখা পুঁথি কয়েকটির মধ্যে ঠাকুরের স্বাক্ষর 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়' বার বার পাই কেন? উত্তরে বলা যায়, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়' স্বাক্ষর থাকলেও একটি স্থানে অন্ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাক্ষর দেখতে পাই। (শ্রীরামকৃষ্ণদেব গ্রন্থের প্রথম প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)

চতুর্থতঃ আলোচ্য বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রমাণ ঠাকুরের নিজের উক্তি, বিশেষতঃ তাঁর উক্তি শ্রীম'র মত গুণীব্যক্তির ডায়েরীতে পাওয়া গেলে তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকে না। দেখতে পাই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী (২রা ফাল্গুন) শনিবারদিন ঠাকুর তাঁর কণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণার প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই মুখে কত লবঙ্গ এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি—বাবার আদরের ছেলে ছিলুম—রামকৃষ্ণবাবু—তারপর কত ঈশ্বরীয় নাম হলো—তারপর পুঁজরক্ত আর এই যন্ত্রণা" (ডায়েরী পৃঃ নং ৬৬১)। ঘরে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সেবক লাটু। এই উক্তি থেকেও বুঝা যায় পিতা ক্ষুদিরাম তাঁর আদরের কনিষ্ঠপুত্রকে রামকৃষ্ণ নামে ডাকতেন, আদর করতেন। শোনা যায়, সময়ে সময়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল অন্য দেব-দেবীর নামও। যাবতীয় তথ্যাদি হতে জানা যায় যে এই ভুবনবিখ্যাত রামকৃষ্ণ নাম তাঁর পিতা বালকের অল্পবয়সেই ব্যবহার করেছিলেন।

পঞ্চমতঃ, ঠাকুরের বংশতালিকার নিম্নলিখিত নামগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করা দরকার।
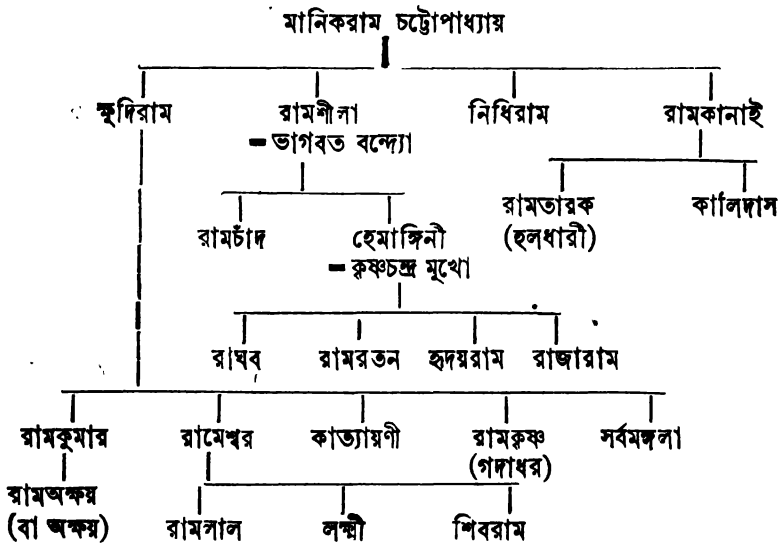
স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের প্রচারকার্য সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন, "আমার নাম কাগজে প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারুকে বড় করা যায় না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে

সকলে জানতে পারে। গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়।" (কথামৃত ৫ভাগ/পরিশিষ্ট)। যে নামই দেওয়া হোক সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ফুল অজ্ঞাত থাকে না। প্রকটিত ব্যক্তিত্বও কোনভাবেই চাপা থাকে না। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সপ্তম দর্শনকালে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "'আপনি কে?' ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমায় কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ; কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ; আমি এখানেই (দক্ষিণেশ্বরে) থাকি।" রামপ্রসাদ ও রাজা রামকৃষ্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র, কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমানকালে তাঁদের চাইতেও অনেক বেশী পরিচিত এবং ইতিহাসে পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণ নামেই। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস বা শুধু রামকৃষ্ণ নামেই ভুবনবিখ্যাত।

বিশ্বকল্যাণের জন্য লোকসংগ্রহার্থ অবতীর্ণ হয়েছেন ঐশীশক্তি, অবতীর্ণ হয়েছেন ক্ষুদিরামপুত্র-রামকৃষ্ণবিগ্রহ অবলম্বন করে। অবতীর্ণ শক্তির স্ফুরণে আবির্ভূত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-ঘোষিত সত্যযুগ। এই যুগের নায়ক রামকৃষ্ণবিগ্রহে সম্পুটিত ঐশীশক্তি। তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন: "সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।" যে বিগ্রহে প্রকটিত হয়েছিল এই মহান শক্তি তাঁকে কে বা কারা প্রথম রামকৃষ্ণ নামে ব্যবহার করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিক কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ঐ নরবিগ্রহ আশ্রয় করে যে মহান ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে—যাকে বলা হয়েছে রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন তাঁর গুরুত্ব ক্রমেই ব্যাপকতর ও গভীরতর হচ্ছে, তাঁর প্রভাব চতুর্দিকেই বিভিন্ন ও বিচিত্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এবং লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই প্রচার ও প্রসার ঘটছে রামকৃষ্ণনাম অবলম্বন করেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি

ঐশীশক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন অনেকবার। অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষের সাজে মানুষের মাঝে। সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছেন পশ্চিমবাংলার এক শ্যামল পল্লীপ্রান্তে। তাঁর লীলাবিলাসের ইতিবৃত্ত চিরমুদ্রিত হয়ে আছে ভক্তজনের হৃদয়পটে। এবারকার অবতীর্ণ ঐশীশক্তির একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর বিগ্রহরূপের প্রতিচ্ছবি শুধুমাত্র ভক্ত সাধু সজ্জনের হৃদয়কন্দরে উৎকীর্ণ হয়ে নেই বা শুধুমাত্র কবি-সাহিত্যিকের লেখনী বা সুরকারের কণ্ঠস্বরের মধ্যে তাঁর মহাজীবনের ভাবমূর্তি সংরক্ষিত নেই—তাঁর প্রতিচ্ছবি জীবন্ত হয়ে রয়েছে আলোছায়ার পটে, শিল্পীর তুলির মায়াজালে, ভাস্করের ছেনি হাতুড়ির নানা নির্মাণে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহপট আজ বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত, মহামৃত্যুঞ্জয় তিনি, লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে অপাবৃত অনাবৃত হয়েছে তাঁর মহিমার দ্যুতি, তিনি আজ বিশ্ববিজয়ী।

প্রতিকৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টা কৃতির প্রতিমা ইতি অর্থঃ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব। ধর্মজীবনের একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণপত্র, গৌড়জনের আনন্দস্ফূর্তির উৎস।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম আলোছায়ার পট তৈরী হয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে। ফটো তোলা হয় তাঁর বাসভবন 'কমলকুটীরে'। সেদিন ছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর, রবিবার। বাংলা ১২৮৬ সালের ৬ই আশ্বিন। ভাদ্রোৎসবের সুরু হয়েছিল ৩১শে ভাদ্র। কমল কুটীরে উৎসবের আয়োজন হয় ৬ই আশ্বিন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন, তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা, তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মধুর কথামৃত বর্ষণ করে, তাঁর সুমিষ্ট স্বরে সঙ্গীত লহরী পরিবেশন করে সকল ব্যক্তিকে মুগ্ধ করেন। "তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ত অবস্থায়

কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।"[১] ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য সান্ন্যালের কণ্ঠে 'সচ্চিদানন্দ ঘন' নাম শুনে তিনি ডান হাত তুলে সহসা দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা গেল, তাঁর ডানহাতের আঙুল মৃগমুদ্রায় বিন্যস্ত, বাম হাত বুকের উপর সংস্থাপিত, তাঁর মুখারবিন্দ স্বর্গীয় লাবণ্যে সমুৎফুল্ল, চৈতন্যানন্দে নিষ্ণাত ব্যক্তিসত্তার আনন্দনির্ঝর মুখকমলে পরিব্যাপ্ত। আলোছায়ার পটে বিধৃত এই প্রতিচ্ছবির বোধ করি তুলনা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের পিছনে দাঁড়িয়ে হৃদয়রাম, তাঁর পদতলে বসা জনা আটেক ব্রাহ্মভক্ত। সঙ্গীতজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথের সামনে একটি মৃদঙ্গ। ধন্য সেই ক্যামেরাম্যান যিনি এই অপূর্বদর্শন মনোহর মূর্তি সাদা কালোয় পটে ধরতে পেরেছিলেন।

কেশবচন্দ্র এই আলোকচিত্রটি তাঁর বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে সযত্নে রেখেছিলেন। একদিন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন মিত্র তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলে কেশবচন্দ্র আলোকচিত্রটি দেখিয়ে বলেছিলেন, "এরূপ সমাধি দেখা যায় না। যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য এঁদের হত।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় আলোকচিত্র গৃহীত হয় সুরেশ মিত্রের উদ্যোগে। সেদিন ছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার। ঠনঠনিয়ায় বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। উপলক্ষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মিত্র বাটীতে শুভাগমন। রাজেন মিত্রের বাড়ী যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে সিমুলিয়াতে মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তখন অপরাহ্ন প্রায় তিনটা, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুরেন্দ্র (সুরেশ মিত্র) প্রস্তাব করেন, "আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন চলুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হন। কল অর্থাৎ ক্যামেরা দেখতে যাওয়ার জন্য ঘোড়াগাড়ি করে রাধাবাজারে (অপরমতে বউবাজারে) বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিওতে উপস্থিত হন। ফটোগ্রাফার বুঝিয়ে দেন, কিভাবে ছবি তোলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ভাবনা ঈশ্বরকেন্দ্রিক। ছবি তোলার পদ্ধতির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেন ভক্তজীবনের তাৎপর্য। সেদিনই ছবি তোলার কয়েকঘণ্টা পরে তিনি কেশবচন্দ্রকে বলেন, "আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে, শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না। কাঁচের পিঠে একটা কালি

১। ধর্মতত্ত্ব: ১৬ই আশ্বিন, ১৮০১ শকাব্দ।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৫। পরিশিষ্ট (ঙ

মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুনে যাচ্ছি তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।"

কলদেখতে দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ে তাঁর ছবি তোলা হয়।[৩] ছবিতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, গায়ে বনাতের কোট, পায়ে চটিজুতা, কাপড়ের আঁচল কাঁধের উপর ফেলা। তাঁর ডান হাত একটি স্তম্ভের উপর আর বাম হাত বুকের নীচে রাখা। মুখকমল বিমলানন্দে উদ্ভাসিত, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত। মন ঈশ্বরে আত্মস্থ। তৃপ্তির লাবণ্যে মুখকমল প্রদীপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের যে আলোকচিত্রটি বর্ত্তমানে লুপ্ত সেইটি সম্ভবতঃ তাঁর তৃতীয় চিত্র, স্বামী নির্বাণানন্দজীর স্মৃতিকথায় জানা যায় ডাঃ রামচন্দ্র দত্তের উৎসাহে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি আলোকচিত্র তোলা হয়। ছবিটি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন, "আমি কি এত রাগী?" রামচন্দ্র বোঝেন ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের মনঃপূত হয় নি। তিনি নেগেটিভ সহ ছবিটি গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ প্রতিকৃতি ৪২″×৩০″ ক্যানভাসে আঁকা একখানি তৈলচিত্র। ভক্ত সুরেন্দ্রের বিশেষ উদ্যোগে জনৈক সুদক্ষ শিল্পী (সম্ভবত U. Ray) চিত্রাঙ্কন করেন। চিত্রের বিষয়বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে সর্বধর্মসমন্বয়ের উপদেশ দিচ্ছেন। কেশবচন্দ্র এই উপদেশবাণী সাঙ্গীকরণ করে 'নববিধান' (The New Dispensation) সৃষ্টি করেন। সেই কারণে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার এই চিত্রের নামকরণ করেছেন 'নববিধান'। তৈলচিত্রে গীর্জা মসজিদ ও মন্দিরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাচ্ছেন ভাবরাজ্যের এক মনোরম চিত্র। ঈশাদূত ও মহাপ্রভু প্রেমানন্দে দিব্যনৃত্য করছেন, তাঁদের ঘিরে জনাপনের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আনন্দ আবেশে কেউ খোল বাজাচ্ছে, কেউ শিঙা ফুঁকছে,

---

৩। এই দিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সেদিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল কেশব সেন আর সব আসবে, শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বলবো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম। তখন বললাম, মা তুই বলবি। আমি আর কি বলবো।" (কথামৃত ৪।১১।২)

কেউ বা ধর্মপতাকা ধরে মুগ্ধ বিস্ময়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের রসমাধুর্য আস্বাদন করছে। কেশবচন্দ্রের হাতে'নববিধানের' প্রতীকদণ্ড ও পতাকা, পাশেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি। পার্থক্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ এখানে উন্মীলিত কিন্তু আলোকচিত্রে অর্ধনিমীলিত। এখানে ডান হাতখানি বুকের উপর ধরা, আঙ্গুলগুলি ভাবরাজ্যের চিত্রের দিকে প্রসারিত। আর বাম হাতখানি যেন পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাছাড়াও চিত্রকরের মুন্সিয়ানাতে চিত্রপটে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবদ্যুতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার সুস্পষ্ট অভাব আলোকচিত্রে। গভীর ভাবদ্যোতক এই চিত্রটির ভাবসম্পাদনায় সাহায্য করেন ডাঃ রাম দত্ত ও মনোমোহন মিত্র। চিত্রটির অঙ্কনকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর হতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবরের মধ্যে। অঙ্কনকার্য সুরু হয় সম্ভবতঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। চিত্রটি প্রস্তুত হলে সুরেন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান, চিত্রখানি কেশবচন্দ্রের নিকটও পাঠান। কেশবচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেন, "Blessed is who conceived this idea."[৪] প্রায় তিন বছর পরে এই চিত্রটির একটি অনুকৃতি নন্দবসুর বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রটি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন : "ও যে সুরেন্দ্রের পট।"

প্রসন্নের পিতা (সহাস্যে) : আপনিও ওর ভিতর আছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে। ইদানীং ভাব।[৫]

পঞ্চম প্রতিকৃতিখানি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাধিক প্রচারিত আলোকচিত্র। আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি আসনের উপর উপবিষ্ট। তাঁর সুঠাম চেহারা, প্রফুল্ল মুখারবিন্দ ও নয়নাভিরাম মূর্তি থেকে প্রতীতি হয় শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবামৃতসাগরে ভাসমান সহস্রদল পদ্মের মত চারিদিকে আনন্দদ্যুতি বিকীরণ

---

৪ তত্ত্বমঞ্জরী, দ্বিতীয়ভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা পৃঃ ৭৫।

৫। কথামৃত ৩।১৮।২

৬। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোপ্রসঙ্গে (উদ্বোধন, ৬৪ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)। তাঁর মতে ফটো তোলা হয় সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ, কিন্তু (স্বামী নির্বাণানন্দজী সূত্রে প্রাপ্ত) স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মতে ফটো তোলা হয় বিকালে। রাধাকান্তজীর মন্দিরে বিকালেই পশ্চিমের আলোতে ফটো তোলা স্বাভাবিক মনে হয়।

করেছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক রবিবারে আলোকচিত্র গৃহীত হয় ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। বরাহনগর ৩৬, কুটিঘাট রোডের অবিনাশ চন্দ্র দাঁ চিত্র গ্রহণ করেন। অবিনাশ তখন ফটোগ্রাফার বোর্ণ শেফার্ড কোম্পানীতে শিক্ষানবিশী করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে আলোকচিত্র নিতে মত দেন না। ভবনাথ ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছিলেন, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন, তাঁদের সাহায্য করতে নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর মন্দিরের উত্তরদিকের রকে পায়চারি করছিলেন সে সময়ে নগেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসে ভাবে বিভোর হয়ে ভগবৎপ্রসঙ্গ করতে করতে সমাধিস্থ হন। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। দেখা গেল তাঁর দেহ জড়বৎ নিথর নিস্পন্দ। নয়নযুগল নিমীলিত, সর্বাঙ্গে যেন আনন্দদ্যুতি। এই সুযোগে অবিনাশের হাত থেকে নেগেটিভ কাঁচখানি মাটিতে পড়ে একটি কোণ ভেঙ্গে যায়। এই দোষটি ঢাকবার জন্য অবিনাশচন্দ্র চিত্রের উপরাংশ অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে কেটে ফেলেন। এই কারণে আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির উপরাংশে অর্ধচন্দ্রাকার একটা দাগ দেখা যায়। চিত্রগ্রহণের প্রায় তিনসপ্তাহ পরে ভবনাথ আলোকচিত্রখানি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান। চিত্র দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন "এ মহাযোগের লক্ষণ। এ ছবি কালে ঘরে ঘরে পূজা হবে।" নহবতের নীচে শ্রীমায়ের ঘরে এই প্রতিকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করেছিলেন। কাশীপুরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "ওগো তোমরা কিছু ভেবো না। এর পর ঘরে ঘরে আমার (প্রতিকৃতির) পূজা হবে। মাইরি বলছি বাপান্ত দিব্যি।[৮] শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিকৃতিখানি জগৎজুড়ে ভক্তগণ "ছায়া কায়া সমান" বোধে নিত্য পূজার্চনা করে থাকেন।

ষষ্ঠ প্রতিকৃতিখানি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিস্থরূপের আলোকচিত্র। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট বিকাল চারটার পর কাশীপুর বাগানবাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাসভবনের সদর দরজার সিঁড়ির সামনে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। সুসজ্জিত পালঙ্কে শায়িত মহাসমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মুখশ্রী দিব্যলাবণ্যে

৭। স্বামী অভেদানন্দ : মন ও মানুষ, পৃঃ ১৫২

৮। স্বামী গম্ভীরানন্দ : শ্রীমা সারদাদেবী পৃঃ ১৭৫

সমুজ্জল, পরিধানে পীতবসন, ললাট চন্দন-চর্চিত, গলদেশে শ্বেতমাল্য। পালঙ্কের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশজন রামকৃষ্ণানুরাগী। এই সব ভক্তবৃন্দের দাঁড়ানোর ক্রমবিন্যাস, নরেন্দ্রের গলদেশে ধুতির আঁচল ইত্যাদি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় অন্ততঃপক্ষে দুটি আলোকচিত্র নেওয়া হয়েছিল। ভক্ত বলরাম বসুর হাতে দেখা যায় সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি প্রতীকদণ্ড। একটি অখণ্ডবৃত্তের মধ্যে শৈবের ত্রিশূল, বৈষ্ণবের খুন্তি, অদ্বৈতবাদীর ওঁকার, ইসলামের অর্ধচন্দ্র ও খ্রীষ্টের ক্রুশের সমাবেশ। আলোকচিত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অন্তর্নিহিত ভাবটি তুলে ধরেছে। চিত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সহিত ক্রুশ বহন করতে প্রস্তুত তাঁর অনুরাগিবৃন্দ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপানে, জানবার জন্য বুঝবার জন্য তাঁর আরব্ধ লোকহিতব্রতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তম প্রতিকৃতির রচনাকাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ। শিল্পী জনৈক মারাঠী ভাস্কর। স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে ও এটর্নী অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে তৈরী হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মর্মর মূর্তি। কলকাতার ঝাউতলার স্টুডিওতে প্রতিমূর্তির জমি তৈরী হলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, যোগেন মা, গোলাপ মা প্রভৃতি দেখতে যান। আজানুলম্বিত-বাহু, শ্রীরামকৃষ্ণের বসার ভঙ্গী, তাঁর কানের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের সংশোধনের কয়েকটি পরামর্শ দেন বহুদর্শী স্বামী ব্রহ্মানন্দ। সংশোধনের পর আরেকদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও অন্যান্যেরা স্টুডিওতে গিয়ে দেখে শুনে প্রতিকৃতিখানি অনুমোদন করেন। শোনা যায় প্যারিস প্লাস্টারে ঢালাই করার সময় ছাঁচ কিছু বিকৃত হয়। এভাবে পাথরের প্রতিকৃতিটি নির্মিত হলে পরে কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতাশ্রমের মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে দেখেছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের অনুমোদিত এই প্রতিকৃতির বিশেষ মূল্য, সন্দেহ নাই।[৯] পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র অবলম্বন করে অনেক প্রস্তরমূর্তি, ব্রোঞ্জমূর্তি প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্রে বিধৃত প্রতিচ্ছবি, পটে চিত্রিত প্রতিকৃতি ও প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রতিমূর্তি জগৎজুড়ে শোভা পাচ্ছে। এদের সকলেরই উৎস উপরে বর্ণিত এক বা একাধিক বিগ্রহের প্রতিকৃতি। আর মুগ্ধ প্রতিরূপের আড়ালে আবৃত যে মহাজীবন তা স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হাজার লক্ষ মানুষের হৃদয় সিংহাসনে—তার হিরণ্ময় দীপ্তি বিশ্বমানবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশারী।

৯। স্বামী নির্বাণানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত, এর কিয়দংশ উদ্বোধনে প্রকাশিত

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা

গাছের মধ্যে কোন কোনটি 'অচিন গাছ', তেমনি দেখতে শুনতে মানুষের মত হলেও অবতারপুরুষ অচিন মানুষ; অবতারপুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি অনন্যসাধারণ, তিনি নিরুপম। অবতারপুরুষের অনন্যস্বাতন্ত্র্য বোধ করি সর্বাধিক প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে।

রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের সম্বন্ধে বলতেন: 'আমি মূর্খোত্তম,' 'আমি তো মুখ্যু'। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোনক্রমে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন।' অনুরূপভাবে স্বামী প্রেমানন্দ বলেছিলেন, '(তিনি) যো সো করে লিখতে পারতেন মাত্র।' এবং বাইরের জগতে তাঁর পরিচয়, তিনি একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মন্দিরের সামান্য একজন পূজকমাত্র। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের চৌম্বকব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই মনোভাবের নমুনা প্রকাশ পেয়েছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখনীতে। বিস্মিত প্রতাপচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন: "I, a Europeanised, civilised, self-centred, semi-sceptical so-called educated reasoner, and he, (Ramakrishna Paramahansa) a poor, illiterate, shrunken, unpolished, diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee'[১] এই ধরনের মন্তব্যের বহুল ও অনেকক্ষেত্রে যথেচ্ছ ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষা বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে একটি ধোঁয়াসার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যমূলক আলোকসম্পাতের সাহায্যে ধোঁয়াসার আবরণ ভেদ করতে না পারলে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপম চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রায় অজ্ঞাত থেকে যাবে। এই রহস্য ভেদ করতে না পারলে আমরা বুঝতে পারব না, তিনি 'মূর্খ' হলেও পণ্ডিতেরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসে কেন 'কেঁচো' হয়ে যেত।

১ The Theistic Quarterly Review, Oct-Dec, 1879.

তাঁর নিজ উক্তি, 'কি আশ্চর্য্য, আমি মূর্খ। তবু লেখাপড়াওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য্য!' এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গদাধর বা গদাই। শ্রীগদাধরের বাল্যকালের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ ও বিচিত্র কল্পনার জাল বোনা হয়েছে। কোন জীবনীকার লিখেছেন, 'বিদ্যাভ্যাসে গদায়ের নাহি তত মন', 'গদায়ের পাঠশালে যাওয়া-আসা সার। লেখাপড়া বড় বেশী নাহি হয় তার।' আবার কেউ অভিযোগ করেছেন যে, বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী শ্রীগদাধর পড়াশুনার নাম করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে হাটে মাঠে খেলাধুলা যাত্রাগান করে বেড়াতেন। আরেকজন লিখেছেন, 'গুরু মহাশয় অন্যান্য বালকদিগকে যেমন পীড়ন করিয়া পাঠে মনোযোগ করাইতেন, গদাইয়ের অনুপস্থিতি-সময়ে তাঁহার জন্যও সেইরূপ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন, মনে করিতেন; কিন্তু গদাই পাঠশালায় উপস্থিত এবং গুরু মহাশয়ের সম্মুখীন হইলে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। তিনি গদাইকে অতীব ভালবাসিতেন।'[২] অপর একজন লিখেছেন যে, অমনোযোগী বালককে শায়েস্তা করার জন্য গুরু মশাই বালককে বেত্রাঘাত করেও তাঁর বিদ্যাচর্চার অনীহা দূর করতে পারেননি।[৩] কেউ বা বলেছেন, লেখাপড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে শ্রীগদাধর সেইকালেই বলেছিলেন, 'বিদ্যা শিখে ত শ্রাদ্ধ করাতে হবে আর চাল কলা বেঁধে আনতে হবে। আমার অমন বিদ্যায় কাজ নেই। সেই অন্ন খেতে হবে।'[৪] এভাবে বিদ্যাচর্চায় বীতস্পৃহ একগুঁয়ে বালক শ্রীগদাধরের যে চিত্র পরবর্তীকালে জীবনীকারগণ এঁকেছিলেন, তার প্রায় অনুরূপ ছবি তুলে ধরেছিলেন তাঁর সমকালীন পত্রপত্রিকা। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট লিখেছিল, 'রামকৃষ্ণ লেখাপড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুই চারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।' ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর The Indian Mirror লিখেছিল, 'Born of a poor Brahmin family...Ramakrishna was not fortunate in receiving a good education, secular or spiritual, in his younger days.' প্রাগুক্ত সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণগুণগ্রাহী; তাঁরা বোধ করি শ্রদ্ধাভক্তির আতিশয্যে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অতিশয়োক্তি

২ গুরুদাস বর্মন: শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ১৩-৪ ৩ বৈদ্যনাথ লাহা: কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৬০-১

৪ শ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ১৪

করেছিলেন। কেউ আবার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে শ্রীগদাধরের নিরক্ষরতার যাথার্থ্যও দেখিয়েছিলেন।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন গ্রামবাংলার এক সুদূর পল্লীতে আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে। কিন্তু তাঁর জন্মভূমি কামারপুকুরের অদূরেই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বিষ্ণুপুর। সে সময়ে বিষ্ণুপুরের কৃষ্টিসংস্কৃতির প্রভাব কামারপুকুর ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সুস্পষ্ট। শ্যামল গ্রামীণ বাংলার স্নেহমধুর পরিবেশে বালক শ্রীগদাধর বড় হয়ে উঠছিলেন। পিতা ক্ষুদিরামের কাছে হাতে খড়ি হবার পর শ্রীগদাধর নিকটস্থ পাঠশালায় যোগদান করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। লাহাদের শ্রীশ্রীদুর্গামন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির সেখানেই বসত পাঠশালা। শ্রীগদাধরের শিক্ষাকালের প্রথমদিকে গুরুমশাই ছিলেন মুকুন্দপুর-নিবাসী যদুনাথ সরকার, পরে ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সরকার।[৬] সকালে দু'তিন ঘণ্টা ও বিকালে দেড়-দুই ঘণ্টা পাঠশালা বসত। সেকালের রীতি অনুসারে শ্রীগদাধর তালপাতায় বাংলা বর্ণমালা ও বানান লেখা শিখতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে এককণ্ঠে তারস্বরে মানসাঙ্ক, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, দশকের নামতা উচ্চারণ করে মুখস্থ করতেন। সকল বিষয়েই মুখস্থ করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। তালপাতায় অঙ্ক লেখা অভ্যাস হলে শিক্ষার্থীরা কলাপাতায় তেরিজ (অঙ্কের যোগ) জমাখরচ ও নামধাম প্রভৃতি লেখা আয়ত্ত করত। গণিতে উৎসাহী ছাত্রদের অধিকন্তু শিখতে হত শুভঙ্করী নিয়ম,[৭] মাসমাহিনা সুদকষা জমাবন্দী খৎলেখা জমিদারীর খতিয়ান লেখা ইত্যাদি। তদানীন্তন

---

৫ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন: 'তোতাপাখীর মত পুঁথি না পড়িয়া, সাধনপ্রভাবে শিক্ষার প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়া ভবিষ্যতে সকল অক্ষর অর্থাৎ শাস্ত্রকে উদ্ভাসিত করিবেন...হয়ত এই নিমিত্তই নিরক্ষর হইলেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ৭)

৬ তত্ত্বমঞ্জরী, সপ্তমবর্ষ, দশম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৪ অনুসারে শ্রীগদাধরের পাঠশালায় শিক্ষক ছিলেন রামপ্রসাদ গুপ্ত, তাঁর পুত্র আশুতোষ গুপ্ত। সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ গুপ্ত অল্পকালের জন্য ঐ পাঠশালাতে শিক্ষকতা করেছিলেন।

৭ বাংলায় ও আসামে অঙ্কের ছড়া বা আর্যা অধিকাংশ শুভঙ্করের নামে চলে। শুভঙ্কর সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকের পূর্বের লোক। পরবর্তীকালে একাধিক কায়স্থ সন্তান শুভঙ্কর নাম বা উপাধি ধারণ করেছিলেন।

প্রথানুসারে রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থের পাঠ ও আবৃত্তি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত ; শুধু তাই নয়, এই সকল গ্রন্থ বা তার অংশবিশেষ অনুলিপি করাও ছিল পুণ্যকর্ম। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে কিশোর শ্রীগদাধর কয়েকটি পুঁথি অনুলিপি করেছিলেন। কালের করাল-গ্রাস থেকে যে কয়টি পুঁথিপত্র আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান সেগুলি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে কিশোর শ্রীগদাধরের বিদ্যাচর্চায় প্রীতি ও নিষ্ঠা। তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা পুঁথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : রামকৃষ্ণায়ণ, হরিশ্চন্দ্রের পালা, সুবাহুর পালা, মহিরাবণ বধের পালা, যোগাদ্যার পালা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী। পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য শ্রীগদাধরের স্বহস্ত লিখিত পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

(ক) 'হরিশ্চন্দ্রের পালা' : ১০$\frac{1}{2}$'' ৩$\frac{1}{4}$'' তুলোট কাগজে ৩৯ পৃষ্ঠার পুঁথি। পুঁথির রীতি অনুযায়ী সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠায় লেখা, পর পর দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটি পৃষ্ঠার নম্বর। এখানে পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর দশকিয়া ও পণকিয়ার উভয় অঙ্কানুসারে লেখা। শ্রীগদাধর এই পুঁথিটির অনুলেখ সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২০শে বৈশাখ অর্থাৎ সোমবার কৃষ্ণা-একাদশী, শকাব্দ ১৭৭০, ইংরাজী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় বার বছর দুই মাস। তিনি 'শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ হরিশ্চন্দ্রের পালা।'—লিখে পালাগানের মূলটি আরম্ভ করেছেন। পালাগানের শেষে লিখেছেন তাঁর নিজের নাম ও ঠিকানা। এখানে তাঁর নামের স্বাক্ষর 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যা'।

পালা-গানটির মূল-রচয়িতা শঙ্কর, যিনি কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্রের পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী, নিবাস লেগোর নিকটবর্তী আধুনিক পেনো গ্রামে। কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭.২-৪৮) সভাকবি ছিলেন। তিনি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাঁচালী লিখেছিলেন গোপাল সিংহের পিতা রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে (১৭০২-১২)।[৮] কবিচন্দ্রের অধ্যাত্মরামায়ণ দক্ষিণরাঢ়ে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র

৮ রামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে গায়...
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথসিংহের জয় কর রঘুপতি।
(সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৩৫৬)

সেন তাঁর বিখ্যাত History of Bengali Language and Literature (2nd Edn, p. 178-79) গ্রন্থে শঙ্কর কবিচন্দ্রের লেখা যে ৪৬টি কাব্য রচনার তালিকা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা'। ডাঃ সেনের প্রাপ্ত *পুঁথিখানির লিখন তথা অনুলিখনের কাল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই পুঁথিখানির কোন* একখানির নকল শ্রীগদাধরের আলোচ্য অনুলেখের আকর।

(খ) 'মহিরাবণের পালা': ঐ একই মাপের তুলোট কাগজে ৩১ পৃষ্ঠার পুঁথি। মূলের পূর্বে প্রায় ৪ পৃষ্ঠার বন্দনাগান, 'শ্রীশ্রীরামঃ। বন্দনা লিখ্যতে।'— দিয়ে শুরু। তিনি পুঁথি সমাপ্ত করে স্বাক্ষর করেছেন 'শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ'। সমাপ্ত করার তারিখ লিখেছেন ২রা ভাদ্র প্রতিপদ। পুরাতন পঞ্জিকা আলোচনা করে ও শ্রীগদাধরের লেখার বিন্যাস, শব্দের বানান ইত্যাদি লক্ষ্য করে স্থির করা যায় যে, সমাপ্তির তারিখ বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২রা ভাদ্র, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, বুধবার (ইংরাজী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট) অথবা ১২৫৫ সালের ১লা ভাদ্র, প্রতিপদ, মঙ্গলবার। তখন অনুলেখকের বয়স প্রায় সাড়ে বার বছর।

পুঁথিখানির মূল-রচয়িতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্র এই দুটি ভণিতার সহাবস্থান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই ধরনের ভণিতা-বিভ্রাট সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, '(মহাভারতের তুলনায়) রামায়ণের বেলায় ভণিতা-বিকৃতি অনেক বেশী হইয়াছে। কেননা রামায়ণ গাওয়া হইত এবং গায়নদের নিজের নাম ভণিতারূপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্ব্বদা সজাগ থাকিত। এই কারণে সপ্তদশ শতাব্দে রচিত রামায়ণেও যথেষ্ট ভণিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২২) এখানে ভাষাতে কৃত্তিবাসী সুর যে নাই তা নয়। কিন্তু বন্দনাগানে কৃত্তিবাসকে যেরূপ ভক্তি দেখানো হয়েছে, তাতে এই পালাগান কৃত্তিবাসের হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই মনে হবে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রচলিত পাঠের সঙ্গে পালাগানের গায়ক কবিচন্দ্র নিজের কীর্তি সংযোজন করেছিলেন। এখানে কাহিনী মোটামুটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারী।

(গ) 'সুবাহুর পালা': তুলোট কাগজে ২২ পৃষ্ঠার একটি পুঁথি। নামপত্র ইত্যাদির জন্য রয়েছে তিনটি ভিন্ন পৃষ্ঠা। 'শ্রীশ্রীসীতারামঃ ॥ অথ সুবাহুর পালা লিখ্যতে॥'—ভূমিকা করে অনুলেখক শ্রীগদাধর পালাগানটি লিখেছেন। পাণ্ডুলিপি সমাপ্তির তারিখ অনুলেখকের মতে ১২৫৬ সালের ১৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে ঐ দিনটি ছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা

জুলাই; শুক্লা দ্বাদশী তিথি, কিন্তু সোমবার। শ্রীগদাধরের স্বহস্তে লিখিত 'মঙ্গলবার' সঠিক ধরলে তারিখ হবে ২০শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স তেরো বছর চার মাস।

এখানে ভণিতাতে পাওয়া যায় একমাত্র কৃত্তিবাসের নাম। কিন্তু আলোচ্য পালাগানের কাহিনী প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনও পাঠে আমরা এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সুবিখ্যাত জীবনীকোষ গ্রন্থে[৯] যে চল্লিশ জন সুবাহুর পরিচয় পাওয়া যায় তা হতে এই পালাগানের সুবাহুর কাহিনী ভিন্ন। এখানে সুবাহু বীরবাহুর ভাই, রাবণের প্রিয় পুত্র। সুবাহু রামভক্ত। হৃদয়মুকুরে সদা-ভাস্বর শ্রীরামের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি স্মরণ করতে করতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মনের ভাব, 'করিয়্যা সম্মুখ রণ যদি আমি মরি। চতুর্ভুজ হয়্যা জাব বৈকুণ্ঠ নগরি॥'

(ঘ) চতুর্থ পুঁথি 'যোগাদ্যার পালার' উল্লেখ করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার ও 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক। যোগাদ্যা শব্দের অর্থ মায়াময়ী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী, কালী।[১০] ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, 'উত্তররাঢ়ের পুরাতন দেবীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের, দ্বিজদয়ারামের, পরমানন্দ দাসের ও দ্বিজ বাঞ্ছারামের ভণিতায়।[১১] ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক যেসব প্রচুর পুঁথি রচিত হয়েছিল তার মধ্যে যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা প্রভৃতি 'দুইচারি পাতড়ার' পুঁথিগুলি নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।[১২] এই পুঁথিখানি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের লেখক শশিভূষণ ঘোষের মতে এই পুঁথির অনুলিপি শ্রীগদাধর সমাপ্ত করেছিলেন বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২৯শে মাঘ, শনিবার অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুআরী। সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স প্রায় তেরো বছর।

(ঙ) স্বামী সারদানন্দ, রামচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয় কুমার সেন 'রামকৃষ্ণায়ণ' পুঁথির উল্লেখ করেছেন। এর অনুলেখকও শ্রীগদাধর। আমাদের এই পুঁথি-খানিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

৯ শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার: জীবনীকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৩৪-৩৭

১০ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃঃ ১৮৭৩

১১ সুকুমার সেন: ঐ, পৃঃ ৫১৭, তাছাড়াও পৃঃ ৪৩০ দ্রষ্টব্য।

১২ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২১৫-৬

(চ) শিহড় গ্রামে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রের বাড়ীতে শ্রীগদাধরের নকল করা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। তেরিজপাতাতে লেখা পুঁথিখানির অধিকাংশই বিলুপ্ত, বর্তমানে মাত্র বার তেরোখানি পৃষ্ঠা দেখা যায়। মনে হয় বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লেখা এই অনুলেখ উপরোক্ত পুঁথিগুলি লেখার পরবর্তী কোন সময়ের।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি অনুলেখ শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মুন্সিয়ানার উজ্জ্বল প্রমাণ। দৃঢ় বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তাঁর লিখন ভঙ্গিমা ও স্বাক্ষরের নমুনা পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া যাচ্ছে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পুঁথিগুলির মধ্যে কিছু কিছু অংশ শ্রীগদাধরের মৌলিক রচনা। সামান্য কিছু অংশ গদ্যে লেখা। 'সুবাহুর পালা' পুঁথিখানির শেষ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'ওঁ রামঃ। শ্রীরামচন্দ্র-দাসের পুস্তক জানিবেন।' মূল পাঠ লেখা শেষ করে তিনি 'হরিশ্চন্দ্রের পালা' পুঁথিতে লিখেছেন, 'ভিমস্বাপী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতির্ভ্রমঃ।'১৩ আবার লিখেছেন, 'জথাদৃিষ্টং তথা লিখিতং লের্ক্ষকো নাস্তি দোষক।'১৪ এগুলি নিঃসন্দেহে মূল পুঁথি-বহির্ভূত তাঁর নিজস্ব রচনা।

এছাড়াও তদানীন্তনকালের পুঁথি-লিখনের রীতি অনুযায়ী স্বভাবকবি শ্রীগদাধর তাঁর কিছু মৌলিক রচনা পুঁথিগুলির মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন। বার তেরো বছরের কিশোর কবির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল তার কয়েকটি নমুনা এখানে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে। কিশোর কবি শ্রীগদাধর 'মহিরাবণ বধ' পালার শেষে লিখেছেন :

গদাধরকে বর দিবে য়োহে১৫ গুণনীধী।
মহানন্দে রাখিবে তোমায় জাবেদীঃ॥
গুষ্টিবগ্রে১৬ বর দিবে আোহেঃ২ কমল আঁখি।
জন্ম্যে১৭ থাকে যেন হোএ বড় সুখীঃ॥
তিনি 'সুবাহুর পালা'র অনুলিপি শেষ করে লিখেছেন,
কিত্তিবাসের চরনে মোর অসঙ্খ প্রনাম
জাহার ক্রৃপায় হইর্নগিত রামাযনঃ॥

১৩ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

১৪ যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্য নাস্তি দোষঃ। 'যথাদৃষ্টং' স্থলে যথাদিষ্টং' পাঠও গ্রহণযোগ্য।

১৫ য়োহে = আোহে = ওহে ১৬ গুষ্টিবগ্র = গোষ্ঠীবর্গ ১৭ জন্ম্যে = জন্মে

শ্রীগদাধরকে বরদিবে ওহেগুননিধি
কর্ন্যানে[১৮] রাখিবে রাম তোমায় নিবেদি: ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় নাথায় সিতায় পতয়ে নম ॥[১৯]

অনুরূপভাবে 'হরিশ্চন্দ্র পালা' গানের শেষাংশে নিম্নোক্ত দুটিপংক্তিও শ্রীগদাধরের নিজস্ব রচনা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এতদূরে হরিশ্চন্দ্রের পালা হইল সায়।
অভিমত বর পায় জেজন গাওায় ॥

আলোচ্য পুঁথিগুলির অধিকাংশ পয়ার ছন্দে লেখা, শুধু কিছু অংশে দেখা যায় পয়ার ত্রিপদী। শ্রীগদাধরের নিজস্ব রচনা সব কয়টি ১৪, ১৫, ১৬ অক্ষরী পয়ারে রচিত, তাছাড়াও তাঁর রচনায় সর্ববিষয়ে দেখা যায় পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধরনের পুঁথি লেখা শুধুমাত্র লেখার কাজ নয়, চারুশিল্পও বটে। আমাদের স্বভাবশিল্পী শ্রীগদাধর তাঁর পুঁথিপাটাকে সজ্জিত করেছিলেন সুরুচিসম্পন্ন ছোটখাট নক্সার সাহায্যে। একটি পৃষ্ঠার দুই প্রান্তে তাঁর হাতে আঁকা দুটি নক্সার আলোকচিত্র পাঠককে উপহার দেওয়া গেল (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। আরও লক্ষণীয় একটি বিষয় এই যে, তাঁর লেখা প্রত্যেকটি পুঁথি তিনি শুরু করেছেন শ্রীরাম বা শ্রীরামসীতাকে স্মরণ করে। 'সুবাহুর পালা' পুঁথিখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার লেখা শুরু করেছেন 'ওঁ রাম', 'শ্রীরাম' ইত্যাদি দিয়ে। শুধুমাত্র রামকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলেই রামনামের স্মরণ নয়, শ্রীগদাধর 'রামাৎ' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন[২০] এবং ঐ কালে তদ্‌গতচিত্তে ইষ্টদেব রঘুবীরের পূজা জপ ধ্যান করে মনের আনন্দে ভাসতেন, সেকারণেও তাঁর লেখাগুলিতে রামনামের পুনঃ পুনঃ স্মরণ।

প্রবীণ বয়সেও তাঁর হস্তাক্ষরের যে সামান্য কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন কালের ক্ষয়-ক্ষতি অতিক্রম করে বর্তমান রয়েছে, তাদের কয়েকটি পাঠককে উপহার দেওয়া যাচ্ছে। তখন তিনি কাশীপুরের বাগানবাটীতে রোগশয্যায় শায়িত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুআরি সন্ধ্যাবেলা। তিনি একখণ্ড কাগজে স্বহস্তে

---

১৮ কর্ন্যানে — কল্যাণে

১৯ অর্থাৎ 'সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।' শ্রীগদাধর এসময়ে সংস্কৃতভাষা সামান্যই শিখেছিলেন।

২০ "আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৪৫)

নরেন্দ্রনাথকে লিখে দেন লোকশিক্ষার ফতোয়া। তিনি লিখলেন, 'জয় রাধে প্ৰমমোহি নরেন সিক্ষে দিবে জখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে। জয় রাধে।'২১ অর্থাৎ 'জয় রাধে! প্রেমময়ী! নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে!' লেখার নীচে চারুশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকে দেন গভীর অর্থদ্যোতক একটি মনোহর রেখাচিত্র। বামদিকে আয়তচক্ষু একটি আবক্ষ মস্তক। মাথার গড়ন সাধারণের চাইতে বড়। তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে স্থির। পিছনে একটি দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর, ব্যগ্রভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নরেন্দ্রনাথের পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণ, নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে সাগ্রহে অনুসরণকারী জগৎপতি। আবার দেখি, ৯ই এপ্রিল তারিখে তিনি একখণ্ড কাগজে লিখেছেন, 'নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও,' আর তারই নীচে এঁকেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজখণ্ডের উল্টোপিঠে এঁকেছেন একজন রমণী, তার মাথায় একটি বড় খোঁপা।২২। এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাবসম্পদ বিতরণ করেছিলেন কখনও রেখাচিত্রের সাহায্যে, কখনও শব্দবর্ণ লিখনের সাহায্যে, কিন্তু ততোধিক তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গান কীর্তন নৃত্য ও অনুপম কথাশিল্পের মাধ্যমে!

রামচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন, 'লেখাপড়া সম্বন্ধে একেবারে তাঁহার কিছুই আস্থা ছিল না। তাঁহার হস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি ও অন্য দুই একখানি পুস্তক আছে, তাহাতেই তিনি যে লেখাপড়া কিরূপ জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।'২৩ শ্রীগদাধর লিখিত পুঁথিগুলির গভীরে প্রবেশ না করে ভাসা ভাসা দেখলে এরূপ একটি ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। রামচন্দ্র দত্তের বক্রোক্তি সম্ভবতঃ পুঁথির ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দের [illegible]নান ও পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে কখনও কখনও ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ অক্ষরের ব্যবহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠক জানেন যে, বাংলা ভাষায় পৌরাণিক পুনর্জাগরণের সময়ে প্রাকৃতের যে প্রবল প্রচলন হয়েছিল, পরবর্তীকালে বাংলাভাষা অনেকাংশে সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে উঠলেও সেই প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেনি। এই উভয় স্রোতের বিপুল পরিমাণে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সেকালে। শ্রীগদাধর রচিত পুঁথিগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করি আমরা তারই অনুসরণ। এই কারণে দেখে, লুটিয়ে, বস, থুয়ে, দর্প, শৃগাল, বজ্রাঘাত, হাতে প্রভৃতি শব্দের

২১ মাস্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৬৫

২২ মাস্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭০৪

২৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৪

পরিবর্তে তদানীন্তন প্রচলিত দেখ্যা, লোটীয়্যা, বৈস্য, য্যা, দপ্প, সিগাল, বয়র্জাঘাত, হাথে প্রভৃতির ব্যবহার দেখে নাসিকাকুঞ্চন করা ঠিক হবে না, তেমনি দিব্য, ক্ষমা, গর্ভপাত, অযোধ্যা ইত্যাদির পরিবর্তে দীর্ব্ব, খেমা, গর্ব্বপাত, অজধ্যা অথবা বানানের ক্ষেত্রে সরোজ, পশ্চাতে, শরণ, বৃত্তান্ত, তপস্বী, হিমাচল, কৃপা ইত্যাদির পরিবর্তে স্বরজ, পশ্চাতে, বির্ত্তান্ত, তপস্মি, হিম্যাচল, ক্রপা ইত্যাদির ব্যবহারে স্থানীয় প্রবল প্রভাবেরই ইঙ্গিত করে। অবশ্য কয়েকটি শব্দের বানান তিনি কালক্রমে সংশোধন করেছিলেন। তাছাড়াও কয়েকটি শব্দের বানান তিনি বোধ হয় বরাবরই ভুল করেছেন। এগুলির জন্য দায়ী তাঁর নিজের শেখার ভুল অথবা পাঠশালার গুরুমশাইয়ের ভুল, তা আজ কে হলফ করে বলবে? তাছাড়াও কিশোর শ্রীগদাধর প্রত্যেকটি পুঁথি নিষ্ঠার সঙ্গে হুবহু নকল করেছিলেন। পুঁথির শেষে তিনি লিখেছেন, 'জথাদৃিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোসক'[২৪]—এদিক হতে বিচার করলেও অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার, আঞ্চলিক শব্দের প্রভাব, ছন্দের মাত্রার স্খলন, বানান ভুল ইত্যাদি ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য অনুলিপিকারের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে যে আকর পুঁথিগুলি তিনি অনুসরণ করেছিলেন সেগুলিকেই দায়ী করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ অনেকেরই একটি ভ্রান্ত ধারণা এই যে, শ্রীগদাধর হিসাবপত্র কিছু জানতেন না, বুঝতেন না। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। অনস্বীকার্য যে তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, 'পাঠশালে শুভঙ্করী আঁকে ধাঁধা লাগত।' লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন: 'গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যন্ত এবং পাটিগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গুণভাগ পর্যন্ত তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল।' এখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা দুটি হিসাবের আলোকপ্রতিলিপি উপস্থাপিত করা হচ্ছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এ দুটি পাটিগণিতের নিছক মিশ্রযোগ নয়, হিসাবের লেনদেনের সুস্পষ্ট প্রমাণ। যদিও পুঁথিকার লিখেছেন, শ্রীগদাধর যোগ জানতেন, বিয়োগ জানতেন না,[২৫] এই অভিযোগ

---

২৪ তিনি একটি পুঁথিতে লিখেছেন: 'জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষকো নাস্তি দোসক।'

২৫ স্বভাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ'ল। অধম বিয়োগ তাহে বুদ্ধি বেঁকে গেল।

পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে যাঁর। কেমনে বিয়োগে বুদ্ধি আসিবে তাঁহার॥ পুঁথি, পৃঃ ১৯

আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভুল হবে। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তিনি যখন দ্বৈতাদ্বৈতভাববিবর্জিত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, সেকালে তাঁর হিসাব পচে গিয়েছিল। তিনি নিজমুখে বলেছেন 'এ অবস্থার পরগণনা হয় না। গণ্‌তে গেলে ১।৭।৮ এই রকম গণনা হয়।'২৬

শ্রীগদাধরের লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি কয়েকটি কারণে। বালক মাত্র সাত বছর বয়সে পিতৃদেবকে হারান। পিতৃবিয়োগ বালকের মনে গভীর রেখাপাত করে। 'বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাঁহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।' দ্বিতীয়তঃ নয় বছর বয়সে উপনয়ন লাভের পর শ্রীগদাধর আনন্দমনে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং কুলবিগ্রহ ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মায়ের পূজা করতে থাকেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই তাঁর পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হয়। তাঁর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন, 'কেবল অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালায় একস্থানে বসিয়া মিলিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। সুতরাং গদাধরের নয় বৎসর বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় যাইতেন ইহা বলিয়া বোধ হয় না।'[২৭] তৃতীয়তঃ ইতোমধ্যে শ্রীগদাধরের মানসসরোবরে অধ্যাত্মপদ্মের কোরকগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হতে থাকে; তাঁর মধ্যে আসে পরিবর্তন,[২৮] মামুলি লেখাপড়ায় তাঁর আকর্ষণ কমে যায়। উপরন্তু 'অসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও মানসিক সংস্কারসম্পন্ন' কিশোরের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁর দেবতুল্য পিতার বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রীতি সত্যবাদিতা সদাচারের তুলনায় গ্রামের পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যাদি ব্যক্তিদের ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপর আচরণ ধরা পড়েছিল, তাঁর কোমল মনকে ব্যথিত করেছিল। অপরপক্ষে তিনি তাঁর ভাবানুমোদনকারী রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করতে ও সমকালীন

---

২৬ কথামৃত ১।১৬।৩

২৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩৮

২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল।... সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম।' (কথামৃত ১।১৭।৩) সে সময়ে শ্রীগদাধরের বয়স লীলাপ্রসঙ্গমতে আট বছর, কথামৃতমতে এগার বছর।

রীতি অনুযায়ী ধর্মবিষয়ক পুথিসকল অনুলিপি করতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীগদাধরের স্খলিত কণ্ঠে পুরাণাদির পাঠ শুনতে ভিড় লেগে যেত, 'চারিধারে ঘেরে তারে শুনে ব'সে ব'সে। গদায়ের পুঁথিপাঠ পরম উল্লাসে।'[২৯]

বিদ্যায়তনের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বিদ্যাচর্চা বেশীদূর অগ্রসর না হলেও বিদ্যায়তনের বাইরে যে বিদ্যার অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেখান হতে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অমূল্য সম্পদ। কৃষ্টিসম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবার ছিল শ্রীগদাধরের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিভূমি। ধর্মপ্রাণ পিতা ক্ষুদিরাম ও সরলমনা ভক্তিমতী মাতা চন্দ্রমণি ছিলেন তাঁর চরিত্রশিক্ষার আদর্শ দীপ। সেইসঙ্গে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, সামাজিক সম্পদ শিক্ষার্থী শ্রীগদাধরকে জুগিয়েছিল অফুরন্ত উপকরণ। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, সুগভীর বোধশক্তি, সহজাত ঈশ্বরপ্রীতি—রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরিসংকীর্তন, রামায়ণ, ভারত, ভাগবত ও পুরাণাদির পাঠ এবং সর্বোপরি বারমাসে তেরো পালাপার্বণের মধ্য হতে প্রয়োজনমত ভাবরস সংগ্রহ করেছিল।

শ্রীগদাধর আজন্ম ভাবুক। বিশুদ্ধ তাঁর মন। শুকনো দেশলাইয়ের কাঠির মত সামান্য উদ্দীপনেই তাঁর মন সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, তাঁর মনপাখী দেহডাল ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অসীম লোকে। সেইসঙ্গে তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত মন, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র রসবোধ সহজাত প্রবর্তনায় মেতে ওঠে বিবিধ চারুশিল্পে। চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হয় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, কল্পনার গভীরতা ও সহজে ভাবপ্রকাশের দক্ষতা প্রকাশ পায় তাঁর বিভিন্ন শিল্পকর্মের মধ্যে।[৩০] তাঁর বিচিত্র বিদ্যাচর্চার মধ্যে সুসমঞ্জসভাবে মিলিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা ও ততোধিক অসাধারণ তাঁর ঈশ্বরপ্রীতির জন্য প্রাণের আকুতি। ক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন 'বিজ্ঞানী'-রূপে এবং বিশ্ববাসীকে আহ্বান করে বলেন যে, 'এই সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি'।

আশৈশব তাঁর অতুলনীয় ধারণার ও ধারণের সামর্থ্য সকলকে বিস্মিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলতেন, 'কিন্তু ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা পড়ত বুঝতে পারতুম। তবে একটু আধটু ফাঁক যায়, কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে

২৯ পুথি, পৃঃ ৯

৩০ 'বিশ্ববাণী', আশ্বিন ১৩৮১ : 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ' দ্রষ্টব্য

সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।'[৩১] সেই কারণে তিনি সহজেই দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাবের আদান করতে পারতেন, তেমনি ইংলিশম্যানদের যুক্তিবিচারের আলোচনা অনায়াসে বুঝতে পারতেন ও মাঝে মাঝে গভীর ভাবদ্যোতক মন্তব্য করতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি, শ্রীগদাধরের বয়স তখন নয় কি দশ বছর। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের এক শ্রাদ্ধবাসরে একটি বিরাট পণ্ডিতসভা বসেছিল। একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে বাদানুবাদ করতে করতে পণ্ডিতেরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীগদাধর একটি সহজ সরল সমাধান দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। দ্বিতীয় একটি ঘটনা। কাশীপুরে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে তন্ত্রের কয়েকটি শ্লোকের তাৎপর্য নিয়ে মহিমাচরণ, জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধরলাল সেনের মধ্যে তুমুল বচসা হয়। বাদানুবাদে সমাধান না হওয়াতে তাঁরা উপস্থিত হন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে অধর সেন বিস্মিত বোধ করেন।[৩২] শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বর্ণনা করেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি বলেছেন: 'সেজবাবুর সঙ্গে আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বল্লে, "মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া, বিদ্যা, সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মূর্খ বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফুটে!" তাই বলছি বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।'[৩৩] দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, পদ্মলোচন প্রভৃতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ পাণ্ডিত্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী তো বলেছিলেন, 'এঁকে দেখে প্রমাণ হ'লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।'[৩৪] তেমনি আবার ইংরাজীপড়া কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ বিদ্যাবত্তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আবার এইসব

৩১ কথামৃত ৪।১২।১

৩২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৯১ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৩৪৭। বর্ণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকলেও মূল ঘটনা এক।

৩৩ কথামৃত ১।১৭।৩

৩৪ কথামৃত ১।১৩,৫

ইংলিশম্যানদের সঙ্গে কথা বলার সময় Refine, like, honorary, society, under, tax, cheque, thank you ইত্যাদি চুটকি শব্দ ব্যবহার করে বিমল আনন্দ বিতরণ করতেন। ইংলিশম্যান মহেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন যে, বই পড়লেই জ্ঞান হয় না, ঈশ্বরকে জানার নাম প্রকৃত জ্ঞান। বিদ্যার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: 'আপনি সব জানেন— তবে খপর নাই।'

নিঃসন্দেহে শ্রীগদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসৃত বিদ্যাচর্যা ও চর্যার ধারা সম্পূর্ণ তাঁর স্বকীয় ও অভিনব। বিজ্ঞানীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ছিল, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' শ্রীগদাধর হতে শ্রীরামকৃষ্ণে উত্তরণের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে মৌলিক ভাবনা। তিনি অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ। যৌবনের প্রারম্ভে টোলের পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ রামকুমারকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'চাল কলাবাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন না, তিনি নিজে সেই বিদ্যা আয়ত্তও করেছিলেন। তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই বিদ্যা যে 'বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে'[৩৫] সেই 'বিদ্যা, যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।'[৩৬] তিনি এই বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন সুনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তাঁর মতে 'যার ঈশ্বরে মন সেই ত মানুষ। মানুষ আর মানহুঁস যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য সেই মানহুঁস।'[৩৭] বিদ্যা মানুষকে মানহুঁস করে; তার অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতা মানুষকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই বিদ্যায় বিদ্বান ব্যক্তি সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন '(বিদ্বান্) অমৃতঃ সমভবৎ'।[৩৮] এই বিদ্যালাভ করে মর মানুষ অমর হয়ে যায়, 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্'।[৩৯] বিদ্যালাভ করে মানুষ

৩৫ সুরেশচন্দ্র সঙ্কলিত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, ৩৫৫নং

৩৬ কথামৃত ৩।২।২

৩৭ কথামৃত ৩।২০।৩

৩৮ ঐতরেয় ৩।১।৪

৩৯ কেন ২।৪।

চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে চলে যায়, তার জ্ঞাতব্য কিছু বাকী থাকেনা। 'যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।'৪০

বিদ্যার্থী পুঁথি-পাটার সীমিত শক্তি সম্বন্ধে অনেক সময়েই সচেতন থাকে না, ফলে বিদ্যার লক্ষ্য হতে চ্যুত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী ও বিদ্যাধারী উভয়কেই হুঁশিয়ার করে বলেছেন, 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।'৪১ 'শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়।'৪২ শাস্ত্র ঈশ্বরতত্ত্বের সন্ধান দেয় মাত্র। তিনি শাস্ত্রানুরাগীদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে নজির দেখিয়ে। তিনি বলেছেন, 'শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।'৪৩ অজ্ঞাতজ্ঞাপক শাস্ত্র বিদ্বান শ্রীরামকৃষ্ণের চূড়ান্ত মাপকাঠি ছিল না, অপরোক্ষজ্ঞানই ছিল তাঁর তুলাদণ্ড।

বিদ্যার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত সম্পূর্ণ মৌলিক। তিনি বলতেন: 'এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্ত্তে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এসব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক, দ্বারবানদের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের খবর জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ে যাবে। খুব সহজে হয়ে যাবে। আগে রাম—তারপর রামের ঐশ্বর্য—জগৎ।'৪৪ তিনি নিজে ব্যাকুলতা ও অনুরাগের সাহায্যে শ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করেছিলেন, ক্রমে শাস্ত্রানুসারে সাধন ভজন করে ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় সগুণরূপ ও নিগুর্ণস্বরূপ বোধে বোধ করেছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি হয়েছিলেন সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন: 'তিন দিন ধরে কেঁদেছি, আর পুরাণ তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন।'৪৫ আবার লোকশিক্ষকের ভূমিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন: 'তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কি আর অভাব থাকে? দেখনা, আমি তো মুখ্যু কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা

---

৪০ গীতা ৭।২ ৪১ কথামৃত ৪।২০।৫ ৪২ কথামৃত ১।১২।৩

৪৩ কথামৃত ৩।১৫।২ ৪৪ কথামৃত ২।২২।১ ৪৫ কথামৃত ৪।২৪।৩

বলে কে ? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয় !··· আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আবার অমনি অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।'[৪৬] তাছাড়াও লৌকিক উপায়ে স্বচেষ্টায় তিনি অনেক ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছিলেন [৪৭] এবং সেই সকল শাস্ত্রবাণীর তাৎপর্য অপরোক্ষ জ্ঞানের আলোকে যাচাই করে নিয়েছিলেন।

বিদ্যার্জনের জন্য তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অনন্যসাধারণ একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন : 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল, কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশী-দর্শন অনেক তফাৎ।' [৪৮] তিনি বিদ্যার উপকরণ সংগ্রহের জন্য শ্রুতি-মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু সংগৃহীত উপকরণ স্বায়ত্তীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশী। তিনি বলতেন : 'দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।' [৪৯] দুধের কথা শুনলে বা দুধ দেখলে হবে না, দুধ জোগাড় করে খেলেও হবে না, সেই দুধ খেয়ে হজম করে শরীরকে পুষ্ট বলিষ্ঠ করতে হবে—এরূপ বাস্তবধর্মী ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিদ্বান শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণের এই শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা শুনতে পাই বৃদ্ধ মনুমহারাজের উক্তির প্রতিধ্বনি। তিনি বলেছেন : অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ। ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ ॥ [৫০] অর্থাৎ অজ্ঞ অপেক্ষা গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ ; শুধুমাত্র শব্দার্থ পাঠকের চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করেছেন। তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যার জ্ঞান হয়েছে। এবং এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করেছেন। সমগ্র একটি গ্রন্থাগার

৪৬ কথামৃত ১।১৭।৩

৪৭ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মন্তব্য করেছিলেন : কেন ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কি শাস্ত্র দেখে বিদ্বান হয়েছেন ? আর ইনিও ত ঐ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না ? উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভুল ধারণা সংশোধন করে দিয়ে বল্লেন : ওগো, আমি শুনেছি কত। (কথামৃত ২।২৫।২)

৪৮ কথামৃত ১।১৫।২

৪৯ কথামৃত ২।১৪।৩

৫০ মনুসংহিতা ১২।১০৩

স্মৃতিকোষে সঞ্চয়ের চাইতে পাঁচটিমাত্র সদ্ভাব জীবনে আয়ত্ত করার মূল্য অনেক বেশী। অধীত বিদ্যার সার্থকতা তখনই যখন অনুযায়ী জীবন বিকশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পরা ও অপরা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ে বিদ্যা সংগ্রহ ও স্বকীয় করেছিলেন। বহুজনহিতায় সেই বিদ্যা তিনি আবিশ্ব বিতরণ করেছিলেন। তাই তিনি সর্বলোকপূজ্য জগদ্গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার চর্চা ও চর্যাকে মানবজীবনভূমিতে যথানুপাতিক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ভারতগৌরব পরাবিদ্যাকে স্বমহিমায় পুনঃস্থাপন করেছিলেন। অপরাবিদ্যাকে দিয়েছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদা। শ্রীরামকৃষ্ণের অর্জিত বিপুল বিদ্যারাশি তাঁর জীবনে বোঝা না হয়ে হয়েছিল বিভূষণ, তাঁর মাধুর্য-মণ্ডিত চরিত্রের সুশোভন ঐশ্বর্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাবত্তায় ছিল না প্রখর উত্তাপ, সেখানে ছিল স্নিগ্ধ প্রশান্তি। সেই বিদ্যার বিমল কিরণের সংস্পর্শে শত শত জীবনকুমুদ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বর্ত্তমানেও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল তিনি কৈবর্তের ঠাকুরবাড়ির পুরুত, একজন পাগলাটে বামুন। রাজধানী কলকাতার ইংরেজী শিক্ষিতদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তৎসত্ত্বেও কিছু লোকের মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি উপলব্ধিবান পুরুষ, ঈশ্বরবেত্তা মহাজন, পরমহংস; আবার দু'চারজন লোক জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। তবুও তিনি নিরক্ষর বৈ তো নয়। কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মহাজ্ঞানী। তদানীন্তনকালের শিক্ষিত-যুব-মানস তাঁর জ্ঞানরশ্মির আলোকে চঞ্চল হয়েছিল, প্রাজ্ঞচিত্তেরা হয়েছিলেন বিমোহিত। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে তাঁর জীবনের শেষপাদে দেশের সেরা সেরা মানুষেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছিলেন তাঁর কাছে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য।

'মূর্খ', 'নিরক্ষর', 'গ্রাম্য' ইত্যাদি অপবাদে অনেক সময় ভূষিত হলেও তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষক, লোকশিক্ষক, যুগ-প্রবর্তক ঋষি। সুপণ্ডিত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: 'আমি একজন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, সভ্যতাভিমানী, স্বার্থান্বেষী, অর্ধসংশয়বাদী, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি দরিদ্র মূর্খ অসভ্য অর্ধ-পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দুসাধু। যে আমি ডিসরেলী, ফসেট, ষ্ট্যানলী, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্মযাজকদের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকি কেন ?...কেন আমি বাক্‌শূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে থাকি ? শুধু আমি বলিয়া নয়, আমার ন্যায় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে।' বিশিষ্ট সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন: 'বিভ্রান্তিকর বিস্ময় নিয়ে তাঁর কথা শুনত খ্যাতনামা বক্তা, লেখক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনেতা প্রভৃতি; এবং যতই তারা শুনত ততই বেড়ে যেত তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তার কারণ, তাঁর কথার মত কথা অপর কাউকে বলতে তারা কখনও শোনে নি। তারা প্রাণে প্রাণে

অনুভব করত তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে শক্তি, রয়েছে লালিত্য, উত্তাপ অথচ-প্রশান্তি।'

তাঁর পরিচিতদের মধ্যে দেখতে পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের; দয়ানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, পদ্মলোচন, গৌরীপণ্ডিত, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি শাস্ত্রবিদদের; ধর্মবিজ্ঞানে অগ্রণীদের মধ্যে তোতাপুরীজী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি দিকপালদের; সাহিত্যসেবীদের মধ্যে মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অধরলাল প্রভৃতি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখতে পাই মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনিই তাঁর সঙ্গসুধা পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন, নবীন আলোকে নিজ নিজ জীবনপথকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। ষড়-দর্শনবিদ্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিস্মিত হয়ে শুনেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন: 'আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই।' আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বলেছিলেন: 'এঁকে দেখে প্রমাণ হ'লো যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।' বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের এই ধরনের স্বীকৃতির আলোকে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের 'আমি মূর্খোত্তম' 'আমি তো মুখ্যু ইত্যাদি মন্তব্য তাঁর বিদ্বজ্জনোচিত বিনয়কে নির্দেশ করে মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠকমাত্রই জানেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিরক্ষর অপবাদ অতিকল্পনাদোষে দুষ্ট। তিনি সাক্ষর ছিলেন এইমাত্র বললেও ভুল হবে, শিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলে তাঁকে বলতে হবে শিক্ষিতোত্তম। তিনি যে বিদ্যাশিক্ষা সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন তাই নয়, অপরের মধ্যে সেই বিদ্যা সঞ্চারের অত্যাশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মৌলিকতা শিক্ষাজগতে একটি পরম বিস্ময়। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিক্ষার্থী নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথার্থই বলেছিলেন: 'When I think of that man, I feel like a fool, because I want to read books and he never did...he was his own book.'

শিক্ষালাভের প্রধান অবলম্বন মন। শিক্ষার্থীর মনের উপর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলেছিলেন: 'মনের বাহিরে জড় শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলাবামুন

লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, পিটত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।' সেই কারণে শিক্ষা বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ অধিকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল সমগ্র জীবনকে নিয়ে। শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ধারিত হ'ত বিভিন্ন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী। দর্শনের ছাত্র তাঁর কাছে দর্শনতত্ত্ব শিখতেন, ধর্মসাধক তাঁর কাছে নিতেন সাধনভজনের উপদেশ-নির্দেশ, সংসারী জেনে নিতেন সহজ জীবনযাত্রার উপায়। শুধু কি তাই? আমরা দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে নাট্যকার অভিনয় সম্বন্ধে, সঙ্গীতজ্ঞ সুরের তাৎপর্য সম্বন্ধে, চিত্রশিল্পী চিত্র সম্বন্ধে নিত্যনূতন জ্ঞান ও ভাবালোক লাভ করেছেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের সকল প্রকার শিক্ষাদানই ছিল জীবনকেন্দ্রিক—মানব জীবনের মূল লক্ষ্যাভিমুখী।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। তিনি বলতেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না-জানার নাম অজ্ঞান। ঈশ্বর মন-বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি বা শুদ্ধমনের গোচর। ঈশ্বরই সত্য। ব্রহ্মবস্তুই ত্রিকালারাধিত নিত্যসত্য। ব্রহ্মে অজ্ঞান থাকে না, তাই ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অপর সবকিছু বিষয়ের জ্ঞানে বন্ধন আনে। তাই পার্থিব জ্ঞান অজ্ঞানের নামান্তর। পরমচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা বা বোধে বোধ করার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানে অনাদি অজ্ঞানের নাশ হয়, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়; মানুষের সংসারবন্ধন খসে পড়ে, মানুষ চিরমুক্তি লাভ করে। তখন ঈশ্বর ভিন্ন পার্থিব জ্ঞানে প্রীতি জন্মালেও মায়ার সংসারবন্ধনে সে আর বাঁধা পড়ে না।

লেখাপড়া জ্ঞানলাভের আগে না পরে, এই প্রশ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপাগত শিক্ষার্থীদের মনে উঁকিঝুঁকি মারত। কারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই তাদের জীবনের প্রথম অধ্যায়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সব শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'এরা ভাবে আগে লেখাপড়া, তারপর ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু যদু মল্লিকের সঙ্গে যদি আলাপ কর্ত্তে হয় তাহলে তার কখানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানীর কাগজ এ সব আগে আমার অত খবরে কাজ কি? যো সো করে—স্তব করেই হোক্, দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক, কোন মতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। আর যদি টাকাকড়ি ঐশ্বর্যের

ঠেলাঠেলি। তোমার হাতেই যে লণ্ঠন রয়েছে।" গল্প শুনে হেসে ওঠে শ্রোতারা, কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা শোনে শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে গল্পের নীতি-সার : 'যা চায়, তাই তার কাছে। অথচ লোকে নানাস্থানে ঘুরে।' আবার তাঁর গান : 'যা চাবি তা খুঁজে পাবি, দেখ নিজ অন্তঃপুরে', শিক্ষার্থীর অন্তরে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেয় সহজ ও অভ্রান্ত সত্যটুকু।

যাবতীয় অনর্থের কারণ ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞান এবং এ-ভ্রম, অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান হতে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মস্বরূপের উপলব্ধি—আত্মচৈতন্যই যে বিশ্বচরাচরের প্রাণ, প্রতিষ্ঠা ও কারণ, এই সত্যজ্ঞানের অনুভূতি! লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ এই গভীর-তত্ত্বটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলেছেন : 'মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ; সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান; রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, "বিষ নাই" জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি "আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত," এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।'

কিন্তু কি প্রক্রিয়াতে অজ্ঞানের কারাগার ভেঙ্গে আলোক প্রবেশ করে, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে রামকৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য শুনতে হবে। তিনি পাতঞ্জল যোগসূত্রের 'ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ' ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন : 'যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না। ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, শুধু মধ্যে কপাটের দ্বারা ঐ জল রুদ্ধ আছে। কৃষক সেই কপাট খুলিয়া দেয় এবং জল স্বতঃই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে ক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সর্বপ্রকার উন্নতি ও শক্তি পূর্ব হইতেই প্রত্যেকের ভিতর রহিয়াছে। পূর্ণতা মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, প্রবাহিত হইবার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ বাধা সরাইয়া দিতে পারে, তবে প্রকৃতিগত শক্তি সবেগে প্রবাহিত হইবে; তখন মানুষ তাহার নিজস্ব শক্তিগুলি লাভ করিয়া থাকে।' প্রত্যেক মানুষের পিছনে রয়েছে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সত্তা, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার; কিন্তু মানুষ দুর্বল আধার। তার অপটু দেহ ও অশিক্ষিত মন সেই অনন্ত শক্তির বিকাশে বাধা দিচ্ছে। অভ্যাস ও অনুরাগের সাহায্যে মানুষের মন যতই সংস্কৃত ও একাগ্র হতে থাকে, ততই সত্ত্বগুণের আধিক্য হতে থাকে, ততই মনের অসীম শক্তি ও শুদ্ধত্ব প্রকাশিত হতে থাকে।

শিক্ষার উপাদান সংগ্রহের চাইতে উপাদানের সংগ্রহ, গ্রহণ, ধারণ ও স্বায়ত্তীকরণের মূল যন্ত্র যে মন তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সমধিক গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষালাভের প্রধান হাতিয়ার মন। মনের স্বভাব হচ্ছে ধোপার ঘরের কাপড়ের মত। সেই কাপড়কে লালে ছোপালে লাল, নীলে ছোপালে নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। মনের এই স্বভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথাবার্তা, চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্ত-সঙ্গে রাখো, তা হলে ঈশ্বরচিন্তা, হরিকথা—এইসব হবে।'

শিক্ষার্থীর সমস্যা, মন তার বশে নাই। সে ধুবির মত ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রঙে মন-কাপড়কে রাঙাতে শেখে নি। সংস্কারবশে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তার মনে যে রঙ ধরে সে সেই রঙের মন-চাদরকে গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার আকাঙ্ক্ষা সে মনের কাঁধে চেপে চলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মন-ই তার কাঁধে চেপে বসেছে। সে অসহায় ভাবে লক্ষ্য করে, তার মন যেন সরষের পুঁটুলি; পুঁটুলি ছিঁড়ে গেলে বা তার বাঁধন খুলে গেলেই সরষেগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি কুড়ান ভার। তেমনি তার মনও যেন ছড়িয়ে পড়েছে, সেই মনকে কোন বিষয়ে স্থির করা এক কঠিন সমস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'মনটি পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনা কাপড় চাও, তাহলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে।' ছড়ান মনকে গুটান ও লক্ষ্যে স্থির করাই সাধনা—শিক্ষানবিসের প্রথম ও প্রধান সাধনা। উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার উপদেশ দিয়েছেন: 'অভ্যাস যোগ! অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।' নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করতে হবে। সেই অভ্যাসের সঙ্গে চাই অনুরাগ। অভ্যাস ও অনুরাগ এই দ্বিমুখী আক্রমণে মনকে বশে আনতে হবে, বশীভূত মনকে একমুখী করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'কথাটা এই; মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ! যোগী মনের বশ নয়।' অভ্যাস ও অনুরাগের সাহায্যে মনকে একাগ্র করতে হবে; সেই একাগ্র মনের লক্ষণ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'একাগ্র হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়, আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয় সে নিজে টের পায় না।' 'যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্‌শূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন: 'আমরা

বলি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্যবিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিমুখকে আত্মাভিমুখী করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে "যোগ" আখ্যা দিয়া থাকি।...তাঁহারা (যোগীরা) বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্য ও আন্তর, উভয় জগতের সত্যই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মন একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং ঘুরাইয়া উহার উপর প্রয়োগ করিলে আমাদের ভিতরের সমস্তই আমাদের প্রভু না হইয়া আজ্ঞাবহ দাস হইবে।' তিনি রাজযোগ গ্রন্থে আরও বলেছেন: 'একাগ্রতার অর্থই এই —শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত করা। আর এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়'। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন কি ভাবে মনকে মল-মুক্ত করতে হবে, কি ভাবে সেই মনকে একাগ্র ও শক্তিসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার গণ্ডী খুবই সঙ্কীর্ণ। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি টোলের পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ রামকুমারকে মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'এই চালকলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না, আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই যাতে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়, মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।' তিনি নিজের জীবনে দেখিয়েছেন সেই বিদ্যা যে 'বিদ্যায় বুদ্ধি শুদ্ধি করে', 'সেই বিদ্যা', যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।' তিনি বলতেন যে সেই চাতুরীই চাতুরী, যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিও আয়ত্ত করেছিলেন এই পরমবিদ্যা। এই বিদ্যা সম্বন্ধেই বৈদিক ঋষি বলেছিলেন, 'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্', 'বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে'।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পুঁথিপাটার উপর জোর। কিন্তু পুঁথিপাটার শক্তি সীমিত। এই সীমিত ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর পুঁথিপাটার মোহজালে আটক পড়ার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, বলেছেন: 'শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?' তিনি আবার নিজেই একটি অনবদ্য গল্পাংশ বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর বাণীর মর্মার্থ। তিনি বলেছেন: 'চিঠিতে খবর এসেছে—"পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইব', আর একখানা রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা।" তখন চিঠিখানা আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার? এখন

সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হল।' গ্রন্থের শব্দার্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে মর্মার্থের উপর জোর দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি চাইতেন, শিক্ষার্থী হবে গ্রন্থবেত্তা, গ্রন্থকীট নয়।

গ্রন্থের শব্দারণ্য ভেদ করে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ শুধু পরিশ্রমসাধ্য নয়, সময়ে সময়ে দুঃসাধ্য। তাছাড়া গ্রন্থের শব্দার্থের চাইতে মর্মার্থ-ই যদি লক্ষ্য হয়, সেইক্ষেত্রে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন: 'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল; কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শোনা আর কাশীদর্শন অনেক তফাৎ।' শাস্ত্র অজ্ঞাতজ্ঞাপক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তাঁর অপরোক্ষজ্ঞানসঞ্জাত অভিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞান। যাচাইয়ের চূড়ান্ত তুলাদণ্ড।

শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবধর্মী। তিনি লক্ষ্য করে'ছলেন যে পুঁথিপাটা থেকে বা গুরুমুখ থেকে বিদ্যার উপাদান সংগ্রহ করা কিছু কঠিন কাজ নয়। আসল সমস্যা অধীত বিদ্যার স্বায়ত্তীকরণ, শিক্ষার্থীর জীবনে বিদ্যার প্রতিফলন। সে কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃ-পুনঃ বলতেন: 'দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।' দুধের কথা শুনলে হবে না, দুধ দেখলে হবে না, এমন কি দুধ জোগাড় করে খেলেও হবে না, সেই দুধ হজম করে শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করতে হবে। এরূপ বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করতেন বলেই তাঁর শিক্ষাদান ছিল মর্মস্পর্শী ও আশু ফলপ্রদ। বাস্তবধর্মী শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা শুনতে পাই মনুর বাণীর প্রতিধ্বনি। মনুসংহিতা বলছে, 'অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা, গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ। ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা, জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥' অজ্ঞানীর চাইতে গ্রন্থের পাঠক শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র অর্থবোধকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি পঠিত বিষয় ধারণা করেছেন। তাঁর চাইতেও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর জ্ঞান হয়েছে। আর এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই যিনি লব্ধ জ্ঞান অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করেছেন। শিক্ষার সার্থকতা তখনই যখন শিক্ষার আদর্শ শিক্ষার্থীর জীবনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায়োগিক (Pragmatic) শিক্ষাচিন্তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর ষোল-আনা গুরুত্ব। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই যে শিক্ষার্থীর মন ও মুখ সুসমঞ্জসভাবে

চলে না। মন ও মুখের দ্বৈত প্রবণতা শিক্ষার্থীর মনে সৃষ্টি করে দ্বিধা ও সংশয়। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। তিনি শিক্ষার্থীর মনটি গড়ে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতেন, যাতে শিক্ষার্থীর মনের ভাব ও বাইরের আচরণে মিল থাকে। শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক, মন ও হাত যেন একই ছন্দে সঞ্চালিত হয়; অর্থাৎ উদ্দেশ্য—শিক্ষার্থীর জীবনের সুষম বিকাশ। এটি আয়ত্ত করা কঠিন সাধনা। কিন্তু এটি আয়ত্ত না হলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও 'মানহুঁস হওয়ার' শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলছে, "তুমি আমার সর্বস্ব" এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।'

আত্মবিকাশের পথে একান্ত প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বকীয় প্রবণতা অনুযায়ী স্ফুরণের সুযোগ। শিক্ষকের অসঙ্গত শাসনে শিক্ষার্থীর শক্তির স্ফুরণ অনেক সময়েই বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার বিকাশোন্মুখ সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়। বীজকে জল, মাটি, বায়ু প্রভৃতি তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জুগিয়ে দিলে বীজ নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের স্বভাব অনুযায়ী বাড়তে থাকে; শিক্ষকও তেমনি শিক্ষার যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও উদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে দিবেন এবং তার বিকাশের পথে বাধাগুলি দূর করে দিয়ে তার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখবেন মাত্র। তিনি প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন, নইলে সে যে সহজগতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ আদর্শস্থানীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র, শিক্ষার্থীর আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন। আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করছে শিক্ষার্থীর অভ্যুদয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যই এই ছিল যে তিনি কারুরই বিশ্বাস নষ্ট না করে প্রত্যেককেই কিছু মহৎ ভাব জুগিয়ে দিতেন। শিক্ষার্থী যে যেখানে আছে তাকে সেখান হতে অগ্রসর করিয়ে দিতেন। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা, সচ্চরিত্র-অসচ্চরিত্র সকলকেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী গড়ে উঠবার জন্য এগিয়ে যাবার আদর্শ বা positive ideas দিতেন। মানুষ নিজেকে দীনহীন ভেবে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে, নির্জীব হয়ে পড়ে, ফলে তার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তি স্ফুরিত না হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ উদার ও দরদী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করে তাঁর অন্যতম শিক্ষার্থী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে

করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার!' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, মন্দ লোককেও 'ভাল' 'ভাল' বললে সে ভাল হয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্যই ছিল মানুষকে এগিয়ে দেওয়া। তিনি বিভিন্ন পটভূমিকায় বলতেন অভ্যুদয়কামী কাঠুরের গল্প। গরীব কাঠুরেকে এক ব্রহ্মচারী উপদেশ দিয়েছিলেন, 'ওহে, এগিয়ে পড়ো।' তাঁর উপদেশ অনুসরণ করে কাঠুরে এগিয়ে যেতে থাকে; ক্রমে সে আবিষ্কার করে চন্দনের বন, তারপর খুঁজে পায় তামার খনি; আরও এগিয়ে গিয়ে পায় রূপোর খনি ও শেষ পর্যন্ত রাশীকৃত হীরে মাণিক। কাঠুরের দারিদ্র্য ঘুচে যায়, তার কুবেরের মত ঐশ্বর্য হয়।

জ্ঞানের পরিধি অনন্তপ্রায়, মানুষের শেখারও শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতেন এগিয়ে যাবার জন্য। নানানভাবে তাদের প্রবোধিত করতেন জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে জ্ঞানাতীতকে লাভ করার জন্য। তিনি যেমন উপদেশ দিতেন তেমনি নিজের জীবনে আচরণ করতেন। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের এলাকা অতিক্রম করে বিজ্ঞানীর স্তরে উন্নীত হয়েও নিজে চিরশিক্ষার্থীর আদর্শ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত, 'সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' তাই শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ অনুপম; শিক্ষাজগতের একজন প্রধান দিশারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'গীতার মত—যাকে অনেকে গণে মানে, তার ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি আছে।'১ মহৎ চরিত্র, বিদ্বান পণ্ডিত, বৈরাগ্যবান সাধু, পরহিতকারী সমাজ-সেবক, এই সকলের মধ্যে বিভু ঈশ্বরের বিভূতির বিশেষ প্রকাশ ; সেই কারণেই বোধ করি বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর আগ্রহ ও অদম্য কৌতূহল দেখা যেত।২

সেই সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনে বঙ্গসমাজ বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় বিশেষভাবে আলোড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদের উপাসনা দেখবার জন্য ও ব্রাহ্ম ভজনসঙ্গীত শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭১ বঙ্গাব্দ) একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্যরূপে বেদী অলঙ্কৃত করছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মুখে শোনা যায়, সে সময়ে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হয়েছিল। উপাসনাবেদীতে উপবিষ্ট ব্রাহ্ম উপাসকগণের মধ্যে একজন যুবকের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পারেন যে, যুবকের মন ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ। পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, 'বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছে, দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।৩

২ 'The Paramhamsa has a passion for great minds. His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate.'

[The New Dispensation, 3rd Sept. 1882]

তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাত্‌না ডুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপুসকল ভিতরে কিলবিল করছে।'[৩] তখন কেশবচন্দ্রের বয়স ছাব্বিশ বছর।

আদর্শগত বিরোধের জন্য কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান,[৪] তাঁর সৌম্যমূর্তি ও ভগবৎ-বিশ্বাস-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু, এবং বিশুদ্ধ ইংরাজীতে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা ইংলণ্ডবাসীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং কেশবচন্দ্রকে আপ্যায়ন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কেশবচন্দ্রের খ্যাতি দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

সে সময়ে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। সেই কালে ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁর মত মেধাবী, প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠাশালী, নামজাদা ব্যক্তি

---

৩ 'ধর্মতত্ত্ব' ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শকাব্দ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কয়েকটি স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে তাঁর অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: "জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব সেন বেদীতে বসে ধ্যান করছে, তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজোবাবুকে বললাম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার ফতা (ফাত্‌না), ডুবেছে,—বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।" কথামৃত, ৩।১৪।৩

Shibnath Sastri : History of the Brahmo Samaj : p. 193—

কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) আচার্যপদে বৃত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

৪ কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন ১৮৭০ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ইংলণ্ড থেকে ভারতের পথে যাত্রা করেন ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

৫ কলিকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিল: "When Keshab speaks, the world listens'. আবার কেশবের মৃত্যু উল্লেখ করে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলার লিখেন: 'India has lost her greatest son, Keshabchandra Sen.' Life and Letters of F. Maxmuller, Vol 11. Quoted in 'Lectures in India by Keshabchandra Sen', Introduction, p. III

খুব কমই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাসনা হয় কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন।'[৬] 'এই লোক (কেশব) দ্বারা মায়ের কাজ হইবে ইহা তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন।'[৭] কেশবচন্দ্রকে দেখতে যাবার পূর্বে এক দিব্যদর্শনের মধ্যেও তিনি শ্রীজগন্মাতার নির্দেশ পান। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন: 'কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে, তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় দেখলাম, কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—"ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো।" মাকে বললাম, মা, এদের ইংরেজী মত,—এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল।'[৮]

---

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধক ভাব, পরিশিষ্ট, পৃ: ৩৭৮ (তৃতীয় সংস্করণ)

৭ চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল রচিত 'কেশবচরিত' (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ: ২৪৯

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।২৪।৩

চিরঞ্জীব শর্মা, ঐ, পৃ: ২৪৭। 'ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তিলীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।'

ধর্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক। 'পরমহংসদেবের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি পরমহংস হইতেই আচার্যদেব বিশেষ ভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে।'

বেদব্যাস, মাঘ, ১২৯৪: '......শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তিগদগদভরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে "নববিধান" প্রসব হয়।'

তিনি নিজে যাওয়ার পূর্বে ভক্ত নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবচন্দ্রের নিকট অগ্রদূত পাঠান। নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে তাঁর অভিমত নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, 'কেশবসেনকে দেখবার আগে নারাণ শাস্ত্রীকে বললুম, 'তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক।' সে দেখে এসে বললে, লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানতো—বললে, 'কেশবসেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালায়) কথা কইল।"[৯]

১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন বা চৈত্রমাসে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র সেনের কলুটোলার বাসভবনে উপস্থিত হন। সেদিন ১৪ই মার্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।[১০] সেখানে জানতে পারলেন যে, কেশবচন্দ্র অনুপস্থিত। তিনি সহধর্মী বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেলঘরিয়ার এক তপোবনে সাধনভজন করছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের অদূরবর্তী বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটী। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত "ভারত আশ্রম" সে সময় ঐ উদ্যানবাটীতে অবস্থিত ছিল। "ভারত আশ্রম একটি সুবৃহৎ সাধু-অনুষ্ঠান।...বেলঘরিয়ার উদ্যানে ইহার কার্য প্রথম আরম্ভ হয়। একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় পানভোজনের ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। যথানির্দিষ্ট সময়ে একত্রে সকলে উপাসনা করিতেন। নিয়ম অনুসারে সমুদায় কার্য নির্বাহিত হইত।"[১১]

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৫।৩, কেশবচন্দ্র সেনও শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্য 'প্রসন্ন' ও অপর দুই ব্রাহ্মভক্তকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠান। রাতদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তারা কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন। এই ঘটনা অবশ্য প্রথম সাক্ষাতের পরে।

১০ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত "আচার্য কেশবচন্দ্র"—পৃষ্ঠা ১০৪১ হতে গৃহীত। সেবক রামচন্দ্র প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' পৃ: ৬০, উল্লিখিত সময় ইংরাজী ১৮৭২ খৃঃ অথবা ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শকে প্রকাশিত। 'ধর্মতত্ত্বে' উল্লিখিত ১৮৭২ সাল গ্রহণযোগ্য নয়।

১১ চিরঞ্জীব শর্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) রচিত "কেশবচরিত"।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত: মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ (পৃঃ ১৬৫): "ভারতাশ্রম কলিকাতার জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় (১২৭৭ সন, ফাল্গুন মাসে)...পরে সেখান হইতে আশ্রম কাঁকুড়গাছি উদ্যানে উঠিয়া যায়।"

P. C. Mazoomdar: The Life and Teachings of Keshab-

পরদিন অর্থাৎ ১৫ই মার্চ১২ সকালে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীতে১৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়রামকে সঙ্গে নিয়ে কেশবদর্শনে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে জগন্মাতাকে বলেন, 'মা, যাবি? কেশবকে দেখতে যাবি?' এরূপ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করে পরে নিজেই উত্তর দেন, 'যাব'। গাড়ীতে বসেও ভাবাবেগে জগন্মাতার সঙ্গে কতই কথাবার্তা বলতে থাকেন। বেলঘরিয়ার উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হন সকাল আটটা কি নয়টার১৪ সময়।

chandra Sen, pp. 254-56 "...Keshab established in February 1972 the institution known as Bharat Ashram. It was a kind of religious boarding house....He meant it to be a modern apstolic organisation, where the inmates should have a community of all things, and where every worldly relation should be merged in spiritual fellowship. Carefully framed rules and enlightened disciplines were laid down for the daily guidance of the men and women......The common meals, common studies, common devotions, common work—the whole system of Bharat Ashram life was intended to make the brethren and sisters entirely one in mind and spirit." একটি পত্রিকায় ভারতাশ্রমের বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা সুরু হয়। প্রতিবাদে মামলা রুজু করা হয়। Bharat Ashram Libel Suit কলিকাতা হাইকোর্টে শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫ খৃঃ। কেশবচন্দ্র ঐ বাগানবাড়ীতে তখন পর্যন্ত ছিলেন।

১২ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বিরচিত "কেশবচরিত" পৃঃ ১০৪১। এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করে ১৮৭৫ খৃঃ ২৮শে মার্চ, তারিখের The Indian Mirror পত্রিকা: "A Hindu Saint—We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful,......"

১৩ গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত (১৪৮-৪৯)

১৪ লীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব), পৃঃ ৩২৮, স্বামী সারদানন্দজী, লিখেছেন,

উদ্যানবাটীর ফটকে গাড়ী উপস্থিত হলে হৃদয়রাম উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করে কেশবচন্দ্রকে সংবাদ দেন যে, তাঁর মাতুল হরিকথা শুনতে বড় ভালবাসেন, হরিনাম শুনে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতে এসেছেন। কৌতূহলাক্রান্ত কেশবচন্দ্র মাতুলকে নিয়ে আসার জন্য হৃদয়রামকে অনুরোধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম উদ্যানের ফটক দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে উদ্যানের মধ্যে বড় পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘাটে নেমে হাত পা ধুয়ে নেন। সে সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা-শেষে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণ সহ পুষ্করিণীর পূর্বদিকের বড় বাঁধান ঘাটে বসেছিলেন। তাঁরা স্নানের উদ্যোগ করছিলেন। তাঁরা দেখতে পান প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের ক্ষীণকায় এক ব্যক্তিকে নিয়ে দেখতে মোটাসোটা হৃদয়রাম তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। "তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল।"[১৫] তাঁহার পরনে একটি সাধারন লালপেড়ে ধুতি। গায়ে কোন জামা ছিল না, ধুতির খুঁটখানি বাম

"হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ন আন্দাজ দুই ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলেন।" হৃদয়রামের সূত্র ধরে গুরুদাস বর্মন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিতে (পৃঃ ১০৮) লেখেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ বিকাল তিনটার সময় বেলঘরিয়ায় যান।" অক্ষয় সেনের মত: "স্নানের সময় বেলা প্রহরেক প্রায়। হৃদুসঙ্গে প্রভুদেব গেলা বাগিচায়॥" পুঁথি, ২২৫

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কেশববিরোধী ছিলেন এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বিধর্মী কেশবচন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া পছন্দ করতেন না। সে ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে কেশবের কাছে গিয়েছিলেন মনে করা সঙ্গত হবে কি? অপরপক্ষে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার রিপোর্টার ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি নিজে উপস্থিত ছিলেন না) লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাড়া করা ছ্যাকড়া গাড়ীতে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হৃদয়রাম কথিত বিবরণ ছাড়া অপর সকলের বিবরণীতে জানা যায় তাঁরা সকাল ৮।৯টার সময় বেলঘরিয়ায় পৌছান। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করলে এই সময়-নির্দেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

১৫ উপাধ্যায় গোবিন্দ রায়: "আচার্য কেশবচন্দ্র", ধর্মতত্ত্ব, ১৪ই মে,

কাঁধের উপর ঝুলানো। খুব সম্ভবতঃ পায়ে কোন জুতা ছিল না। স্বভাবতই ব্রাহ্ম প্রচারকগণের অধিকাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু দেখতে পাননি। তাঁরা মনে করেন ইনি একজন সামান্য ব্যক্তি।১৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত ব্রাহ্মভক্তদের বিনম্র নমস্কার করলে, মনে হয় কেশবচন্দ্র বা উপস্থিত অপর কেহ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিনমস্কার১৭ করেননি। অভ্যাগতদের বসবার জন্য আসন দেওয়া হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমেই বললেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানতে চাই।" এইভাবে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হল। এই সৎপ্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ হল কেশবচন্দ্রের জীবনে নূতন এক

১৮৭৫ লেখেন, "(পরমহংসদেব) এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্বদা বিভুগুণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাপার ঘটিয়াছে।"

'ধর্মতত্ত্ব', ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬, ঐ সাক্ষাতের বিবরণীতে লেখে, (পরমহংসদেবের) "দেহ জীর্ণ ও দুর্বল।"

১৬ P. C. Mozoomdar : The Life and Teachings of Keshabchandra Sen : page 357 "His appearance was so unpretending and simple, and he spoke so little at his introduction, that we did not take much notice of him at first." শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনের মতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। "কি ছবি ধরিয়া অঙ্গে অগ্রে দেখ মন। কেশবের সন্নিকটে প্রভুর গমন॥ বাসনা-বর্জিত যেন হৃদয়ের থলি। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কাঙ্গালী॥ ব্যাকুলতা একাগ্রতা দীনতা সংহতি। হরিগত মন প্রাণ তাঁর স্থিতি গতি॥ ভক্তি প্রীতি এক মতি মূর্তির গঠন। দেখিয়া শ্রীকেশবের না সরে বচন॥" (পৃঃ ২২৬)

১৭ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান গ্রন্থে জানা যায় সেই সময়কার কলিকাতার সমাজে নমস্কারাদি করার বিশেষ চলন ছিল না। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি থেকে জানতে পারি, "কলুটোলার বাড়ীতে দেখা হ'ল, হৃদে সঙ্গে ছিল, কেশব সেন যে ঘরে ছিল সেই ঘরে আমাদের বসালে।......তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা নাই।......তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।১৫।৪

অধ্যায়,১৮ ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রথম প্রকাশ্যভাবে প্রচার।১৮ক,খ

১৮ P. C. Mozoomdar : ibid : pp.357-59 :

"Sometime in the year 1876 in a suburban garden at Belgharia, a singular incident took place. There came one morning in a ricketty ticca gari, a disorderly-looking youngman, insufficiently clad, and with manners less than insufficient. He was introduced as Ramkrishna, the Paramhansa (great devotee) of Dakshineswar.......But soon he began to discourse in a sort of half delirious state becoming now and then quite unconscious. What he said, however, was so profound and beautiful that we soon perceived he was no ordinary man. A good many of our readers have seen and heard him. The acquaintance of this devotee which soon matured into intimate friendship, had a powerful effect upon Keshub's catholic mind. The very first thing observable in the Paramhansa was the intense tenderness with which he cherished the conception of God as Mother......The purity of his thoughts and relations towards women was most unique and instructive. It was the opposite of the European idea. It was an attitude essentially, traditionally, gloriously national."

১৮ক কেশবচন্দ্রের ভাবজগতে যে বিশাল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে তার প্রমাণস্বরূপ বাগ্মী কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

Keshubchandra Sen's speech on "Hindu Theism" at the Union Chapel, Islington, Eng. on June 7, 1870. "......and if He (God) is really merciful and anxious for he salvation of men, then certainly He must interpose to remove all the errors of idolatry and caste, and give the Hindu nation a better form of religious and national life.......We desire that

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা চলতে থাকে।

কিছু সময় পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচ্য বিষয়োপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান ধরলেন, "কে জানে মন কালী কেমন,ষড়্‌দর্শনে মিলে না দরশন" ইত্যাদি। অমৃতবর্ষী মধুকণ্ঠের সঙ্গীত বেলঘরিয়ার তপোবনে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করল। সঙ্গীতের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন করার পূর্বেই ব্রাহ্ম প্রচারকগণ অবাক হয়ে দেখেন

Christian missionaries should help the Theistic missionaries of India in gathering up the elements and materials which exist for the development of a better Hindu life." [Keshubchandra Sen in England : Navavidhan Publication. Comm.273-74]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরবর্তী বাৎসরিক ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেন, "Verily, verily, this Brahmo Samaj is a ridiculous caricature of the church of God. Such an assertion may startle many here present, but it is nevertheless true. (pp. 260)......So there is condemnation within and without. (p. 263)...... Let us look upon Hindu and Christian brethren as our elders, and humbly sit at their feet to learn those things in which they excel us. Brethren, check all desire of vain glory. Cast away proud antagonism and sectarian malice." (p. 268), "Lectures in India" by Keshub C. Sen (fourth edn.), Lecture on "Our Faith and our Experiences" on Jany. 22nd, 1876. কেশবচন্দ্রের মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট শোনা ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। "আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ (সাধক ভাব), পৃঃ ৪০৪। Bipin Chandra Pal : 'Saint Bijoy Krishna Goswami' p. 3. "The meeting of Ramakrishna with Keshub was an important event in our modern religious and spiritual history".

গায়ক বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। স্পন্দহীন দেহ, স্থির দৃষ্টি, প্রফুল্ল আনন, প্রেমাশ্রু-বিগলিত রক্তাভ নয়ন—শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রার্পিতের ন্যায় সমাধিস্থ মূর্তি দর্শন করে প্রচারকগণ বিস্মিত হন বটে, কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন না। উপরন্তু অনেকে মনে ভাবেন, এই অবস্থা একটা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত অথবা কোন ধরনের এক ভেল্কিবাজী। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত করার জন্য ভাগিনেয় হৃদয়রাম গম্ভীরস্বরে ওঁকারধ্বনি করতে থাকেন এবং উপস্থিত সকলকে ওঁকার উচ্চারণ করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা ভাবেন, এ আবার কি ভেল্কি? ব্যাপার কি হয় দেখার জন্য হৃদয়কে অনুসরণ করেন। মিলিতকণ্ঠের ওঁকারধ্বনি তপোবনের পরিবেশ মাধুর্যময় করে তোলে। "পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল।"[১৯] তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইরূপ অর্ধবাহ্যদশায় তিনি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল ছোটখাট দৃষ্টান্তের সাহায্যে সরল ভাষায় বলতে থাকেন; মিষ্ট সহজ সরল কথা উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মপ্রচারকগণের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর বাণী শুনতে থাকেন। "তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।"[২০]

এখন শ্রীরামকৃষ্ণই প্রবক্তা।[২১] কেশবচন্দ্র ও উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠের বাণী শুনতে থাকেন। কিছুটা গ্রাম্য ভাষায়, প্রাত্যহিক জীবনে দৃষ্ট বিষয়সকল উদাহরণ দিয়ে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে থাকেন। আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্টতায়, ততোধিক প্রকাশভঙ্গিমার অভিনবত্বে সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় বলতে থাকেন,[২২] "ঈশ্বরকে যে ভক্ত যেরূপ দেখে

১৮খ চিরঞ্জীব শর্মা: ঐ:, পৃ: ২৪৬, "রামকৃষ্ণের প্রকৃত মহত্ত্ব যাহা কিছু, কেশব দ্বারা জগতে তাহা প্রথম প্রচারিত হয়।"

১৯ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় রচিত "আচার্য কেশবচন্দ্র", পৃ: ১০৪৩

২০ 'ধর্মতত্ত্ব', ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক

২১ Sevak Priyanath Mallick : Prabuddha Bharat : 1936. 'At such meetings Ramakrishna almost monopolized the conversation. Keshubchandra hardly said anything. He only expressed his appreciations by smiles and nods.'

২২ সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ব্যক্তিদের যথা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ

সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা'হলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। একটা গল্প শোন—

"একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখলে যে, গাছের উপর একটা জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আরেকজনকে বললে—দেখ, অমুক গাছে একটি সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটি উত্তর করলে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ্ হতে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ্।' আরেকজন বললে 'না না—আমি দেখেছি হলদে।' এইরূপে আরও কেউ বললে, 'না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে, আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বলছ, সব সত্য—সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী। আবার কখনও দেখি, কোনও রঙই নাই। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।"

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন—তিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ্—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।"২৩

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ একাগ্রমনে শোনেন, সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা বা তাঁর মহিমা বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত, তিনি যদি কৃপা করে ধরা দেন তবেই মানুষ তাঁকে জানতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে থাকেন, "কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, আবার কেউ বলে তিনি নিরাকার। এই বলে আবার ঝগড়া।"

সান্যাল, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মপ্রচারকগণের লেখা, সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত ঘটনা এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও হৃদয়রামের নিকট হতে সংগৃহীত বিবরণী হতে সেদিনকার আলোচিত বিষয়গুলি জানা যায়। কাহিনীগুলি যথাসম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত "কথামৃত" প্রভৃতি অবলম্বনে সঙ্কলন করা হয়েছে।

২৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১৷৩৷৫ হ'তে গৃহীত।

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন মুখে বলা যায় না।

"দেখ, কতকগুলো কানা একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটির নাম হাতী। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হাতীটা কি রকম? তারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে 'হাতী একটা থামের মত'। সে কানাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল। আর একজন বললে 'হাতীটা একটা কুলোর মত'। সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

"এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছান যায়। আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"২৪

"একটা ডেও পিঁপ্ড়ে চিনির পাহাড়ে গেছল। একটা দানা মুখে করে পালাল, আর সেইটে খেয়েই হেউ ঢেউ। আর শক্তি কোথা যে খাবে? সেইরকম ভগবানকে জেনে কে শেষ করতে পারে? আবার তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে জানবার যোটি নেই।"২৫

সময় গড়িয়ে চলে। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ শ্রীরামকৃষ্ণের বচনামৃত পান করতে থাকেন। সকলেরই মনের ভাব, এমন সরল ভাষায় প্রাণস্পর্শী তত্ত্বকথা পূর্বে কেউ কখনও শোনেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি কেশবের উপর নিবদ্ধ হ'ল যেন। কেশবচন্দ্রের সাধন-জীবনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে থাকেন, "সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় হাঁকডাক, ক্রমে সব থেমে যায়। ঘিয়ে লুচী ছাড়লে প্রথমে টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে, জাল হতে থাকলে আর শব্দ হয় না। তেমনি জ্ঞান পাকা হলে আর বাহ্য আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।"২৬

"দুরকমের সাধক আছে;—একরকম সাধকের বানরের ছা-র স্বভাব আর একরকম সাধকের বিড়ালের ছা-র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২।৫, হ'তে গৃহীত

২৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত: গুরুদাস বর্মন: পৃঃ ১৫১

২৬ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ: ঐ, পৃঃ ১০৪৩ হ'তে গৃহীত

আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে চায়।

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা মা করে, মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না।—এত জপ করবো, এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে, তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"২৭

সৎপ্রসঙ্গের অফুরন্ত ধারা ব্রাহ্মভক্তদের স্নান-আহার উপাসনা ভুলিয়ে দেয়, সকলে অপার আনন্দে মগ্ন। তখন কেশবচন্দ্র কি করছিলেন? কি ভাবছিলেন? অনুমান করা যায়, কেশবের তৃষিত হৃদয় অমৃতবারিসিঞ্চনে অপার তৃপ্তিতে তখন মগ্ন। তিনি হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করে অমিয়ধারা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল; তিনি বিনীত ও কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে বসে থাকেন।২৮ সৎপ্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মপ্রচারকদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রায় অজ্ঞাত কারণে সকলেই বোধ করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আপন-জন, যেন নিকট আত্মীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের আসরে তাঁর অভ্যর্থনার একটা সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত করেন একটি উপমার সাহায্যে। তিনি বলেন, "গরুর পালে অন্য জন্তু এলে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু অন্য গরু এলে পর স্বজাতি বলে কত খাতির—তখন গা চাটাচাটি করে।" এই কথায় হাসির রোল ওঠে।

সকলের অজ্ঞাতসারে সূর্যদেব তিন চার ঘণ্টার পথ অতিক্রম করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন, বিদায়গ্রহণের সময় কেশবচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এঁরই ল্যাজ খসেছে।" কথার তাৎপর্য না বুঝে

২৭ কথামৃত, ৩.৭।১

২৮ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "পরম ধার্মিক, মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকট শিষ্যের ন্যায়, কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথাসকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোনরূপ তর্ক করিতেন না।

সভাসুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। তখন কেশবচন্দ্র বাধা দিয়ে বলেন, "তোমরা হেসো না। এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।"

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুহাস্তে বলতে থাকেন, "যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না; যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে ততদিন সংসারজলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে, জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাকতে পারে।"২৯ "কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হয়েছে; তোমার মন সংসারেও থাকতে পারে আবার সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।"৩০ সামান্য কথার মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য তার ব্যাখ্যা শুনে উপস্থিত সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর গূঢ় অভিমত৩১ জেনে ব্রাহ্ম-প্রচারকদের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাঁরা বুঝতে পারেন, পরমহংসদেব শুধু একজন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষমাত্র নন, তিনি একজন অন্তর্বেত্তা।

সৎপ্রসঙ্গে তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হলে আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গেরা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরসে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস একজন অসাধারণ ব্যক্তি। প্রথম দর্শনেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, তাঁর পূত সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত হন।

"......শ্রীশ্রীসাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয়, কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকটে যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন।"

ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৮, "......দেখিলাম ঠাকুরের প্রতি কেশববাবুর শ্রদ্ধা ভক্তি কত গভীর, তাঁহার সেবাকার্য কত নিখুঁত, আমরা তাঁহার শ্রদ্ধার এক অংশও পাই নাই।"

২৯ কথামৃত, ১।১৩।৪

৩০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৪০০ পৃঃ, হ'তে গৃহীত।

৩১ অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেশববাবু কেমন লোক? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "ওগো, সে দৈবী মানুষ।" (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)

এভাবে জগন্মাতার উপর সর্বদা নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে আবিষ্কার করে, তার হৃদয়ে রুদ্ধ ভক্তির ফোয়ারা উন্মুক্ত করে শুধু কেশবের জীবনে ও তাঁর ধর্মসংস্কার-প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন তাই নয়; দেখা যায় এই প্রথম৩২ সাক্ষাতের ফলশ্রুতি-স্বরূপ গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-প্রচারে প্রথম উদ্যোগী৩৩ হয়েছেন। "এর মধ্যে যে ভাব আছে, যে শক্তি আছে, তাহা এখন প্রচার করার প্রয়োজন নেই—একে বক্তৃতা বা খবরের কাগজ দিয়ে প্রকাশ করতে হবে না,"৩৪ কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে তিনি নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের নিকট পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন।

অপরপক্ষে কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "দেখ! পরমহংস মশায় লাটের মাল নহেন, তিনি অমূল্য বস্তু, গ্লাসকেশে রাখিবার উপযুক্ত।" (ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ৫৫)

৩২ সত্যচরণ মিত্র: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৯৭ সালে প্রকাশিত), (পৃঃ ৮১-৮৪)। এই গ্রন্থকারের মত—ব্রাহ্ম অন্নদাচরণ মল্লিকের নিকট সংবাদ পেয়ে কেশবচন্দ্র একদিন অন্নদাচরণের সঙ্গে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন। পরে মহিমাচরণের সঙ্গে একটি গাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রাম কমলকুটীরে যান। সেখানেই 'তোমার ল্যাজ খসেছে' ইত্যাদি কথোপকথন হয়। এই ঘটনা অপর কোন গ্রন্থকার সমর্থন করেননি।

৩৩ Bhudhar Chatterjee, Editor of the monthly Veda Vyasa (1883): "And afterwards it was Keshab Babu that became the chief helper in his (Ramkrishna's) preaching work and gradually extended the sphere of his activity." (Prabuddha Bharata, Feb, 1936. p. 95)

৩৪ ভক্ত মনোমোহন, পৃষ্ঠা ৬৯

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে'—বিরাট শিশুর চিরন্তন খেলা ছড়িয়ে আছে বিশ্বভুবনের সর্বত্র, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের নানা প্রকাশের মধ্যে স্ফুরিত তাঁর নব নব অভিব্যক্তি, স্বচ্ছ সাবলীলভাবে তরঙ্গায়িত তার বিচিত্র গতিছন্দ। আবার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-বৈচিত্র্যের মাধুর্যে ও মুগ্ধতায় সাজানো জগৎ-মালঞ্চে যখন বিরাট-শিশু একটি মানবশিশুর আকার ধারণ করে আবির্ভূত হন, সেই শিশুর খেলাধুলা মানবমনে সঞ্চার করে পরম বিস্ময়, তাঁর লীলাবিলাস ভক্তজনমানসে উদ্রেক করে বহু আকাঙ্ক্ষিত মাধুর্যরস। দেবশিশুর ক্রিয়াকলাপ ছায়াতপের ন্যায় জানা-অজানার লুকোচুরিতে প্রায়ই রহস্যঘন, তবুও তাঁর প্রতিটি আচরণ বিচরণ হতে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দের ফাগ; কারণ আনন্দঘন তাঁর স্বরূপ-সত্তা। জগৎ-মালঞ্চে দেবশিশুর আবির্ভাব পূর্বেও ঘটেছে অনেকবার, ভবিষ্যতেও ঘটবে অনেকবার, সন্দেহ নাই। কিন্তু এবারের আবির্ভাবে দেবশিশুর চরিত্রে প্রকটিত হয়েছে অভূতপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্য,—দেবশিশু তাঁর খেয়ালীপনাতে উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর অনিন্দ্য শিল্পকুশলতার একটি ঘরোয়া রসঘন ভাবমূর্তি।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—আনন্দ হতেই উৎসারিত এই সৃষ্টিলহরী, আনন্দরসেই তার অবস্থিতি, আবার সেই আনন্দতেই তার অবলুপ্তি। আনন্দোল্লাসে পূর্ণ জগৎ-মালঞ্চের এক কোণায় বাংলার শ্যামল পল্লীতে দেবশিশু গদাধর আপন মনে খেলাধুলা করতে করতে শশীকলার মত বিকশিত হয়ে ওঠেন। গদাধরের রূপের লাবণ্যে, গুণের স্নিগ্ধতায় আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী সকলেই প্রীত, মুগ্ধ।

গদাধর আজন্ম ভাবুক, ভাবরাজ্যের ঘাটে-বাটে স্বেচ্ছায় বিচরণে তাঁর বড়ই প্রীতি। তাঁর অন্তরের নহবতে সানাইয়ের পোঁর মত অনুরণিত হতে থাকে 'ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।' গদাধরের বয়স মাত্র ছ'বছর, সে-সময়ে তিনি রূপসাগরে ডুব দিয়ে তলিয়ে যান, অরূপরতনকে ধরবার জন্য ছুটে যান। পরবর্তীকালে তিনি স্বমুখে বর্ণনা করেছেন তাঁর শিশুমনের অভিজ্ঞতা: "...... সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স।

একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে; এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হল!—দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না! মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল।" ভাবতন্ময়তা দেবশিশুকে গভীর হতে গভীরে টেনে নেয়, রূপ-প্রপঞ্চের অবগুণ্ঠনে আবৃত অরূপের হাতছানি শিশু-প্রাণকে আকুল করে তোলে। তাঁর হৃদয়-সরোবর মন্থন করে ওঠে প্রেমের হিল্লোল, ভক্তির কল্লোল, তার উপর বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করে চিদাকাশে উদিত প্রেমচন্দ্র। অন্তররাজ্যে উদ্ভাসিত অরূপের রূপ-ব্যঞ্জনা তাঁর দেহতটে উপচিয়ে পড়ে। গদাধর বাহ্যজ্ঞান হারান, তাঁর কোমল ফুল্ল-আনন দিব্যদ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বছর।১ তিনি আনুড়ের বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনে চলেছিলেন। তাঁর সঙ্গী কয়েকজন ভক্তিমতী রমণী। দেবী-শক্তির ভাবাবেশ গদাধরকে যেন গ্রাস করে, বালকের গান থেমে যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ আড়ষ্ট হয়ে যায়, চক্ষে ঝরে প্রেমাশ্রুধারা। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে বালক বোধে বোধ করেন অরূপের স্বরূপসত্তা, দর্শন করেন মহাশক্তি জগন্মাতার চিন্ময়ীরূপ।২ বিস্মিত সঙ্গীরা লক্ষ্য করে যে, দেবী বিশালাক্ষীর নাম-উচ্চারণে বালকের সংবিৎ ভেসে উঠেছে রূপসাগরের জলে। সেই মুহূর্ত হতেই বালক চোখ উন্মীলন করে দেখেন এক অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, অভিনব এক আনন্দ ও সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গায়িত। তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হয় বিশ্ব-বৈচিত্র্যের নূতন ভাবঘন এক রূপ।

গদাইঠাকুরের মন যেন শুকনো দেশলায়ের কাঠি, একটু ঘর্ষণেই দপ্ করে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৪।৩১।২) ও (৫।৩।২)-তে ঠাকুরের উক্তি অনুসারে তাঁর বয়স তখন দশ বা এগারো। লীলাপ্রসঙ্গ (২।৫০) অনুযায়ী আট বছর।

২ মাষ্টারমশাই রোমাঁ রোলাঁকে ২৮।১১।১৯২৮ তারিখের চিঠিতে লিখেছেন: "শ্রীগুরুদেবও তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি যখন এগারো বছরের তখনি তিনি সমাধি অবস্থায় ঈশ্বরকে দেখেছেন। সেই সময়ে তিনি আনুড়ের পথে তাঁর মা ও অন্যান্য যাত্রিণীর সঙ্গে কোন দেবমন্দিরে যাচ্ছিলেন।"
—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২।৪৭)।

জ্বলে ওঠে; সামান্য উদ্দীপনায় তাঁর মনপাখী দেহশাখা ছেড়ে উড়ে যেতে চায় চিদাকাশের অন্তহীন লোকে। একবার শিবরাত্রিতে নিয়মিত নটের অকস্মাৎ-অভাব পূরণের জন্য বালক গদাধর নটেশের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। দর্শকেরা সচরাচর যে অভিনয় দেখে অভ্যস্ত সেই অভিনয় সেদিন অনুষ্ঠিত হয় না। কিন্তু গদাধরের অভিনব অভিনয়ের মাধুর্য ভাবুকদের মন দ্রবীভূত করে, ভক্তচিত্তে ভক্তিবারি সিঞ্চন করে। বিস্মিত দর্শকেরা লক্ষ্য করেন,

শিবভাব প্রভু-অঙ্গে তাই চক্ষে ঝরে ॥ জ্ঞানহারা দর্শকেরা দেখিয়া মূরতি।
শিশু গদাধর অঙ্গে মহেশ-প্রকৃতি ॥ গরগর মহাভাব উঠেছে সপ্তমে।
আপনার স্থানে নাহি নামে কোনক্রমে ॥৩

গদাধর আশৈশব উদার প্রেমিক, তাই অমৃতফল নিজে আস্বাদন করেই তৃপ্ত হতে পারেন না, অপরকেও সেই আনন্দের অংশভাক্ করতে তিনি ব্যগ্র। তিনি তাঁর হৃদয়ে উৎসারিত আনন্দানুভূতি শব্দ রেখা বর্ণ ও দেহের ছন্দের মাধ্যমে সঞ্চারিত করে দেন অপর মানুষের অন্তরে। সেই কারণেই গদাইঠাকুর সহজাত শিল্পী। স্বাভাবিক প্রবর্তনায় প্রবুদ্ধ হয়েছে তাঁর শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা, সাবলীল গতিতে তাঁর ভাবকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করেছে শিল্পের বিচিত্র ঐশ্বর্যে—চিত্রে ভাস্কর্যে সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে।

জগতে শিল্পীদের জীবনেতিহাসে দেখা যায় দীর্ঘকালের কঠোর সাধনার ফলে তাঁদের শিল্প-প্রতিমা মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পী গদাধরের জীবনতরুতে প্রথমেই ফল ধরেছিল, ফুল ফুটেছিল পরে। বাল্যকালেই তাঁর জীবনতরুতে প্রস্ফুটিত ফুল চারিদিকে সৌন্দর্য বিকাশ করেছিল, গন্ধ বিতরণ করেছিল, রসিকজনদের আকৃষ্ট করেছিল। এই কারণে তাঁর শিল্পীজীবনের ইতিবৃত্ত অধিকতর বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যখন বিরাট-শিশু মানবশিশুর বিগ্রহ ধারণ করেন তখন তাঁর আচার-আচরণ প্রায়ই দেখা যায় 'বে-আইনী।'৪

বালকের সুমিষ্ট কণ্ঠে যেন সুধা ঝরে পড়ত। তাঁর গান শুনতে, তাঁর মুখে পাঠ শুনতে পাড়াপড়শীদের ভিড় লেগে যেত। শুধু গান কেন, যাত্রা নাটকেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ সু-প্রশংসিত। গদাধরের বয়স তখন পাঁচছ'বছর।

৩ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ২৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন যে গদাধরের ভাব অনেক চেষ্টাতেও ভাঙ্গে নি, তিনি তিনদিন ভাবাবস্থায় ছিলেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, ২।৫৮)

৪ বীরভক্ত গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে যথার্থই বলেছিলেন: "আপনার সব বে-আইনী!" (কথামৃত ২।২৬।৩)

পাঠশালায় গুরুমশাই একদিন তাঁর অভিনয়-দক্ষতার সুখ্যাতি শুনে তাঁর সামনে অভিনয় করতে আদেশ করেন। সদানন্দ বালক আদেশ পেয়েই

এত শুনি যাত্রারম্ভ করেন গদাই ।। আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে ।। গীতবাদ্য নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি ॥৫

কয়েক বছর পরে দেখি শিল্পী গদাধরের নেতৃত্বে মানিক রাজার আমবাগানে যাত্রাভিনয়ের মহড়া চলেছে। পুরাতন-স্মৃতি চয়ন করে শিল্পী পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে ছিলাম।"৬ তিনি আরও বলেছেন: "ওদেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেই সব দেখত ও শুনত। আবার বাড়ীর বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিত।"৭

এ সকলের চাইতেও চমৎকৃত করে ভাস্কর্যে ও চিত্রে বালক-শিল্পীর নৈপুণ্য। গদাধর তখনও পাঠশালার পড়ুয়া। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেই তাঁর মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ। একদিন পণ্ডিত রামপ্রসাদ গুপ্ত পড়ুয়াদের পাঠ দিয়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন। পাঠশালার এক কোণে একজন কারিগর প্রতিমা গড়ছিল। পণ্ডিতমশাই উঠে যেতেই গদাইঠাকুর কারিগরের কাছে যান, প্রতিমা ঠিক হচ্ছে না বলে কটাক্ষ করেন। বালকের চাপল্য কারিগর প্রথমে উপেক্ষা করে। শেষকালে গদাইঠাকুরের 'এক চ্যালেঞ্জ বয়স্ক কারিগরকে উত্তেজিত করে, সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। স্থির হয়, দুজনেই একটা করে এঁড়ে গরু তৈরী করবেন, কারটা ভাল হয় দেখা যাবে। প্রতিযোগিতা সুরু হয়, পড়ুয়ারা দুই প্রতিযোগীকে ঘিরে বসে। কিছু সময়ের মধ্যে দুজনে এঁড়ে গরু তৈরী শেষ করেন, আবার সেই সময়ে পণ্ডিতমশাই এসে উপস্থিত হন। ব্যাপার কি? কারিগর বলে: "ব্যাপার আর কি? ওই তোমার গদাইয়ের কীর্তি, আর এটা আমি গড়েছি।" পণ্ডিতমশাই গদাধরের তৈরী শিল্পকর্মটি পছন্দ করেন এবং শোনা যায় সে বছর তিনি গদাইয়ের তৈরী এঁড়ে গরুটি পূজা করেছিলেন।৮ আবার দেখা গেছে, গ্রামের মৃৎশিল্পী যেখানে দেবদেবীর প্রতিমা গড়ছে, রং দিচ্ছে, চোখ আঁকছে, বালকশিল্পী গদাধর বন্ধুদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বালকশিল্পী

৫ পুঁথি, ১৮।৬ কথামৃত, ৫।৬।২।৭ কথামৃত ৫।৬।২।৮ তত্ত্ব-মঞ্জরী, ৭ বর্ষ/১০ম সংখ্যা/পৃঃ ২৩৪।

ফস্ করে বলেন: "এ কি হয়েছে? দেবচক্ষু কি এ রকম?" কি দুঃসাহস বালকের! তিনি মৃৎশিল্পীর হাতের তুলি নিয়ে দুটি টান দেন। সবাই তাজ্জব হয়ে যায়; দিব্য মনোহর দেবীমূর্তির চাহনি দর্শকদের প্রাণে শিহরণ জাগায়। ঝানু মৃৎশিল্পী গালে হাত দিয়ে ভাবে, গদাইঠাকুর এ বিদ্যা শিখলো কোথায়? ইতিমধ্যে বয়স্যদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে গদাধর সরে পড়েন। তাঁর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন: "গদাই এখন নয় দশ বৎসরের ছেলে,······মৃত্তিকা লইয়া কখন শিব, শিববাহন বৃষ, ত্রিশূল, শিঙ্গা ইত্যাদি, কখন কালী, জয়া, বিজয়া, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি করেন। ঐ সকল মূর্তির গঠন এত নির্দোষ এবং সৌন্দর্যপূর্ণ হইত যে, অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা গ্রামের সর্বত্র রটিল এবং গ্রামে যাঁহার বাটীতেই পূজার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত হইত, তিনি গদাইকে গৃহে আনাইয়া প্রতিমা নির্দোষ হইয়াছে কিনা মত লইতে লাগিলেন। দোষযুক্ত হইলে অনেক সময়ে গদাই স্বহস্তে ঐ সকল প্রতিমার দোষ সংশোধন করিয়া দিতেন।"[৯] অসাধারণ তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সুদূর তাঁর কল্পনার গভীরতা। তাছাড়াও দেখা যেত মূর্তিতত্ত্বের রহস্য বিশেষতঃ মূর্তির তালমানের জ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত।[১০] তিনি জানেন দেবমূর্তির ভ্রূযুগল হবে 'নিম্বপত্রাকৃতিঃ ধনুষাকৃতির্বা', শ্রবণ হবে 'গ্রন্থলকারবৎ', নাসা ও নাসাপুট হবে 'তিলপুষ্পাকৃতির্নাসাপুটম্ নিষ্পাপবীজবৎ', চিবুক হবে 'আম্রবীজম্', কণ্ঠ হবে 'শঙ্খসমাযুতম্'। মৃৎশিল্পের ন্যায় তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ দেখা গিয়েছিল চিত্রশিল্পেও। চিত্রশিল্পের একটি নিদর্শন উল্লেখ করেছেন স্বামী সারদানন্দ। বালক গদাধর একবার গৌরহাটি গ্রামে ছোট বোন সর্বমঙ্গলার কাছে গিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে ঢুকেই দেখেন সর্বমঙ্গলা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সেবা করছেন। মনোহর কল্যাণ-শ্রীযুক্ত গৃহস্থ বাড়ীর চিত্রখানি শিল্পীর মনে গভীর রেখাপাত করে। কয়েকদিন পরে গদাধর একটি চিত্রাঙ্কনের মধ্যে তুলে ধরেন সুন্দর দৃশ্যটি। সর্বমঙ্গলা ও তাঁর স্বামীর নিকট সাদৃশ্য চিত্রের মধ্যে দেখে আত্মীয়-স্বজন বালক শিল্পীর প্রতিভার প্রশংসা করেন।[১১]

৯ গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫-৬

১০ শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সর্বলক্ষণসম্পন্ন দেবদেবীর মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।

১১ লীলাপ্রসঙ্গ, ১।১৪২

শিল্পী গদাধরের শিল্প-সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বোধ করি দেবদেবীর মূর্তি গড়া। 'সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্', প্রতিমা ও শিল্পীর মধ্যে সেব্য ও সেবকের, অর্চিত ও অর্চকের মধুর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের প্রলম্বিত ভাবটি ধরে গদাধর ভাবরাজ্যের গভীরে প্রবেশ করতেন। তিনি দেবদেবীর প্রতিমা গড়তে ভালবাসতেন, ততোধিক ভালবাসতেন নিজ হাতে গড়া প্রতিমার পূজা করতে।

মাটির প্রতিমা হাতে গড়ে গদাধর।
সুন্দর হইতে তেহ অধিক সুন্দর॥
ভাবে রূপে সুঠামে সুন্দর অবিকল।
দেখিলে না যায় চেনা মাটির নকল॥
চক্ষুদানে আঁখিতারা হেন দীপ্তিমান।
মৃন্ময় মূরতি হয় জীবন্ত সমান॥
....
গড়েন গদাই হাতে দেবীর প্রতিমা।
সঙ্গিগণ লয়ে হয় পূজা আরাধনা॥[১২]

মাকালীর প্রতিমা গড়ে মনের সাধে পূজা করেন গদাধর। অনন্যসুন্দর হ'ত তাঁর হাতে-গড়া প্রতিমা, আর তাঁর পূজা-আরাধনাও হ'ত অনন্যসাধারণ। তাঁর অনুরাগ-প্রদীপ্ত আরাধনায় প্রতিমায় আবির্ভূত হ'ত চৈতন্যশক্তি, এদিকে তাঁর বালক-হৃদয় একাগ্র হয়ে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করত। সময় সময় নানা দিব্যদর্শনের আনন্দদ্যুতি তাঁর হৃৎপদ্মকে প্রস্ফুটিত করত।[১৩]

শিল্পী ছবি এঁকে, প্রতিমা নির্মাণ করে, মাটি কাঠ পাথরের মধ্যে বিচিত্র বীর্য ঐশ্বর্য সৌন্দর্য মাধুর্য জ্ঞান প্রেম ভক্তি বৈরাগ্য ও আনন্দের ভাব অভিব্যক্ত করে ভগবানের ভগবত্তাকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করতে চান। বালক গদাধরের মধ্যে সুষমভাবে সমন্বিত হয়েছে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও ভগবৎ সাধকের সাধনকলার সিদ্ধি। তিনি একাধারে মৃন্ময়ীর রূপশিল্পী ও চিন্ময়ীর ভাব—কুশলী, সেই কারণে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অসীম ও সসীমের মধ্যে, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, চিৎ ও জড়ের মধ্যে যোগসেতু রচনা করতে

১২ পুঁথি, পৃঃ ২৯-৩০

১৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ১।১১৪

সমর্থ হয়েছেন। সার্থক হয়েছে তাঁর শিল্প সাধনা। আর না হবেই বা কেন?
"যে শক্তির দেহে রহে সৃষ্টির অাঁকুর। তাঁহারই ঘনমূর্তি গদাই ঠাকুর॥"

শিল্পীর অন্তঃকরণের ন্যাতা কাঁথার হাঁড়িতে অস্ফুট বা স্ফুটনোন্মুখ কত বৈচিত্র্যময় বীজ, তাঁর সামান্য কয়েকটি উপযুক্ত স্থান ও কালে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। আর যেগুলি অঙ্কুরিত হয়ে উঠে তাদের হিসাবই বা রাখে কে? বালকের মত শিল্পী খেয়ালী, খেয়ালের আবেশে রূপজাল সৃষ্টি করেই তাঁর আনন্দ। সেই সকল বর্ণাঢ্য সুন্দর সৃষ্টির কিছু কিছু তাঁর স্মৃতির চোরকুঠরীতে গচ্ছিত থাকে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন (৯ই মার্চ, ১৮৮৩) স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন: "দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র অাঁকতে বেশ পারতুম, কিন্তু শুভঙ্করী অাঁক ধাঁধা লাগতো।" আবার একদিন (১০ই জুন, ১৮৮৩) বলেন: "পাঠশালে শুভঙ্করী অাঁক ধাঁধা লাগত! কিন্তু চিত্র বেশ অাঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।" কাশীপুরে তিনি একদিন শ্রোতাদের উপহার দেন বাল্যের কয়েক খণ্ড চাকচিক্যময় স্মৃতি। প্রবীণ শিল্পী তখন কঠিন রোগশয্যায় শায়িত। দেহের ব্যথা-যন্ত্রণা যেন পড়ে থাকে শয্যার এক কোণে। তিনি ভক্তদের আনন্দ দান করতে ব্যগ্র। সেদিন [২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঃ। কবিরাজ রোগীকে হরিতাল ভস্ম খেতে দিয়েছিলেন। ঔষধ শ্লেষ্মার সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ঔষধ নিয়ে রসিকতা করেন রোগী। তিনি বিষাদগ্রস্ত সেবকদের চিন্তার জঞ্জাল ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের উপহার দেন কয়েকটি সুখস্মৃতি। সেখানে উপস্থিত সেবক লাটু, বুড়ো গোপাল ও মহেন্দ্র মাষ্টার। প্রবীণ শিল্পী বলেন: "আগে কম বয়সে দেশে ছোট ছোট ঠাকুর গড়তুম— কেষ্ট ঠাকুর, তাঁর হাতে বাঁশী এসব। এরকম নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তুম। আবার পাঁচ আনা ছ'আনা দামে বিক্রি করতুম।" সেবক লাটু মন্তব্য করেন: "আজ্ঞে চৈতন্য মহাপ্রভু বাজার করতেন, খোড় প্রভৃতি কিনতেন।"

শিল্পী: "আবার ছবিও অাঁকতুম।" "পুতুল গড়তুম, কল শুদ্ধ হাত পা নড়ছে এসব। রাসের সময় মিস্ত্রিরা অনেক সময় আমার কাছে ভঙ্গী জেনে নিতো।" লাটু রংয়ের পিচকারী ধরার ভঙ্গী দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "এ রকম?" এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে শিল্পী আরও বলেন: "আবার ইটের কাজও জানতুম।"[১৪] ভক্ত সেবকেরা শিল্পীর বাল্যকালের কীর্তিকলাপের ছোট একটি ফিরিস্তি শুনে অবাক হন।

---

১৪ উদ্বোধন, ১৩৮১ ভাদ্র সংখ্যা, পৃঃ ৩৫৯

যৌবনে গদাধর কলকাতায় এসে পিতৃদত্ত রামকৃষ্ণ নামটিতে পরিচিত হন। দাদা রামকুমার তাঁকে 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা'য় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণিকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছিল জগন্মাতা ভবতারিণীর সাধনপীঠ। রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কয়েকদিনের মধ্যেই নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে যুবক-শিল্পী শিল্প-সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। সাধক-শিল্পী অন্তররাজ্যে আবিষ্কার করেন আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্যের নব নব মূর্তি, সেই সঙ্গে প্রায়ই বহির্রাজ্যে রূপদান করেন তাঁর ভাবখণ্ডগুলিকে—ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গীতে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে সেই ভাবের রসমাধুর্য। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে একাধারে অধ্যাত্মসাধনার তপোবন ও পার্থিব-শিল্প সাধনার পাদপীঠ। সাধনায় অগ্রসর হয়ে তিনি আবিষ্কার করেন সর্বানুস্যূত অখণ্ড চৈতন্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বসংসার।

শিল্পের প্রাণ রস। সেই রস স্বয়ম্ভু এবং তা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিল্প সাধনার রস সংগ্রহ করেছিলেন সর্বরসঘন অখণ্ড চৈতন্য হতে। এভাবে বিশ্বস্রষ্টার শিল্পপীঠে এক হাত রেখে, 'বুড়ী ছুঁয়ে' তিনি শিল্পসৃষ্টির আনন্দবিলাসে মেতে উঠেছিলেন, সেই কারণেই নবীন-প্রবীণ রসিক-অরসিক সকল মানুষ তাঁর শিল্পকলার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত।

শিল্পী বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুয়েরই ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্রতায় সুশোভিত বহির্জগৎ ও আনন্দবেদনা অনুরাগ বিশ্বাস ভাবভক্তির লহরীতে ভরপুর হৃদয়সরোবর—শিল্পী এই দুই রাজ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করে পুষ্পচয়ন করেন, ভাবসূত্র দিয়ে মনোহর মালা গাঁথেন এবং প্রাণের দেবতার গলায় সেই মনোবিমোহন মালা পরিয়ে তৃপ্তিলাভ করেন। সাধনার দুস্তর পথ অতিক্রম করে সিদ্ধ সাধক উপলব্ধি করেন যে তাঁর প্রাণের দেবতা প্রকৃতপক্ষে সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ সর্বব্যাপী এক বিরাট অখণ্ড পুরুষ। সেই পুরুষই অনন্তরূপে বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত। তাঁকে নামরূপের বন্ধনে বিধৃত করেই বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি।

একদিন যুবক শিল্পীর বাসনা হয় তিনি নিজহাতে শিবঠাকুর গড়ে পূজা করবেন। গঙ্গাগর্ভ হতে মাটি সংগ্রহ করে ষাঁড়, ডমরু ও ত্রিশূলসমেত একটি মনোমুগ্ধকর শিব মূর্তি তৈরী করেন এবং পূজা করতে বসে অল্প সময়ের মধ্যেই

গভীর ভাবে নিমগ্ন হন। ঘটনাক্রমে রাণী রাসমণির জামাই ও দক্ষিণহস্ত মথুরানাথ সেখানে উপস্থিত হন। তিনি মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখেন দিব্য ভাবোজ্জ্বল মহেশ-মূর্তি। সম্মুখে দেখেন দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ ধ্যানস্থ এক সুদর্শন যুবক। প্রতিমার ছন্দ বা ছাঁদ মথুরানাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। শিল্পকলার মর্মস্থানে ছন্দ এবং এই ছন্দ আনন্দের তরঙ্গমালার মত বিশ্ব-সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। এই ছন্দ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল যুবক শিল্পীর গড়া প্রতিমাতে। ভক্তিমতী রাণী রাসমণির অন্তরে ঝিলিক দেয়, এই দৈবনিষ্ঠ শিল্পীর সেবাতে সাধনাতে পাষাণী ভবতারিণী সম্ভবতঃ তাঁর চৈতন্যস্বরূপ উদ্ঘাটন করবেন এবং দেবীর জাগরণে তাঁর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভগবদারাধনা সার্থক হবে। মথুরানাথ শিল্পীকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করেন।

সুদৃশ্য রচেন বেশ প্রভু গুণধর। দেখা মাত্র দর্শকের বিমোহ অন্তর ॥
নিত্যই নূতন বেশ নাহিক উপমা। মূর্তময়ী ঠিক যেন চিৎময়ী শ্যামা ॥
... ...
ঘোষণা হইল বার্তা কথায় কথায়। আছে বহু কালী-মূর্তি এমন কোথায় ॥[১৫]

শিল্পীর মন-মধুর চাকে দানা বেঁধে উঠেছিল অনুরাগ, প্রীতি ও বিশ্বাস— এদের সমন্বয়ে পাষাণী প্রতিমায় চৈতন্যসত্তা যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আমাদের শিল্পী নূতন প্রতিমা গড়তে, তাঁকে সাজাতে যেমন নিপুণ, তেমনি দক্ষ প্রতিমার সংস্কার ও সংযোজনে। পূজারীর হাত হতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ মাটিতে পড়ে যায়, বিগ্রহের একটি পা ভেঙ্গে যায়। শাস্ত্রবিদগণ নাকে নস্যি দিয়ে বিধান দেন অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা নিষিদ্ধ, নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্তব্য। নূতন মূর্তি তৈরীর আদেশ হয়। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল ভাব, অলৌকিক মৌলিক তাঁর প্রতিভা। তিনি বলেন, রাণীর কোন জামাইয়ের পা ভাঙ্গলে কি তিনি সেই জামাইকে ফেলে দিবেন? না তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? শিল্পীর সহজ কথা শ্রোতার প্রাণে বেঁধে। রাণী করজোড়ে যুবক শিল্পীকে বলেন: "তবে বাবা, তুমি অনুগ্রহ করে বিগ্রহের চিকিৎসা করবে কি?" শিল্পী সম্মত হন। নিপুণহস্তে বিগ্রহের ভাঙ্গা পা জুড়ে দেন। ইতিমধ্যে ভাস্কর নূতন একটি প্রতিমা নিয়ে হাজির। শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করা হয়, নূতন মূর্তি পূর্বেকার মত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাঁর মধ্যে

---

১৫ পুঁথি, পৃঃ ৫০

শ্রীরাধিকার ভাবাবেশ হয় এবং তিনি ভাবাবস্থায় বলেন: 'ঠিক হয় নি।' সুতরাং সংস্কৃত পুরানো মূর্তিটির পূজা হতে থাকে।[১৬] শোনা যায় জানবাজারের বাড়ীতে মথুরানাথ আয়োজিত দুর্গাপূজার প্রতিমায় দেবীর চোখ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ হয় নিজে এঁকে দিতেন, নতুবা তাঁর উপস্থিতিতে মৃৎশিল্পী আঁকত। মথুরানাথ ও মৃৎশিল্পী সকলেরই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবদত্ত শিল্পপটুতা সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস।[১৭]

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে চিত্রশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর বাসগৃহের উত্তরের বারান্দায় দরজার দুপাশে আঁকা ৪´×৫´ মাপের দুটি প্রাচীর-চিত্র।[১৮] একটি চিত্রে একটি আতাগাছে বসে আছে এক ঝাঁক তোতাপাখী। অপরটিতে চলন্ত একটি জাহাজ ধাতু নির্মিত পতাকা উড়িয়ে গঙ্গার উজানে চলেছে। প্রাচীর-চিত্র দুটিতে এমন কিছু ছিল যার আকর্ষণ দেখামাত্রই দর্শকের মনকে আবিষ্ট করত। চিত্র দুটির মাত্রাবদ্ধ প্রকাশ-ভঙ্গী, গতিশীল রেখা, সহজ স্বাভাবিক আবেদন রসলিপ্সু দর্শকের মনকে আকর্ষণ করত। শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ৩০

১৭ দুর্গাপদ মিত্র: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৫৩ সন

শিল্পাচার্য নন্দলাল লিখেছেন: 'দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় guide করতেন। তিনি প্রতিমার উপর চালচিত্র আঁকার ভারও কখন কখন নিতেন, প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁর ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজশিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন।' (বরেন নিয়োগীকে লেখা চিঠি)

১৮ প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি, এই প্রাচীর-চিত্র তাঁরা দেখেন নি। অপরপক্ষে অনেকেই দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ অঙ্কিত অপর একটি প্রাচীর-চিত্র—যার বিষয়বস্তু হচ্ছে উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র, 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।' একটি গাছে দুটো পাখী (চিত্রে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট)। তাদের একটি গাছের ফল তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে, অপরটি চুপচাপ গাছের ডালে বসে আছে। এই চিত্রটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় উত্তর-পূর্ব-কোণের থামে কাঁচে আবদ্ধ অবস্থায় বর্তমানে দুর্বোধ্য।

স্বচ্ছ সাবলীলতা ও বর্ণিত বিষয়ের বস্তু-নিষ্ঠা দর্শককে মুগ্ধ করত, যেমন তৃপ্তি দিত শিল্পীর নিষ্কম্প, লীলায়িত ও দৃঢ়তাসম্পন্ন রেখা। রেখা-বিন্যাসকে মূলধন করে সৃষ্ট এই রসোজ্জ্বল চিত্র দুটি আজ অবলুপ্ত, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে অবলুপ্তির সম্পূর্ণ সর্বনাশের পূর্বেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু তাঁদের প্রতিলিপি সংরক্ষণ করেছেন।[১৯]

আমাদের শিল্পীর এইকালের সাধনা নূতন এক ধারায় মূলতঃ প্রবাহিত হয়ে সিদ্ধির অমৃতসাগরে পৌঁছেছিল। শিল্পী ভাবখণ্ড অবলম্বনে ভাবস্বরূপকে, আবার ভাবস্বরূপের গভীরে প্রবেশ করে শুদ্ধ-চৈতন্যকে ধারণা করতে অগ্রসর হন। তিনি পুরাণমতে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, তন্ত্রমতে সিদ্ধিলাভ করেন, বেদমতেও সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি সত্য শিব ও সুন্দরের রূপসাগরে ডুব দিয়ে অনুপম অশব্দম্ অস্পর্শম্ ভাবাতীত নিত্য-শুদ্ধ- বুদ্ধকে বোধে বোধ করেন। সেখানেও থামে না তাঁর অগ্রগতি, আবার 'নী' হতে 'সা'তে নেমে এসে রূপসাগরে আনন্দে বিচরণ করেন এবং অনুভব করেন, জগৎসংসার একই আনন্দরসে জারিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন "আমি দেখি তিনিই সব হয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।"[২০] তাঁর সর্বানুস্যূত একাত্মার অনুভূতিতে জড় ও চৈতন্যের ভেদ ঘুচে যায়, ভূমি ও ভূমার সীমারেখা মুছে যায়। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর চৈতন্যকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখে আনন্দ। বিজ্ঞানী শিল্পীর অবস্থা 'রসে ভাসে প্রেমে ডোবে করছে রসে আনাগোনা।' তিনি বালকবৎ রসে বশে থাকেন। সামান্য উদ্দীপনাতেই তাঁর মনপাখী বিচরণ করে চিদাকাশে। সংকীর্তন করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়েন চিত্রার্পিতের ন্যায়। গলায় গোড়ের মালা। দৃষ্টি স্থির, চন্দ্রবদন প্রেমানুরঞ্জিত। সেই দেবদুর্লভ পবিত্র মোহন মূর্তি দর্শন করে নয়নের যেন তৃপ্তি হয় না। ইচ্ছা হয়, আরও দেখি, আরও দেখি। দর্শকের অবস্থা: "ডুবলো নয়ন ফিরে না এল, গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে তলিয়ে গেল আমার মন।" বিজ্ঞানী-শিল্পীও নিজে অমৃতরস আস্বাদন করে তৃপ্ত হন না। তিনি সর্বজনে অকাতরে বিতরণ করেন সেই সুধা। বিতরণ করেন নানান ভাবে, বিবিধ শিল্পবৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

১৯ বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী: শিল্পী-জিজ্ঞাসায় শিল্পীদীপঙ্কর নন্দলাল, পৃঃ ৪১

২০ কথামৃত, ৪।২১।১

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সুপ্রস্ফুটিত হৃৎপদ্মের আকর্ষণে ছুটে আসে রসলিপ্সু নানান মানুষ। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের বাণী শুনে রসগ্রাহী বলেন যে, তিনি কবি চূড়ামণি। "রসে গাঢ় বশে দৃঢ়—শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। রসে সিক্ত বশে শক্ত—কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।"[২১] উপমাপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করতেন, নিত্য সাংসারিক জীবনের আটপৌরে কাহিনী চিত্রধর্মী গল্পের সাহায্যে তুলে ধরতেন, তার মর্মবাণী দৃঢ়াঙ্কিত হত শ্রোতার মানসপটে। রসগ্রাহী শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'মাথায় কলসী রেখে নৃত্য', 'মাছধরা ও পথিক', 'কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়,' 'ব্যাধের শিকার সন্ধান', 'ঢেঁকিতে মন রেখে চিঁড়ে কোটা' গল্পগুলি সুদৃশ্য রেখাবিন্যাসে চিত্রিত করেছেন।[২২] সেগুলিই কথাশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের কাহিনী-শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি যেমন কথাশিল্পী তেমনি আবার সুরশিল্পী। তাঁর প্রাণমাতানো গান শুনে কার হৃদয়-ময়ূর না নেচে উঠেছে, কোন পাষণ্ডের কাপড় অশ্রুধারায় না ভিজেছে? তিনি সঙ্গীত-শিল্পী, আবার সঙ্গীত-সমালোচক। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাঁর ভাবগ্রহণের ক্ষমতা। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ওস্তাদ্ গাইয়ে নরেন্দ্রনাথ একদিন কীর্তন সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন: "কীর্তনে তাল সম্ ঐ সব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে।" প্রতিবাদ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি বলেন: "সে কি বললি। করুণ বলে তাই অত লোকে ভালবাসে।"[২৩] আমাদের সুরশিল্পী আবার নৃত্যপটু। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম নৃত্যের রেখাচিত্র এঁকেছেন[২৪] শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। সেটি দেখলে তাঁর নৃত্য-মাধুর্য সামান্য ধারণা করা যেতে পারে। মহানট গিরিশবাবু আত্মকথায় লিখেছেন, "...তন্মধ্যে পরমহংসদেব ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া 'নদে টলমল করে' এই গানটি গাহিতেছেন ও তৎসহ নৃত্য করিতেছেন। আমার মনে হইল আমি সুবিখ্যাত নটগণের নৃত্য দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ চিত্তবিমোহক নৃত্য ইহজীবনে দেখি নাই।"[২৫] বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যদশায় কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হতেন, অর্ধবাহ্যদশায়

২১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৴

২২ উদ্বোধন: কার্তিক, ১৩৬২ ও আশ্বিন, ১৩৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

২৩ কথামৃত, ৪।১৭।১.

২৪ উদ্বোধন: আশ্বিন, ১৩৬৩

২৫ উদ্বোধন: আশ্বিন, ১৩৫৮

ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন, অন্তর্দশায় গভীর সমাধিতে মগ্ন হতেন—সর্বাবস্থায় তাঁর চতুর্দিকে বিরাজ করত 'আনন্দের কুয়াসা'।

নৃত্যগীত ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনয়কুশলীদের দ্বারা সমাদৃত। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ বলেছেন: "যদি ঠাকুরকে আমাপেক্ষা কোন বিষয়ে খাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নোওয়াইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু খ্যাতি আছে। কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হৃদয়ে জীবন্ত ভাবে গাঁথা রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের সাধকের চরিত্র তিনি যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়ামাত্র তুলিয়াছি।"[২৬] তাঁর অভিনয়-দক্ষতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী সারদানন্দ যথার্থই বলেছেন: যে ভাব যখন তাঁহার ভিতরে আসিত তাহা তখন পুরোপুরিই আসিত, তাঁহার ভিতর এতটুকু আর অন্যভাব থাকিত না—এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি বা লোক-দেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা ডাইলুট (dilute) হইয়া যাইতেন। ··ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।"[২৭] তিনি ভাবে 'ডাইলুট' হয়ে যেতেন, সে কারণে তাঁর ভাবের ব্যঞ্জনা দর্শক ও শ্রোতাদের অতি সহজে রসসিক্ত করে তুলত। কিন্তু আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, অতি অদ্ভুত প্রতিভাশালী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানী, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অসংখ্য উদাহরণের একটি উল্লেখ করা যাক্। দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরদিন সকালে তিনি মন্তব্য করেন: "আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে, নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করেছেন।"[২৮] অপরের আচার-আচরণের অনুকরণ মাত্রই চারুকলা নয়। অপরের অনুকৃত ভাবটি শিল্পীর চিত্তরসের জারকে দ্রবীভূত হয়ে দর্শকের চিত্ত যখন রসায়িত করে, তখনই শিল্প-

২৬ শশীভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৬২

২৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ৪।২৯০

২৮ কথামৃত, ৫।১৫।১

হয় রসোত্তীর্ণ। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তরসের জারক চিদানন্দ হতে আহৃত, সেই কারণেই তাঁর শিল্পসাধনা হত রসের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে বিজ্ঞানী ও শিল্পী। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি বলেন, 'এই সংসার মজার কুঠি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।' শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি এই 'মজা' ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে ব্যাকুল হন, দিশেহারা মানুষকে আনন্দলোকের সন্ধান দিতে আকুল হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনঘট ছিল আনন্দঘন রসে পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিভিন্ন শিল্পে নৈপুণ্য।' সেই কারণে তাঁর যাবতীয় শিল্পচর্চাতে সুষ্ঠু ভঙ্গিমায় তরঙ্গায়িত হত আনন্দছন্দের লহরী। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি শিল্পকলা রসমাধুর্যে হত অতুলনীয়। কুশলী শিল্পীর দক্ষতা সম্বন্ধে আচার্য নন্দলালের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মরণযোগ্য। "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত।"

বিজ্ঞানী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পদক্ষেপ করলেও দেখা যেত তিনি ভাবে শিশু ভোলানাথ। তিনি স্বভাবতঃই পাঁচ বছরের বালকের মত। কিন্তু যখন তিনি শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠতেন বা লোকশিক্ষা দিতেন তাঁর মধ্যে প্রকটিত হত যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্য ও দৃঢ়তা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরের বাগানে। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। রোগের প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তিনি প্রায়ই শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠতেন। একদিন দেখা গেল, তিনি রোগশয্যা ছেড়ে ঘরের মেঝেতে কি আঁকজোক করছেন। তাঁর এতই গভীর অভিনিবেশ যে সেবকের অনুরোধ উপরোধ কিছুই তাঁর কানে ঢোকে না। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকজোকের মর্মোদ্ধার করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর অভিনিবেশ দেখে বিস্মিত হন।[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের গলার গভীর ক্ষত কাঁধে বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর গন্ধর্ব-নিন্দিত কণ্ঠস্বর প্রায় স্তব্ধ, তাঁর সুঠাম দেহ পর্যুদস্ত, কিন্তু তাঁর আনন্দবিতরণ-কারী শিল্পী মনটি তখনও অটুট। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ভাস্কর্য সব কিছু সে-সময়ে তাঁর শারীরিক ক্ষমতার বাইরে, তবুও তাঁর দুর্বল হাতে সৃষ্ট হতে থাকে

---

২৯ "His attention was so fixed, his thought so abstracted that no one dared approach or ask him what he was doing." (Sister Devmata: Sri Ramakrishna and his disciples, P. 151)

চিত্রমালা। সেবকেরা আনন্দমূর্তি শিল্পীর কাণ্ড দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হন। চিত্রাঙ্কনের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোন সময়ে শিল্পী সৃষ্টি-উন্মুখ মনের ভাবটি প্রকাশের জন্য হাতে কাঠকয়লা বা পেন্সিল বা একটুকরো ছুঁচলো কাঠি নিয়ে বসেন। একদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে কাশীপুরের বাড়ীর গাড়ীবারান্দার ছাদে সেবক কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণকে তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলেন, সেদিন তিনি স্নান করবেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি একটি ছুঁচলো দৃঢ় কাঠি নিয়ে দেয়ালের বালির উপর আঁকতে সুরু করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি প্রাচীরচিত্র আত্মপ্রকাশ করে; দেখা গেল গাছের ডালে যেন বসে আছে একটি জীবন্ত পাখী। আঁকা শেষ হতে দেখা গেল শিল্পীর মুখে ফুটে উঠেছে আত্মপ্রসাদের মৃদু হাসি। বিস্মিত সেবক কালীপ্রসাদকে তিনি বলেন: "আমি ছেলেবেলায় সব পোটোদের ছবি এঁকে অবাক করে দিতুম।"[৩০]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে রোগের বাড়াবাড়ি, ক্ষতস্থান হতে প্রায়ই রক্তক্ষরণ চিকিৎসক ও সেবকদের ভাবিত করে তুলেছে। দেখা গেল সব বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি কাঠকয়লা দিয়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। আঁকার বিষয়বস্তু বিবিধ ও বিচিত্র। আঁকেন হুঁকো হাতে একটি বারবধূর ছবি, একটি হাতির মাথা, তার পাশে লেখেন "ওঁ রাম (তোমায় শ্যামা)।" আবার তিনি আঁকেন শিবঠাকুর, আঁকেন বাবা তারকনাথ, আঁকেন একটি পাখী।[৩১] রেখাভূয়িষ্ঠ চিত্রে শিল্পীর রেখা-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা সবাইকে অবাক করে দেয়। শিল্পীর বাস্তবনিষ্ঠ চিত্রগুলি প্রমাণ করে তাঁর পশুপক্ষী মানুষ ও তাদের হাবভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। তাঁর অন্যতম জীবনীকার লিখেছেন, "সাধারণভূমিতে ঠাকুরের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণসম্পন্ন ছিল, তার কারণ ভোগসুখে অনাসক্তি। ফলে তাঁর দর্শন হত অধিক বস্তুনিষ্ঠ। কামনা-রাঙানো মনের ভাব দ্বারা দুষ্ট হত না।"[৩২] শিল্পী বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি এমন ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, তিনি অনায়াস রেখার টানে দেহের ভঙ্গী, মুখের ভাব, চোখের চাহনি চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হতেন। সেই সঙ্গে শিল্পীর গভীর দরদ রেখার ছন্দে তুলত আনন্দ শিহরণ। সে কারণে তাঁর চিত্র হত এত মনোমুগ্ধকর।

৩০ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮২

৩১ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী

৩২ লীলাপ্রসঙ্গ, ৪।১৭০

বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আহৃত আনন্দসুধা লোককল্যাণার্থে আবিশ্ব বিতরণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন কয়েকটি মহৎ চরিত্রকে, তাঁদের মধ্যে প্রধান নরেন্দ্রনাথ। মুখ্য ভাবসংবাহক নরেন্দ্রনাথকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে। তিনি নরেন্দ্রনাথকে লোকশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে লোকশিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েছিলেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার (১৮৮৬) সন্ধ্যাবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেবকের কাছে চেয়ে নেন একটুকরো কাগজ ও একটি পেন্সিল। তিনি প্রাঞ্জল হস্তাক্ষরে লেখেন: "জয় রাধে প্রেমময়ী, নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে।" প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখাটি ছিল, "জয় রাধে পৃমমোহি, নরেন সিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।"[৩৩] লেখার নীচে তিনি আঁকেন একটি আকণ্ঠ মনুষ্য মূর্তি, তাঁর পদ্মপলাশ নেত্র, দৃঢ় চোয়াল ও সু-উচ্চ নাক। তাঁর পিছনে ব্যগ্র হয়ে ছুটেছে একটি দীর্ঘপুচ্ছ ময়ূর। সহজেই কল্পনা করা যায় চিত্রের বিষয়বস্তু। নির্বাচিত লোকশিক্ষক নরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে সাগ্রহে ছুটেছেন লোকশিক্ষকের শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে হাতে তুলে দেন নরেন্দ্রের হাতে। তেজীয়ান নরেন্দ্রনাথ বিদ্রোহ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ মুচ্‌কি হেসে বলেন, 'তোর ঘাড় করবে'। নরেন্দ্র তাঁর নয়নের মণি। নরেন্দ্রকে লোকশিক্ষক হতে হবে। লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিশেষ শক্তি। নরেন্দ্রকে তিনি মনের মত গড়ে তোলেন, তাঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করেন, কিন্তু এত করেও তিনি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তিনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহাশক্তি জগন্মাতার নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে নরেন্দ্রের জন্য প্রার্থনা করেন। নরেন্দ্রের জন্য তাঁর এই আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি মনোরঞ্জনকারী চিত্রপটে। সেদিন ছিল ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। কাশীপুর বাগানবাড়ীর নীচের তলায় দানাদেরী ঘরে বসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, নিরঞ্জন ও মাষ্টারমশাই, সেবক শশী এসে তাঁদের উপহার দেন একখণ্ড কাগজ। কাগজের একপিঠে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা 'নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও,' আর তার নীচেই আঁকা রয়েছে একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজখণ্ডের উল্টোপিঠে আঁকা রয়েছে একটি রমণী, তার মাথায় বড় খোঁপা।[৩৪] প্রবীণ চিত্রশিল্পীর খেয়ালিপনা ও

৩৩ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী

৩৪ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী

শিল্পনিপুণতা দর্শকদের মোহিত করে, কারুর কারুর চোখে জল এসে যায়। আমাদের শিল্পী রসজ্ঞ চিত্রসমালোচকও বটে। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেয়ালে নানান দেবদেবীর ছবি।[৩৫] একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেয়ালে টাঙানো যশোদার ছবিটি দেখিয়ে বলছেন: "ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে।"[৩৬] চিত্রসমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্পসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য একমুখী, বরঞ্চ বিভিন্ন শিল্পসাধনা অধ্যাত্মবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত। "পরমহংসদেব বলিতেন, যাহার শিল্পরসবোধ নাই—সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌছতে পারে না।"[৩৭] শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভক্তি-ভক্ত নিয়ে রসে বশে থাকতেন, নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্যের খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে সত্য শিব সুন্দরের প্রতিস্ফুরণ সম্ভোগ করে আনন্দ বিলাসে মগ্ন হতেন। তিনি বলতেন, "যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠেছে দেখা যায়।"[৩৮] সেই নিখিল সৌন্দর্যের অভিব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাশিল্প, সঙ্গীতশিল্প, নৃত্যশিল্প, নাট্যশিল্প, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্যশিল্প প্রভৃতিতে মেতে উঠেছেন এবং তাঁর হৃদকন্দর-উৎসারিত অফুরন্ত আনন্দধারা বিভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে 'জগদ্ধিতায়' অকাতরে বিতরণ করেছেন। তিনি তাঁর সাত ফোকরের সানাইয়ে নানা সুরের লহরী তুলে জগৎকে মাতিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু বোধ করি বিশ্বশিল্পী সৃষ্টিকর্তার শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর জীবন-শিল্প। লৌকিক ও অলৌকিক শিল্পকলার সর্বমঙ্গল্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনশিল্পসৃষ্টিতে। শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের জীবন-রসকে রাঙিয়ে

৩৫ চরিত্রগঠনে ছবির প্রভাব গভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "দেখ, সাধুসন্ন্যাসীদের পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল বেলা উঠে অন্য মুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল।......যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যাবে। তাই ছবিতেও দোষ।"

৩৬ কথামৃত, ৫।৪।২

৩৭ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালায় উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ৩৩৪

৩৮ কথামৃত, ৪।১।৫

ছিলেন বিশ্বস্রষ্টার সেই যাদু-রঙে, যে রঙের গামলায় চুবিয়ে তিনি প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নিজের রুচি ও অধিকার অনুযায়ী বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দিতে পারতেন। সর্বভাব-সমন্বিত তাঁর জীবনরসে ছিল সকল ভাবের স্বতন্ত্র আকর, সেই কারণে এই অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছিলেন। তাই দেখতে পাই তিনি নরেন্দ্রনাথ থেকে গড়েছেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ, ভৃত্য রাখ্‌তুরামকে করেছেন ব্রহ্মজ্ঞ অদ্ভুতানন্দ, নাট্যাচার্য গিরিশকে বানিয়েছেন বীরভক্ত, ক্ষুদে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দুর্গাচরণকে তৈরী করেছেন আদর্শ গৃহীভক্ত, রসিক মেথর থেকে সৃষ্টি করেছেন হরিভক্ত। শিল্পকুশলী শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য মুন্সিয়ানায় মুগ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছিলেন: "মনের বাহিরের জড় শক্তি সকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলাবামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিট্‌ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।"[৩৯] আবার তাঁর প্রবর্তিত নূতন যুগের পথ নির্দেশের জন্য তিনি রেখে গেছেন যোগ-কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্বের রূপ-নির্মাণ—তাঁর জীবন-শিল্প-সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধশতকের জীবন আদ্যাশক্তির লীলাভূমি। আদ্যাশক্তি জড় ও চেতন মিশিয়ে তৈরী করেছেন বিশ্ববৈরাজের খেলাঘর এবং ইদানীংকালে সেই খেলাঘরে খেলতে পাঠিয়েছেন তাঁর সেরা পাকা খেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণ জড় নিয়ে শিল্প গড়েছেন। চেতনের কলাকৌশলের রহস্যভেদ করেছেন। জড় ও চেতনের ভেদ ঘুচিয়ে প্রমাণ করেছেন সার সত্য, বিদ্যমান একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ। বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য ত্রিতাপে তাপিত মানুষকে তার স্বরূপের সন্ধান দেওয়া, শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার উদ্দেশ্য মানুষের রূপরসাত্মক পরিবেষ্টনীর গণ্ডী ভেদ করে মানুষকে ভগবদভিমুখী করে দেওয়া আর বিজ্ঞানী ও শিল্পীর সমন্বিত সাধনা—জড়ের যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষকে চিদানন্দের সুখাস্বাদে প্রতিষ্ঠিত করা, 'ধোঁকার টাটি' সংসার-খেলাঘরকে 'মজার কুঠিতে' রূপান্তরিত করা।

৩৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ৩।১০০

একটি ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে বাবুরাম

নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ যুবক। পরিধানে রক্তাম্বর। তাঁর সুঠাম স্বাস্থ্য, সুশ্রী কমনীয় চেহারা, দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রং। তাঁর বিনীত স্বভাব, সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখে কেউ কেউ ধারণা করে, যুবক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কোন ভট্টাচার্যের পুত্র। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যুবকের নাম বাবুরাম ঘোষ। বাড়ী তার ্তড়া আঁটপুর। বর্তমানে কলকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকেন।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শীর্ষনেতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বাবুরাম ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ, অকৈতব ভক্তির বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বাবুরাম সম্বন্ধে বলেছিলেন, "দেখলুম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে।" "ও নৈকষ্যকুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।" "ও রত্নপেটিকা।" রাধারাণীর অংশ হতে তাঁর উদ্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের সময় তিনি বাবুরাম ভিন্ন অপর কারুর স্পর্শ সহ্য করতেন না। বাবুরামের জননী মাতঙ্গিনী দেবী বিদ্যাশক্তি। শ্রীবামকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে বাবুরামকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বাবুরাম এখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী, নিত্যদাস। তার চাইতেও বড় কথা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের 'দরদী', অন্তরঙ্গ সেবক-সঙ্গী।

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। একটি ব্রাহ্মোৎসবে তাঁর নিমন্ত্রণ। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে বাবুরাম তাঁর গামছা, মশলার বটুয়া ও কাপড়চোপড় গুছিয়ে নেন। ঘোড়ার গাড়ীতে যাবেন। এঁদের সঙ্গে যাবেন প্রতাপচন্দ্র হাজরা—রামকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জটিলা-কুটিলা।

আব্রহ্মস্তম্ব সৃষ্ট বস্তুসকলের সার্বিক কলনকারী কালীই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা' জগদম্বা—একাধারে সৌম্যা ও ভীমা ভাবের সার্থক সমন্বয়। মা জগদম্বার আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মায়েব জমিদারীতে নায়েবী করছেন, যন্ত্রী জগদম্বার হাতের যন্ত্রস্বরূপ ত্রিতাপতাপিত মানুষকে কালীকল্পতরুমূলে আশ্রয় জুটিয়ে দিচ্ছেন, সকল মানুষকে ঈশ্বরামৃতের আস্বাদনে আকৃষ্ট করবার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভগবদ্ভাব প্রচার করছেন। 'গোরাপ্রেমে গর্গর মাতোয়ারা' শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্রই খুবই খাতির। তাঁর চরিত্রে ঈশ্বরোন্মাদনার ঐশ্বর্য দেখে

ইংরাজী শিক্ষিতেরাও মুগ্ধ। তিনি কলকাতায় চলেছেন ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিকের বাড়ীতে। সেখানে আজ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমিক, তাঁর স্বভাব অনন্যস্বতন্ত্র। প্রেমিকের থাকে না কেউ আত্মপর। প্রেমিক সকলেরই। সেকারণে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে যাত্রা করার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কলকাতার কলেজের তিন পড়ুয়ার। শ্রীরামকৃষ্ণের লাবণ্যমণ্ডিত রূপমাধুর্য, প্রীতিপূর্ণ আন্তরিক অভ্যর্থনা যুবকদের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে, উদ্দীপিত করে। তিনি যুবকদেরকে আমন্ত্রণ করেন কলকাতায় ব্রাহ্মোৎসবে যোগদানের জন্য। তিনজনই সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সসঙ্গী চলেছেন একটি ঘোড়ার গাড়ীতে। সিন্দুরিয়া পট্টিতে অবস্থিত মণি মল্লিকের বাড়ীতে যাবেন। বাড়ীর ঠিকানা ৮১ নং চিৎপুর রোড।[১] বাড়ীর পূর্বদিকে হ্যারিসন রোডের চৌমাথা। ফলের বাজারের জন্য সেখানে লোকের বেশ ভীড়।

মণিলাল মল্লিক প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত। ধর্মপরায়ণ মণিলাল বাড়ীতেই পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পারিবারিক সমাজ ও তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি চিত্র এঁকেছেন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রধান একজন ইতিহাসবিদ্ সোফিয়া ডবসন্ কোলেট। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে লিখেছেন,—"The Samaj is regularly going on for the last sixteen years. Its fixed time for service is Friday evening. In a certain sense this Samaj may be called a model one. Babu Moni Mohan Mallick, with his sons, daughters, daughter-in-law and grand children—all these together have formed the Samaj. Several men and women from outside come and join in the services, but their number has been a little diminished, owing to the last agitation in the Brahmo Samaj. The beautiful sight of a father, in the midst of his family, regularly and reverently calling on the name of the

---

১ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মতে বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৮১নং সিন্দুরিয়া পট্টি। বাড়ীটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

Supreme Being, is not often to be seen elsewhere. The natural reverence of the Hindu nation is the chief feature of this Samaj. There is one want to be seen in this respect, viz., those anusthanas which separate the Brahmo Samaj from the idolatrous Hindu community, have not yet been performed here."[২] বিদেশিনী বিদুষী মহিলা মল্লিক পরিবারের এই ব্রাহ্মসমাজটিকে বলেছেন একটি মডেল বা আদর্শস্থানীয়। একসুরে গাঁথা মল্লিক পরিবারের সকল ব্যক্তি। পরিবারের ব্রাহ্মসমাজটির অবয়ব ও ভাব, দুটিরই প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্তর্দ্বন্দ্বে ত্রিধা-বিভক্ত ব্রাহ্ম-আন্দোলনের স্বশক্তি ক্ষীণ হতে চলেছিল, এর প্রতিক্রিয়াতে উদারপন্থী মল্লিক পরিবারের সমাজে জন-উপস্থিতি কম হওয়াই স্বাভাবিক। কোলেট্ সমালোচনা করে বলেছেন মণি মল্লিকের পরিবারের সমাজে দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মী উপনিষৎ' ও প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতি চালু হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মমতাবলম্বীর আচার-ব্যবহার নিয়মিত করার জন্য ব্রাহ্মদের 'অনুষ্ঠান' অংশটি তখনও গৃহীত হয়নি। আদি ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই হিন্দুঘেঁষা হয়ে পড়ছিল এবং কোলেটের মত অত্যুৎসাহী সমর্থকগণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের চিন্তা ও আচরণে অসংগত সহব্যাপ্তি দেখে অত্যধিক ভাবিত হয়েছিলেন। সে কারণেই প্রাগুক্ত সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৮০৭ শকাব্দের মাঘ (৫১০ সংখ্যায়) যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন সেটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "সকল হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ যে ব্রহ্মোপাসনা তাহা যাহাতে প্রচলিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহৎ অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সমাজের কার্য অদ্যাপি চলিতেছে।"

কোলেটের হিসাব অনুযায়ী সিন্দুরিয়া পট্টি মল্লিকদের পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজটি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৮১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ (১৯০ সংখ্যা) হতে জানতে পারি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্দুরিয়াপট্টির গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন উপদেশ দিতেন।[৩] প্রকৃতপক্ষে সিন্দুরিয়া-

---

২ Sopia Dobson Collet: Brahmo Year Book for 1880; p. 87

৩ বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত): সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২৬

পটিতে বৃহৎ মল্লিক পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বেশ কিছুকাল। কিন্তু হিন্দুভাব ঘেঁষা আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও মণি মল্লিক ও তাঁর পরিবারবর্গের হাবভাব দেখে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপ্রীতি লক্ষ্য করে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি"-কার যে মন্তব্য করেছেন, সেটি বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন,

নিরাকারবাদী তেঁই ব্রাহ্ম মাত্র নামে।
বড়ই পীরিতি ভক্তি প্রভুর চরণে॥

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি।" কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনীসূত্রে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, মণিলাল মল্লিক সিন্দুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরও জানা যায় যে মণিলাল ছিলেন আদি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। "তাঁর দুই পুত্র, গোপালচন্দ্র মল্লিক ও নেপালচন্দ্র মল্লিক উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন।"[৪] কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতে নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিক—দুজনেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন।[৫]

কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্মৃতিকথা হতে আরও জানা যায় যে এই মল্লিকদের বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা এবং বৎসরান্তে একবার ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হত। এস্থানেই তিনি (মিত্র মশায়) ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ব্রহ্মোপাসনার সময় শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা পরিচালনা করেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছিলেন। "কত ভালবাস গো মা মানবসন্তানে মনে হলে প্রেমধারা ঝরে দুনয়নে।" এই গানটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। তাঁর এই মাধুর্যমণ্ডিত রূপ দেখে উপস্থিত সকলের মন উর্ধ্বমুখী ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়।[৬]

৪ হেমলতা দেবী: শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ১১৯

৫ কৃষ্ণকুমার মিত্র: "আত্মচরিত": "পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীর ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব দাসের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটীর উৎসবে বহুবার দেখিয়াছি।" (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৭-এ উদ্ধৃত)

৬ কৃষ্ণকুমার মিত্র: 'রামকৃষ্ণ পরমহংস,' প্রবাসী, ১৩৪২, ফাল্গুন, পৃঃ ৬৮৩

মণিলাল বিশেষ অনুগৃহীত ভক্ত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র। কিঞ্চিৎ কৃপণ বলে পরিচিত ছিলেন মণিলাল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "দ্যাখ গো, তুমি ভারী হিসেবী, এত হিসেব করে চল কেন? ভক্তের যত্র আয় তত্র ব্যয়।" মণিলাল গরীব ছেলেদের পড়াশুনার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করতেন। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা হতে জানতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সস্নেহে উপদেশ দিয়েছিলেন, "দ্যাখো, বয়স হোলে সংসার থেকে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করতে হয়। তাহলে তাঁর উপর প্রেম জন্মায়।" লাটু মহারাজের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে তাঁর একজন ভক্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

সেই মণি মল্লিকের বাড়ীতে সারাদিনব্যাপী মহোৎসব। সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব। বাড়ীর দোতালায় বৈঠকখানা। সেখানেই কীর্তনাদির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন, "উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষপল্লবে, নানা পুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত।"

উৎসবের দিনটি ছিল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর। সোমবার। শীতকালের উন্মেষমাত্র ঘটেছে। স্নিগ্ধ আবহাওয়া, উৎসবপ্রাঙ্গণের পরিমণ্ডল আনন্দপূর্ণ। উপস্থিত ভক্তদের অন্তরে আনন্দের ফল্গুধারা, বাইরের আনন্দস্ফূর্তির কেন্দ্রে রয়েছেন আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বিচিত্র-বিস্ময় ও জনপ্রিয় আনন্দঘন ব্যক্তি।

বেলা চারটা নাগাদ সেখানে উপস্থিত হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সেই তিন পড়ুয়া—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী (পরে স্বামী সারদানন্দ), বরদাসুন্দর পাল ও হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ); কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত হন তাঁদের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তাঁরা দেখেন মধ্যাহ্ন উপাসনা সঙ্গীতাদির পর বিরতি চলেছে। পরবর্তী আকর্ষণ, সায়াহ্ন উপাসনা ও কীর্তনাদির আসর। পরিবারের মহিলা ভক্তদের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্দরমহলে গিয়েছেন, কিছু মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করবেন। হাতে সময় আছে ভেবে শরচ্চন্দ্র ও তাঁর সহপাঠীরা অন্যত্র বেড়াতে যান।

এই ব্রাহ্মোৎসব কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন, "সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিতেছেন। তাঁহারা আজ একটি বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে।" ব্রাহ্মনেতাদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

আশ্চর্য এক মানুষ। জনৈক ব্রাহ্মনেতা লিখেন, "পরমহংসদেবের চারদিকে এমন এক জ্যোতির্ঘন ভাবসমীরণ সঞ্চারিত হয় যে তার মধ্যে স্বতঃই তাঁর চিত্ত অনুক্ষণ আনন্দে ভাসতে থাকে।" অপর একজন ব্রাহ্ম আচার্য লিখেন, "(পরমহংসদেব) ধর্মচর্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতেন।··· তাঁহার যেমন শাক্তভাব, তেমনি বৈষ্ণবভাব ও তেমনি ঋষিভাব ছিল। তাহাতে যোগভক্তির আশ্চর্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগসমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া থাকিতেন।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে যে আনন্দ-মৌতাত সৃষ্টি হত তার আকর্ষণ সকলেই কম-বেশী অনুভব করত, যদিও তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তিই একমত হতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির উপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করে তদানীন্তন একটি পত্রিকা লিখেছে, "Learned pundits, educated youths, orthodox Vaishnavas and yogis gather in numbers, some from curiosity, some for the sake of Sadhu Sanga or good company, others for acquiring wisdom and joining the Kirtan."[৮]

যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়েই যোগদান করুন না কেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের গভীর অনুভূতি ও সঞ্চিত আনন্দসম্ভারের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। সহজ দৃষ্টিতে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণ তাঁর প্রিয় গানের বাণীতে পাওয়া যায়। তিনি গাইতেন, "প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। ও তার থাকে না ভাই আত্মপর।" শ্রীরামকৃষ্ণ খাঁটি প্রেমিক। সমাগত ব্যক্তিদের সমষ্টিচেতনায় যে আনন্দলহরীর স্ফুরণ ঘট্‌ত সে সম্বন্ধে প্রাগুক্ত পত্রিকা লিখেছে, "We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience.

৭ চিরঞ্জীব শর্মা: শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি, চতুর্থ সংস্করণ

৮ New Dispensation dated Jan. 8. 1882.

The effect is wonderful. Theological differences are lost in the surging wave of love and rapture."[৯]

ব্রাহ্মোৎসবের লক্ষ্য ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে হৃদয়ের উৎসবের উদ্বোধন। উৎসব-দীপালোকে প্রতিটি হৃদয়কে প্রদীপ্ত করতে সমর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ। আনন্দ-নির্ঝর শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে, নিকট-জন। সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছান্দ গতায়াত ও সহজ মেলামেশা। যে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ তীব্র রেষারেষিতে প্রমত্ত, সে সময়েও দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজের একটি সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন সকল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মগণ। সেখানে উপস্থিত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। "ইহার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও জীবন ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্যায় নিয়োজিত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা। তেজস্বী অগ্নিময় বাক্যে চিত্ত উত্তেজিত করিতে এবং করুণ ও কোমল বাক্যে চিত্ত আর্দ্র করিতে ইহার ন্যায় অতি অল্প লোকেই পারেন।"[১০] উপস্থিত নববিধানের সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্মা। সঙ্গীত বিহঙ্গের দুটি পাখা, কথা ও সুরের স্বচ্ছন্দ সঞ্চালনে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সুরেলা ও মাধুর্যমিশ্রিত কণ্ঠে যে ভাব ও ব্যঞ্জনার উপস্থাপনা করতেন তার অভিব্যক্তি ছিল হৃদয়হারী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেখানে বিদ্যমান, তিনি নবভাবে প্রকাশোন্মুখ। শুধু ব্রাহ্ম নেতারাই নন, অব্রাহ্ম হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঈশ্বরকোটি বাবুরাম, ভারবাহী শরচ্চন্দ্র, তপস্বী হরিপ্রসন্ন, ভক্তিরসসিক্ত রসদ্দার বলরাম, অবতারলীলার নিজস্ব সংবাদদাতা মহেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জটিলাকুটিলা প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

দোতলার বৈঠকখানা ঘরে সায়াহ্ন উপাসনার পূর্বে ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ রসিক। তাঁর আন্তরসত্তা রসে বশে পরিব্যাপ্ত, বিচিত্রভঙ্গীতে প্রকটিত। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "আমি কখনো পূজো, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নামগুণ গান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।" শ্রীরামকৃষ্ণ "হরিপ্রেমে মাতোয়ারা; তাঁহার প্রেম, তাঁহার

৯ New Dispensation dated Jan. 8. 1882.

১০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৮০০ শক, ৪২৮ সংখ্যা

অনন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী জাতির পূজা, তাঁহার বিষয় কথা বর্জন, ও তৈলধারাতুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় ও অপর ধর্মে বিদ্বেষ-ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বর ভক্তের জন্য রোদন"—এ সকল কারণে তিনি ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপাসনার লক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শন, ধর্মাচরণের লক্ষ্য ভাবভক্তি আত্মজ্ঞান। ভাবাগ্নিতে প্রদগ্ধ তাঁর জ্যোতির্ময় ব্যক্তিসত্তা মানুষকে আকর্ষণ করে। তাঁর অমিয় কণ্ঠের কথামৃত শ্রোতার হৃদয়জমিকে ভক্তিরসামৃতে সিঞ্চিত করে। উপস্থিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে যদি আধিকারিক পুরুষ কেউ থাকেন তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সহজেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসে আছেন সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতগোস্বামীর শোণিত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে সদালাপ করতে থাকেন সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতা শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়জন। শিবনাথের শুদ্ধ আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শিবনাথ যেন ভক্তিরূপে ডুবে আছেন। শিবনাথের মধ্যে প্রকাশোন্মুখ বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তি চিনতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করেন। অপর পক্ষে শিবনাথ রচিত গুরুবন্দনার মধ্যে পাই, "রামকৃষ্ণঃ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাব সমন্বিতঃ" এবং তাঁর স্বীকৃতি "ত্বত্বৈতান্ মহতীং শক্তিং লভেঽহং ধর্মসাধনে।" কর্ম ব্যস্ততার জন্য শিবনাথ আজ আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বর যাবেন, কিন্তু যান নি, এমন কি কোন খবরও দেন নি। সাধক জীবনের পক্ষে এ আচরণ গর্হিত। শ্রীরামকৃষ্ণ এই আচরণের মধ্যে দূষ্য বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, "এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।" "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।" মুণ্ডকোপনিষদের ঋষিও বলছেন, 'সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।' শ্রীরামকৃষ্ণের সকল আচার আচরণ নজিরের জন্য। শিবনাথ ও অপরাপর ভক্তদের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা করে দেবার জন্য অহং-শূন্য-প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নিজের জীবনে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা। জীবনব্যাপী তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল যাতে তাঁর সত্যের আঁট কখনও শিথিল না হয়। তাঁর সাধন জীবনের উল্লেখ করে বলেন ;

"আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। যখন এই সব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নি, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না।" জগন্মাতার উপর চূড়ান্ত শরণাগতির নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র, কিন্তু সেখানেও দেখছি একমাত্র সত্যনিষ্ঠাই তাঁর আদর্শের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকার ঘন হয়। সমাজ গৃহে আলো জ্বালা হয়। ব্রাহ্মোপাসনার পদ্ধতি অনুযায়ী আচার্য বিজয়কৃষ্ণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। প্রণব সংযুক্ত এই মন্ত্র সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, সমবেত উন্মুখ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। সকলের মন ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ভাবনায় নিবিষ্ট হয়। উপাসকগণ চোখ বুঁজে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হন, পরিবেশের গুণেই বোধ করি সকলের মন ধ্যানমুখীন হয়। ভক্ত সাধারণের মধ্যে সুশোভিত হচ্ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যেন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল জৈমিনী ভারতের শ্লোক:

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ লীলাপ্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা॥

ভক্তের ভূমিকায় শ্রীভগবান। দীর্ঘকালের অলৌকিক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ণে তিনি স্বয়ং নিযুক্ত। ব্রহ্মোপলব্ধির মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে আছেন, ধীর স্থির স্পন্দনহীন। নাসাগ্রে তাঁর দৃষ্টি স্থির, আনন্দদীপ্তিতে মুখ উদ্ভাসিত। সমবেত সকলেই প্রাণে শিহরণ অনুভব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসারিত আনন্দের ফাগে সকলের হৃদয়ে সাময়িক-ভাবে হলেও রঙীন আনন্দলোক সৃষ্টি করে। রোমাঞ্চিত-বপু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখকমলে দিব্যানন্দের বিভা। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির গভীরতা অনেকেই ধারণা করতে পারে না। কিন্তু বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে মৃতবৎ হয়েও তিনি যে অপূর্ব কোন কিছু দর্শন করেছেন, শ্রবণ করেছেন, রস সম্ভোগ করেছেন, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হন। বাহ্যস্ফূর্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে। তিনি চারদিকে চোখ মেলে দেখেন; দেখেন সমবেত অনেকেই চোখ বুজে বসে আছেন। ভাব-প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' উচ্চারণ করে দাঁড়িয়ে পড়েন। খোল করতাল সহযোগে কীর্তন আরম্ভ হয়। অল্পসময়ের মধ্যেই অভূতপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে শরচ্চন্দ্র দেখেন, এক অপূর্ব দৃশ্য! "গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস-গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ-বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন; কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখনও বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন।"[১১]

১১ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৩১-৩২

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সুকণ্ঠ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান একজন সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি প্রাণের অনুভূতি মিলিয়ে সুরেলা দরদভরা কণ্ঠে স্বরচিত একটি ভক্তিমূলক গান বারংবার গাইতে থাকেন। ভাবের বন্যা উৎসারিত হয়, আধ্যাত্মিক স্ফূর্তির অভিব্যক্তি গভীর ভাব ও ব্যঞ্জনার মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি গাইছেন:

নাচরে, আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে।
মনের সুখে হাস্যমুখে মাকে ঘিরে।
শান্তিরস পান করি নাচ ধীরে ধীরে;
(জনক সনকের মত রে)
যোগনেত্রে হে হরিরূপ হৃদয়মন্দিরে।
হুঙ্কার গর্জ্জনে নাচ মহানন্দ ভরে;
(নিতাই গৌরের ভাবে রে)
প্রেমমদে মত্ত হয়ে বিঘূর্ণিত শিরে।[১২]

বাজছে খোল করতাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমধু সংগ্রহ করছেন, বিতরণ করছেন। তিনি আখর দিচ্ছেন—

নাচ মা ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে
আপনি নেচে নাচাও গো মা;
(আবার বলি) হৃদপদ্মে একবার নাচ মা;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহন রূপে।

তদগত হয়ে তিনি আখর দিচ্ছেন। আবার কীর্তন গানের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য তাঁর নৃত্য। কথামৃত, নৃত্য ও কীর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহোৎসবের আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের স্মৃতিচারণ হতে জানতে পারি "চিরঞ্জীব শর্মার একতারা বাদনে 'নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে।' গীত-শ্রবণে ভাবাবেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রভু ভক্তগণকে স্বর্গসুধা বিতরণ মানসে বামবাহু উত্তোলন ও দক্ষিণভুজ কুঞ্চনে, বামপদ আগে ও দক্ষিণ চরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি মেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম।"[১৩]

কথা ও সুরের সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙালীর এক অভিনব সৃষ্টি কীর্তন গান। ছন্দ-

১২ "চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী"তে প্রকাশিত ৩২৮ নং গীত।

১৩ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬

নৈপুণ্যে, ভাষার কারুকার্যে, ভাবের মাধুর্যে, রসের প্রাচুর্যে, ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যে কীর্তন ও সংকীর্তন বাঙ্গালীর প্রাণরসের পুষ্টিবিধান করেছে। সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী বিবেকানন্দও বলতেন, "সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে—মাথুর বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।" সেই কীর্তনের সুর ও ভাব যখন নৃত্যের চলন, বয়ান, আঙ্গিক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সহজ লাবণ্যে আত্মপ্রকাশ করে তখন শ্রোতা ও দর্শক বিমোহিত হয়। সাময়িকভাবে হলেও লৌকিক চেতনা হারিয়ে যেন অলৌকিক আনন্দলোকে তারা ভাসতে থাকে। বিশেষ করে সেই আসরে যদি অংশগ্রহণ করেন পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্কীর্তনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন "সাধারণ লোকের কীর্তন হইল গতি হইতে ভাব-এ...পরমহংস মশাই-য়ের কীর্তন হইল ভাব হইতে গতিতে।...পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল দেবনৃত্য, যাহাকে চলিত কথায় বলে শিবনৃত্য। ইহার সহিত চপল ভাবের কোন সংস্রব নাই। এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন।...এই সময়ে পরমহংস মশাই-এর দেহ হইতে যেন আর একটি ভাবদেহ বিকাশ পাইত।...পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপ জমাট ভাবমূর্তি লইয়া, সকলের ভিতর, অল্পবিস্তর, সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।..কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম।"[১৪] বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী একই বস্তু বিভিন্নভাবে দেখেন ও বর্ণনা করেন। সঙ্কীর্তনে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণ চিত্রশিল্পী প্রিয়নাথ সিংহের দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিভাত হয়েছিলেন সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন। দর্শকের মনে হইতেছে, যেন রামকৃষ্ণদেবের শরীর অস্থিবিহীন। যখন দক্ষিণ দিকে হেলিতেছেন বোধ হইতেছে, তাঁহার শিরোদেশ প্রায় ভূমি স্পর্শ করিল। পদদ্বয় তালে তালে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আবার কখনও 'লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা' উদ্দাম নৃত্য, যেন সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অনুযায়ী তাল ও লয় তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা। ঘর দ্বার পৃথ্বী বায়ু আকাশ

---

১৪ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ ১১৫-৬

সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেম-প্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা।"[১৫] আমাদের সৌভাগ্য যে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সঙ্কীর্তনানন্দে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি রেখাচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। "দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত,...বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।"[১৬] এই প্রাণবন্ত দৃশ্যটি শিল্পাচার্যের তুলিতে বিধৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্ভাবে ডাইল্যুট (dilute) হয়ে গিয়েছিলেন। ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের অবয়ব ও রূপ যেন এককালে পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এদিকে জনসংঘের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেগ সংক্রামিত হয়, উপস্থিত সকলেই অল্পবিস্তর ভাববিহ্বল হয়ে "এক উচ্চ-আধ্যাত্মিক স্তরে" অবস্থিতির রসাস্বাদন করে ধন্য হয়। এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লীলামৃতকার লিখেছেন, "এই নৃত্য দর্শনে ভক্তের ত কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রামিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, বোধ হ'ল যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।"[১৭] সংকীর্তন-গায়ক ও শ্রোতার মনমধুপকে হরিমধুগুণ আকৃষ্ট করে। কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করে হরিরস মদিরা পান করে বিষয়ানন্দ ভুলে যান সকলে। ভাব মাধুর্য্য ও লালিত্যে সমৃদ্ধ সকলের মন কিছুক্ষণের জন্য হলেও বুঁদ হয়ে থাকে। এভাবে দুঘণ্টারও বেশী সময় অতিবাহিত হয়। এবার কীর্তনীয়া এই আসরের শেষ গীতটি ধরিলেন,

"এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে।

এ নাম নিতাই এনেছে না হয় গৌর এনেছে,

না হয় শান্তিপুরের অদ্বৈত সেই এনেছে।"

কীর্তনের নাম তরঙ্গে শ্রোতা গায়ক বাদক সকলের চিত্ত হেলিতে-দুলিতে থাকে—সকলেই নামে মাতোয়ারা—কারো নয়নে বারিধারা—লোকনির্বিশেষে সকলে আত্মহারা। এবার সকল সম্প্রদায় ও ভক্তাচার্যদের প্রণাম জানিয়ে

১৫ গুরুদাস বর্মণ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃঃ ২৪৩-৪৪

১৬ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৭৪

১৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত: ঐ, পৃঃ ৩৪৬

কীর্তন সাঙ্গ হয়। সকলে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের দিব্য-ভাবের ঐশ্বর্যবিভায় সকলেই মুগ্ধ, এর সুখস্মৃতি বাবুরাম সযত্নে তাঁর স্মৃতিকোঠরে রাখেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ে ব্রাহ্ম নেতা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অনুরোধ করেন 'হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে' গানটি গাইতে। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত গান। নগেন্দ্রনাথ আবিষ্ট চিত্তে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গানটি পরিবেশন করেন। সকলেই তৃপ্ত হন। কীর্তনে, শ্যামাসঙ্গীতে, ভজনে বা অন্য অধ্যাত্মতত্ত্বের গানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য গানের ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করা। গানের রঙ্গিনী-শক্তিতে শ্রোতাদের মোহিত করা।

বিষয়বিনিবৃত্ত প্রশান্ত মন নিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তি উপস্থিত। সংসারী ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণা যেন উথলে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের। তিনি তাঁর সুকণ্ঠে বলতে থাকেন, "হাতে তেল মেখে কাঠাল ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগে না। চোর চোর যদি খেল বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নেই।...মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তোলা হ'ল তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।" শ্রীজগন্মাতা যন্ত্রী, শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্র। যেমন আকাশের জল ছাদ হতে বাঘের মুখ, হাতীর মুখের ভিতর দিয়ে বেরোয়, তেমনি জগন্মাতার দৈববাণী স্ফুরিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন, "অবতারের মুখ দিয়ে তিনি নিজে কথা কন।"[১৮]

ব্রাহ্মনেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে। ব্যাপকার্থে সত্যানুসন্ধানকেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ বিবেকের তাড়নায় আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেও তৃপ্তি পান নি। তাঁর স্বভাবানুগ ভক্তির প্রস্রবণ জ্ঞান বিচারের পাথরে চাপা পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও ঘটনাবিবর্তনে সেই প্রস্রবণ এখন মুক্তপ্রায়। বৈরাগ্যের প্রেরণায় তিনি গিয়েছিলেন গয়াতে। নির্জনে কিছুদিন সাধন ভজন করেছেন। আকাশগঙ্গা

---

১৮ স্বামী জগন্নাথানন্দ: শ্রীম-কথা (১ম খণ্ড), ১৩৪২ সাল, পৃঃ ১৫২

পাহাড়ে যোগিবর ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি গেরুয়া ধারণ করেছেন। সর্বদাই অন্তর্মুখ। তাঁর দ্রুত উত্তরণ দেখে অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী। বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।" বিজয়কৃষ্ণের সর্বাঙ্গে গৈরিক চিহ্ন দেখে সহাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আজ-কাল এর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপর খুব অনুরাগ। লোকে কেবল কাপড় চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা মায় জুতো জোড়াটাও পর্যন্ত গেরুয়ায় রাঙিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যখন ঐরূপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অন্য কিছু পরতে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।"

রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ—সে রস বিভিন্ন ধারায় নিঃসারিত হচ্ছে চতুর্দিকে। অধ্যাত্মরসে বিসিঞ্চিত বিজয়কৃষ্ণকে তিনি সাদরে বলেন, "যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে—সব ছেড়ে তুমি বলো 'মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে'।" এই ভাবটি বিজয়কৃষ্ণের অনুরাগ-অভিসিঞ্চিত হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রাণমাতানো সুরেলা কণ্ঠে গাইতে থাকেন, 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন তুই ত্থাখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে'। ভক্তির আবহ পরিমণ্ডলকে মধুময় করে তোলে। তিনি বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ করেন ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে লজ্জা ঘৃণা ভয় প্রভৃতি অষ্টপাশ ত্যাগ করতে। খাঁটি নিষ্ঠা থেকে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। তারপর হয় ভাব। ভাবেতে বায়ু স্থির হয়। আপনি কুম্ভক হয়। ভগবানের প্রেম দুর্লভ। প্রেমের উদয়ে জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। এই সৎপ্রসঙ্গ শ্রোতার কাছে বলদ প্রাণদ হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় কণ্ঠের মাধুর্য ক্ষরণে। তিনি গান ধরেন—

সেদিন কবে বা হবে ?
হরি বলতে ধারা বেয়ে পড়'বে (সেদিন কবে বা হবে ?)

শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যামৃতের প্রবাহ সকলকে স্তব্ধ করে রাখে। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত আরও কয়েকজন ব্রাহ্মভক্ত প্রবেশ করেন। তাঁদের কয়েকজন পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রজনীনাথ রায়। এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সরকারী অর্থদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী

নেতা। উপস্থিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ প্রশ্ন করে সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা করেন। স্ত্রীভক্তগণ বৈঠকখানা ঘরের পূর্বদিকে চিকের আড়ালে বসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মণিবাবুর বিধবা কন্যা নন্দিনী। ভক্তিমতী নন্দিনী শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা। তাঁদেরও কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন-সকলের সমাধান করে দেন। আলোচ্য-বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট ও দৃঢ় করে দেবার জন্য মাঝে মাঝে প্রেমভক্তির গান পরিবেশন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ে নবাগত রাজকর্মচারী পণ্ডিতদের উপর। তিনি বলতে থাকেন "যারা শুধু পণ্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে...কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহংকার করে। এ সব দুই দিনের জন্য; কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে—'ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছেভ্রম ভূমণ্ডলে। ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে। ইত্যাদি।" তিনি আরও বলতে থাকেন, "আর টাকার অহঙ্কার করতে নেই।...ধনীর আবার তারে বাড়া, তারে বাড়া আছে। ...ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুকালের জন্য পাশের একটি ঘরে ব্রাহ্মভক্তদের সম্মুখে 'রামচরিতমানস' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছিলেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীকে একের পর এক কীর্ত্তনের লহরী পরিবেশন করে চলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অমানুষী শারীরিক ও মানসিক শক্তি দেখে মোহিত একজন ভক্ত লিখেছেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, দীর্ঘকাল নৃত্য করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলেও প্রভুর ক্লান্তি নাই। বরং অধিকতর উল্লাসে শ্যামাবিষয়ক মধুর গীতে সকলকেই মোহিত করেন। তাতে বোধ হ'ল, ভ'গবতী তনু ব্যতীত মানবদেহ এরূপ বন্যা ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।"[১৯] শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে পরিবেশন করেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত গান—

"মজ্‌ল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥" ইত্যাদি

এরপরেই তিনি গান করেন নরেশচন্দ্রের বিখ্যাত কীর্তন—

"শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল।
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল॥"

ইত্যাদি

১৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, ঐ, পৃঃ ৩৪৬

সক্ষম কীর্তনীয়া রসের বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব আদি ক্রম অনুসরণ করে কীর্তনের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা তাঁর উৎকর্ষতা ও পুষ্টিবিধান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত শিল্পবোধ ও সূক্ষ্ম কাব্যরস কীর্তনগানে প্রয়োজনমত আখর জুড়ে দিতে সাহায্য করেছিল। আখরের উদ্দেশ্য গীতার্থের বিস্তার করে রসসিক্ত শ্রোতার মনকে গভীরতর ভাবে আপ্লুত করা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই (দিলীপ রায়কে) বলেছিলেন, 'কীর্তনের আখর কথার তান।' আসরে নিজের কীর্তনে আখর জুড়তেন, তেমনি অন্যের গানেও নিপুণভাবে আখর দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কীর্তনের গীতি-রীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাছাড়াও তাঁর অসাধারণ স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আখরগুলি। উপযুক্ত আখরের সংযোজনে ভাবের গাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ ধরেন রামপ্রসাদের গান—

'এসব শ্যামা মায়ের খেলা
(যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা)
(মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা।)
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা,
ক্ষেপা দুটী চেলা॥' ইত্যাদি

গায়েন শ্রীরামকৃষ্ণ সুরের তরঙ্গে ভেসে চলেছেন। এবার তিনি রামপ্রসাদী গান "মন বেচারীর কি দোষ আছে, তারে কেন দোষী কর মিছে," ইত্যাদি পরিবেশন করেন। এরপরের তাঁর সুগীত গানটিও রামপ্রসাদী। গানের বাণীর প্রথমাংশ "আমি ঐ খেদে খেদ করি! তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি॥"গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতগুণ সম্বন্ধে শ্রীম লিখেছেন যে, তাঁর 'মধুরকণ্ঠ', 'গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ','প্রেমরসাভিসিক্ত কণ্ঠ,' সকলেই তাঁর গানের সপ্রশংস শ্রোতা। তিনি শ্যামা-সঙ্গীতের ভাবুক গায়ক। বেশী গাইতেন রামপ্রসাদ, তারপরেই কমলাকান্ত। নিপুণ গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ মূল গানের সুর ও রীতি বজায় রেখেই গাইতেন।

এখানেই গানের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই গানের আসরে ঘটে গেছে একটি ছোট্ট মধুর ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃস্নেহের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাঁর 'দরদী' বাবুরাম ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় পীড়িত। তিনি নিজে খাবেন বলে কয়েকটি সন্দেশ ও জল আনিয়ে নেন। নিজে কণামাত্র গ্রহণ করেন, অধিকাংশ দেন বাবুরামকে। বাবুরামকে খাইয়ে তিনি আবার গান গাইতে থাকেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। রাত্রি প্রায় নয়টা। নীচের উঠানে সায়াহ্ন উপাসনা হবে। বিজয়কৃষ্ণ উপাসনা পরিচালনা করবেন। বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। বিজয়কৃষ্ণকে দেখে রঙ্গরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, "বিজয়ের আজকাল সঙ্কীর্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয় পাছে ছাদশুদ্ধ উল্‌টে যায়।" সকলে হেসে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন তাঁর গ্রামাঞ্চলের অনুরূপ একটি ঘটনা। বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করেন, 'ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক তোমার।' আচার্য বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরা উপাসনার জন্য নীচে যান। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণকে আহারের জন্য অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ উপাসনাস্থলে উপস্থিত হন। কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গে একাসনে বসেন। দশ-পনেরো মিনিট পরে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সভাস্থল ত্যাগ করেন। রাত্রি দশটা উত্তীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মোজা, গরম জামা ও কানঢাকা টুপি পরেছেন তিনি। রাস্তায় হিম লাগতে পারে। ঘোড়ার গাড়ী চলতে থাকে। রামকৃষ্ণ-মধুভাণ্ডের রস সঞ্চিত হয়ে থাকে ভক্তসকলের হৃদয়কুটীরে। মণি মল্লিকের গৃহ-আঙ্গিনা ভক্তজনের স্বপ্নকল্পে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। উৎসবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে শ্রীম'র সঙ্গে সমকণ্ঠে বলতে হয়, "ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী, নিরাকারবাদী এক হয়; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক হয়, চারি বর্ণ এক হয়। ভক্তিরই জয়। ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তোমারই জয়।"[২০]

অবতারকে বুঝতে 'অনুভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।' অবতারের কলমির দলের অন্তর্ভুক্ত বাবুরাম। সহজেই তাঁর প্রত্যক্ষ হয়, জ্ঞান হয়। দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সাহচর্যে দরদী হিসাবে লীলার রসাস্বাদন করেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে সংকীর্তনানন্দের ভাবোল্লাসের মধ্যে 'প্রোজ্জ্বলভক্তি-পটাবৃতবৃত্ত' শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবিড়ভাবে দেখবার বুঝবার সুবিধা পেয়েছেন। শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন নূতন ভাবগঙ্গার অন্যতম বাহক হিসাবে। ভাবপ্রচারক স্বামী প্রেমানন্দ বলতেন, 'আমি যেখানে যাব সেখানে বাহিরে ঠাকুর বসাব না, মানুষের হৃদয়ে বসাব।' তিনি অগণিত মানুষের বিশেষতঃ যুবকদের হৃদয়মন্দিরে নূতন যুগের আদর্শদীপ প্রতিস্থাপিত করেছিলেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

---

২০ কথামৃত ১।১৩।৭

লীলাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হবার পরেও মণি মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। আলমবাজার মঠে থাকাকালীন বাবুরাম তথা প্রেমানন্দের সঙ্গে মণি মল্লিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সাক্ষাৎ হয়েছিল 'তটিনী কুটীরে', গঙ্গার ধারে মণি মল্লিকের বাগান বাড়ীতে, তাঁর বৈঠকখানা ঘরেতে। সেদিন প্রেমানন্দের সঙ্গে মণিবাবুর অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে মণিবাবু বলেছিলেন, "আমরা সংসারী লোক—ভোগবিলাসে থাকি, আমাদের আবার মুক্তি কোথায় হবে? আর আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী—যেন কামধেনু, সামান্য জটেবুড়ি খেয়ে অমৃত-দুধ দিয়ে থাকেন।" মণিবাবু যথার্থই বলেছিলেন প্রেমানন্দ প্রমুখ কামধেনু বর্তমানকালের মানুষের সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করতে সমর্থ। রামকৃষ্ণ ভাবধারা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম।

কীর্তনে নর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচৈতন্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নরোত্তমদাসের হরিভক্তিরসসিঞ্চিত বঙ্গদেশ, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,দেওয়ান নন্দকুমারের শক্তিসাধনার পীঠস্থান এই দেশ। এই পীঠস্থানকে সুজলা সুফলা করে প্রবাহিত পতিত-পাবনী কলকলনাদিনী গঙ্গা। এর পূর্বতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। রাণী রাসমণি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জগন্মাতা ভবতারিণীর নবরত্ন মন্দির। পাষাণ-মূর্তিতে চিন্ময়ী জগন্মামাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের সাধ্যাতীত বিচিত্র সাধনভজন করে তিনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান পূর্ণায়ত্ত করছেন। সাধক পণ্ডিতবর্গ শ্রীরামকৃষ্ণবপুতে আবিষ্কার করেন ঐশ্বরিক শক্তির অবতরণ। তাঁর মধ্যে কেউ দেখেছেন, "নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব", কেউ বলেছেন, "সাক্ষাৎ কালীর জীবন্ত বিগ্রহ", কেউ স্তুতি করেছেন, "সর্বদেব-দেবীস্বরূপ" বলে। একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে সত্ত্বগুণের অশ্রুতপূর্ব স্ফুরণ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। পূর্ণপ্রকাশ, জ্ঞানসূর্য ও ভক্তিচন্দ্রের সহাবস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তা দিব্যোজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত। তাঁর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য অনুধাবন ক'রে ইংলণ্ডের মোক্ষমূলার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন 'একজন যথার্থ মহাত্মা'। ফরাসী রোমাঁ রোলাঁ বললেন, "চৈতন্যতরুর একটি কুসুমিত শাখা"। নয়াশিক্ষিতদের অন্যতম প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, "full of soul, full of the reality of religions, full of joy, full of blessed purity".

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজমুখে শুনি: "এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি,—আর একটি ভক্ত হয়ে আছে।···কারোই বা বোলবো,কেই বা বুঝবে! তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়···বাউলের দল হঠাৎ এলো ;—নাচলে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো—গেলো, কেউ চিনলে না"। তিনি আপনমনে গান করেন, "তারে কেঁউ চিনলি না রে! ওযে পাগলের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে"। অবতারতত্ত্বের অবধারণ কঠিন, কারণ মানুষের যুক্তি-

বিচারের পরিমিতিতে এটা ধরা পড়ে না। এই তত্ত্ব উপমা দিয়ে বোঝান যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "অনুভব হওয়া চাই—প্রত্যক্ষ হওয়া চাই"।

ঊর্ণনাভ নিজের তৈরী জালের মধ্যে অবস্থান করে। তেমনি "ত্বং ক্রীড়সে নিজ-বিনির্মিত মোহজালে, নাট্যে যথা বিরহতে স্বকৃতে নটো বৈ"।১ স্বরচিত নাটকে নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে আনন্দ পান, সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন, কিন্তু নিজে স্বরূপে থাকেন আবিকৃত, তাঁর স্বরূপ থাকে অবিস্মৃত। জগৎসংসারে জগন্মাতার লীলাবিলাসও অনুরূপ। তাঁর শক্তির ঐশ্বর্যই শ্রীরামকৃষ্ণ। অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বানুস্যূত ঐক্যানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-অজ্ঞানের চৌহদ্দি পেরিয়ে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থায় ভাবমুখে থাকেন, 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করে 'বিদ্যার আমি' 'পাকা আমি' রাখেন রসাস্বাদনের জন্য, লোককল্যাণের প্রয়োজনে। চির-আনন্দময় বিজ্ঞানীর "তাঁকে চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ, আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।"২ অবতারের নরদেহে ভগবৎ-ভাবৈশ্বর্য উপছে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এ (দেহ) যেন কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে"। কীর্তন গান নৃত্য চিত্রাঙ্কন মূর্তিগড়ন যাবতীয় শিল্পচর্চার মাধ্যমে বিজ্ঞানী যেন 'দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলেন আপনারে।" "তাঁর মধ্যে বিজ্ঞানী ও শিল্পীর যৌথাবস্থান। বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই তো এরূপ এলান ভাব।"৩ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে সুসজ্জিত জগৎমালঞ্চে চক্ষু মেলেও দর্শন করেন, আর চক্ষু মুদেও দেখেন যে তিনিই সব হয়েছেন। আবার এক অবস্থায় অখণ্ডে মন-বুদ্ধিহারা হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্যক্ বুঝতে না পারলেও তাঁর অসাধারণ জীবন ও কথামৃত রাজধানী কলকাতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৮৩৬ শকাব্দের শ্রাবণ-পূর্ণিমা সংখ্যায় "ধর্মপ্রচারক" লিখল: "মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধন কাননের একটি সুগন্ধি পুষ্প।...ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধলাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন।...লোকে যে সময়ে ভবিষ্য-জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকে,

১ দেবী ভগবত, ১।৭।৪২ ২ কথামৃত, ৩।৯।৩ ৩ কথামৃত, ৩।৯।২

সে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন।...সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না। কিন্তু মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন, রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসল ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।...রিপুমদমর্দ্দিনী রঙ্গিনী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণমন নাচিয়া উঠিল।.. ভক্ত বাইরে পাগল হইলেন, অন্তরে অচল অটল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।...ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি ; তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থবিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী।"

জনপ্রিয় পত্রিকা 'সুলভ সমাচার', ১৮৮১ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করল : "তিনি ছেলের মত সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মত করেন, তিনি কখনও হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন। কখনও মাকালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখনও কখনও পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান।...সম্প্রতি তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন।"

শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বৈচিত্র্যই নয়, তাঁকে কেন্দ্র করে যে ভাবতরঙ্গের কল্লোল রাজধানী কলিকাতাকে মোহিত করেছিল তার মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। 'ধর্মমত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮০১ শকাব্দ ১৬ই আশ্বিনের সংবাদে প্রকাশিত হয়, "বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫।৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর প্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহার জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে,

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ,
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তিতূষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ'।

ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁদের নাম গান করেন, কখনও তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করে'। পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।" শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত ঈশ্বরপ্রেমিকের লক্ষণগুলির জীবন্ত সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখে ব্রাহ্মনেতা-গণ বিস্মিত হন, শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণতি জানান।

১৩ই কার্তিক, ১৮০১ শকাব্দ শারদীয়া পূর্ণিমা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বজরা, ভাওয়ালিয়া ও ডিঙ্গিতে করে প্রায় আশিজন ব্রাহ্ম ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলনে মধুর ভাবের তুফান ছোটে, এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের বজরা ভক্ত-যাত্রীদের নিয়ে নানা রঙ্গেভঙ্গে ভবসাগরের পথে অগ্রসর হয়। চাঁদনীঘাটে কেশবচন্দ্র উপাসনা পরিচালনা করেন। প্রার্থনার পর ত্রৈলোক্যনাথ একটি নবরচিত মাতৃভাবের কীর্তনগান পরিবেশন করেন। "তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। 'মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়'। সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না।" ৪

বিভিন্ন গোষ্ঠীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্যমণ্ডিত ভাবমূর্তির আন্তরধর্ম সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল New Dispensation পত্রিকার ৮ই জানুয়ারী-সংখ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের মিলনে উৎসারিত রসমাধুর্যের উল্লেখ করে পত্রিকাটি লিখেছে, "We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience.

৪ ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা

The effect is wonderful. Theological difference are lost in the surging wave of love and rapture". রামকৃষ্ণ ফেনোমেননের আবির্ভাবে কলিকাতা সহরবাসীর একাংশ ভগবৎনামে মাতোয়ারা, ভগবদ্ভাবে তাদের নয়নে প্রেমধারা, বিভিন্ন ভাবরসে সকল মানুষই আত্মহারা। সকলেই অনুভব করেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ, দুর্বোধ্য সে আকর্ষণ।

রসনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে অপর একজন সাত ফোঁকর দিয়ে নানা রাগিণী বাজায়। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যে ভারতীয় মহাসঙ্গীত (symphony) উত্থিত হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত ধারাটি অধ্যাত্মবিজ্ঞানাশ্রিত এবং সেটিকে অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পসাধনা বিচিত্রভঙ্গীতে উৎসারিত হয়েছিল, মানুষ মুগ্ধ হয়েছিল। পঙ্কজের মত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের মূল লোকচক্ষুর অন্তরালে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির গভীরে, কিন্তু সেই উৎস থেকে উৎসারিত রসে পরিপুষ্ট তাঁর জীবনলতা পত্র-পুষ্প, কোরক-কিশলয়ের শোভা ও সৌরভ বিস্তার করেছিল; চিত্রশিল্প, চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি শিল্পের বিচিত্র সুষমা তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করেছিল। অধ্যাত্ম প্রাণরসনা থেকে উৎসারিত তাঁর শিল্পচেতনা প্রসারিত হয়েছিল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে, মনোহর দেহসঞ্চালনে, মনোমোহনকারী অভিনয়-পটুতায়। সামগ্রিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি অনুপম শিল্পকৃতি; শিল্পের সুমিত গঠন ছন্দ-শৃঙ্খলার বাঁধনে পড়েও অপরিমিত বিচিত্র আনন্দফাগ চারিদিকে বিতরণ করেছে। তাঁর পূর্ণায়ত শিল্পীসত্তা গানে, সঙ্কীর্তনে, নৃত্য-নাট্যে, পটচিত্রণে, মূর্তিগড়নে যে-নৈপুণ্যের সাক্ষী রেখেছে তা প্রকরণগত বা টেকনিক্যাল পরিমাপে কখনও কোথাও সীমিত হলেও মূল রসসঞ্চরণে অমিত অসীম। আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনি, "আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" শিল্প ও সংস্কৃতির সাযুজ্য রামকৃষ্ণজীবনে স্বাভাবিকভাবে পল্লবিত হয়েছিল, মনোরম জীবন-ঐশ্বর্যের মাধুর্যে সকলকে আনন্দরসে রসায়িত করেছিল। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "পরমহংসদেব বলিতেন, যাহার শিল্প-রসবোধ নাই—সে কোমল ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌছতে পারে না।" [৫] অধ্যাত্মসুধাসঞ্জাত শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল রূপে-

৫ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: স্বামী বিবেকানন্দ ও উনবিংশ শতকের বাঙ্গালা, পৃঃ ৩৩৪

রঙে সুরে-বাণীতে নৃত্যে। তাঁর শিল্পপুরিত জীবনের শিল্পচেতনা কিন্তু তাঁর ধর্মচেতনার পরিপূরক। এই শিল্পচেতনা দেশ-কালের সীমানা পার হয়ে বিরাটের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল, ভূমি থেকে ভূমাশ্রয়ী হয়েছিল।

জাহানাবাদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর। পল্লীবাংলার স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে সদানন্দ বালক সহজাত শিল্পবোধকে বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সহজেই। রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, রামরসায়ন, চণ্ডীর গান, হরিকথা ইত্যাদি ছাড়াও গ্রামের তিন দল যাত্রা, একদল বাউল, দু'একদল কবি, বালকশিল্পীকে লোকসংস্কৃতির রসাস্বাদন ও সঞ্চয়নে সাহায্য করেছিল। তাঁর খেলাধূলার সাথী যুগী, কামার, জেলে মালা সকলের সঙ্গে তিনি সরলপ্রাণে মিশেছিলেন। তাঁর অকপট ভালবাসার চন্দ্রাতপতলে ও সদাচরণের প্রাঙ্গণে গ্রামের উচ্চাবচ সকল জাতের ও সকল বয়সের মানুষ স্থান পেয়েছিল। আবাল্য বিভিন্নধরনের মানুষের সাহচর্যের ফলে তিনি সহজেই গণচেতনার অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। ফলে কি তাঁর ধর্মজীবন, কি শিল্পসাধন, তাঁর যাবতীয় কার্যকলাপ ছিল প্রীতি ও সহানুভূতি মাখানো এবং জগতের কল্যাণাভিমুখীন। সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে বলতে হয় প্রোটিয়াসের মত শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মা যখন যা দেখত কল্পনা করত তাই মুহূর্তে নিজের মধ্যে রূপায়িত হত। শিল্প ও প্রেমের চিহ্ন এই রূপগ্রহণের শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল অপরিমিত, এই শক্তির সাহায্যে তিনি আশৈশব বিশ্বের সকল মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, বিশ্বের সকল সত্তাকে আপনার করে নিতে পেরেছিলেন।

বাল্যকালের স্মৃতিচারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দশ-এগার বছরের সময়, বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠের উপর কি দেখলাম। সেইদিন থেকে আরেকরকম হয়ে গেলাম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলাম।" লোকবুদ্ধির অতীত পথ ও পদ্ধতিতে বালকের অধ্যাত্মজীবনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি হতে থাকে, এবং তার অঙ্গ-রূপে তাঁর শিল্পচেকনা সঙ্গীত চিত্র নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। আঙ্গিক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌন্দর্যের সমাবেশে তাঁর অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সাধনার পরিমণ্ডল বিচিত্র আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বিদ্যা বৃংহণনাম্; বৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারকদের মধ্যে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ। বিদ্যা বিদ্যার্থীর পুষ্টিবিধান করে। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার যৌথ-চর্চা ও চর্যা

বালক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পরিস্ফুট। গ্রামের পাঠশালায় পুঁথিপাতার পাঠের চাইতে বেশী আদরণীয় ছিল যাত্রা, গান, নাচ ইত্যাদির অনুশীলন। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আদেশে শিশুশিল্পী গদাধর।

আপনি করেন গান মুখে বাদ্য বাজে।
দুই হাতে দেন তাল পদদ্বয় নাচে॥
গীতবাদ্য-নৃত্য তাঁর অতি পরিপাটি।
মাঝে মাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ত্রুটি॥
পাঠশালা হৈল ঠিক রঙ্গশালা মত।
নিত্যপ্রায় গদায়ের যাত্রা তথা হ'ত॥৬

কিশোর গদাধর লোকালয়ের ভীড় এড়িয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে মিলিত হতেন গোঠে, মানিকরাজার আমবাগানে। সেখানে সাথীদের নিয়ে কিশোরশিল্পী মাথুর-গান করতেন।

অতি-পুলকিত অঙ্গ গদাই আনন্দে।
কাহারে করেন সাথী কৈলা কারে বৃন্দে॥
আপনি হৈলা নিজে রাই-কমলিনী।
বিদগ্ধ বিরহগান ধরিল তখনি॥৭

তাঁর গ্রামজীবনের স্মৃতিচয়ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ওদেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখত ও শুনত।…চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম।…কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম।…তাদের কথা, স্বর নকল করতুম।…আমি এসব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রায় সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়-দমন ৮ যাত্রার দলে ছিলাম।"৯ এই তথ্যেরই যেন আবৃত্তি করেছেন স্বামী সারদানন্দ, তিনি লিখেছেন, "প্রতিমাগঠন, দেবচিত্রাদিলিখন, অপরের

৬ অক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৮
৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ১৪
৮ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রাকে সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করা হত।
৯ কথামৃত, ৫।৬।২

হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত, সংকীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীর অনুভবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত।"১০

কৈশোর-উত্তীর্ণকালেও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়ে বই কমে না। তাঁর অতুলনীয় মধুর সঙ্গীত আহিরীটোলার নাথেরবাগান, কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরের সকল মানুষের নিকট ছিল আকর্ষণীয়। তাঁর বিয়ের আট-নয় মাস পরে 'নববধ্বাগমন' উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছিলেন জয়রাম-বাটীতে। তিনি নিজমুখে বলেছেন, "শ্বশুরবাড়ী গেলাম। সেখানে খুব সঙ্কীর্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুয্যের বাপ এরা সব এলো। খুব সঙ্কীর্তন।" অনুরূপভাবে তাঁর সাধনকালে শ্রীরাধিকা ও বৃন্দার ভূমিকায় ভেকধারণ, গীত ও নৃত্য চর্চা তাঁর শিল্পানুরাগের ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করব, তাঁর স্বমুখে কথিত একটি রসাল অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন, "আমিএকজন কীর্তনীয়াকে মেয়ে-কীর্তনীর ঢঙ্, সব দেখিয়েছিলাম। সে বল্লে, আপনার এ-সব ঠিক ঠিক।" শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্নমুখী শিল্পকলার চর্চার মধ্যে বিচ্ছুরিত হ'ত তাঁর অধ্যাত্মজীবনের ঐশ্বর্য। তাঁর যাবতীয় শিল্পসাধনার ও কার্যকলাপের ফাঁক দিয়ে তাঁর ক্রমশঃ-প্রকাশিত দিব্যজীবনের ঐশ্বর্যই উঁকিঝুঁকি মারত। সেইকারণেই বোধ করি তাঁর শিল্পসাধনা একটি অশ্রুতপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য সৃষ্টি করেছিল।

ভারতীয় ললিতকলার সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যে গূঢ় সম্পর্ক, তা বিবিধ মাধ্যমে রঙ্গে ভঙ্গে প্রকটিত হয়েছে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। শিল্পী তাঁর উপলব্ধ অখণ্ডসত্তার অনন্তবৈচিত্র্যকে নবনবরূপে আস্বাদন করতে চান। সঙ্গীত নৃত্যনাট্য প্রভৃতি তাঁর কাছে অবসর বিনোদনের উপাদানমাত্র নয়, তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত। শিল্পকুশলী অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের মন শিল্পকলার সসীমরূপ ও ভাবের আঙ্গিনা অতিক্রম করে অসীমের অভিমুখে ধাবিত। ফলে শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাকৃত আচার-আচরণের আড়াল ভেদ করে অলৌকিক বিত্তার ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত হত বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে। রসযোদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় শিল্পভাবনা ভগবতাভিমুখীন, কিন্তু যেখানেই দেখেছেন রসাভাব বা অসঙ্গতি বা কৃত্রিমতা সেখানে তিনি কৌতুক করেছেন।

বিজ্ঞানী রামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

---

১০ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩২১

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি'। আনন্দচৈতন্যই চরাচর বিশ্বে অনুস্যূত। এই বিশ্বমালঞ্চের আনন্দমলয়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর দোলায়মান স্বর্ণলতা। তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ'। তিনি নিজমুখে বলেন, "যেন অসংখ্য জলের ভুড়ভুড়ি—জলের বিম্ব। আমরা দেখছি যেন অসংখ্য বড়ি বড়ি।...নানাফুল পাপড়ি থাক থাক তাও দেখেছি!—ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব"![১১] সমরস চৈতন্যে জারিত বিশ্বভুবন আর তার মাঝখানে সর্বানন্দী শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ শিল্পসৃষ্টিতে মেতে উঠেছেন।

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্মণীয় তাঁর সূক্ষ্ম রসাস্বাদনের মধ্যেও। একজন অভিনেতার নিকটে তিনি মন্তব্য করেন, "তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েছে। কেউ যদি গাইতে, বাজাতে, নাচতে কি কোন একটি বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করবে"। বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় শিল্পের কলাকৌশলের সঙ্গে অন্তর্নিহিত ভাবের সামঞ্জস্য দেখে তিনি মন্তব্য করেন, "দেখলাম—তাল মান গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করছেন"। ষ্টারে চৈতন্যলীলা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য, "আসল নকল এক দেখলাম" খুবই তাৎপর্যবহ। চৈতন্য-লীলার "কেশব কুরু করুণা দীনে..."গানটি শুনে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলেন, গান ও অন্যান্য গানের সহকারী বাদ্য শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আহা কি গান! —কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!" আবার তাদের ঐক্যতান বাজনা শুনে বলছেন, "বা! কি চমৎকার!" মহানট গিরিশচন্দ্র যাত্রা-থিয়েটার সব ত্যাগ করতে চাইলেন একবার। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করে বলেন, "না না ও থাক—ওতে লোকশিক্ষা হবে।" তাঁর অনবদ্য উদাহরণ দিয়ে বলেন, "না গো কর্ম ভালো। জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে"। সে-দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি নীলকণ্ঠকে বলেন, "তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করছো, তোমার ভক্তি দেখে কতলোকের উপকার হচ্ছে"। রসযোদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে যাবতীয় শিল্পকার্য ভগবতভাবানুরঞ্জিত। তিনি নিপুণ আঙ্গুলের মোহনস্পর্শে দেবদেবীর মূর্তি গড়েছেন, তুলির টানে রূপ-

১১ কথামৃত, ৪।৮।১

অরূপের মধ্যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন, নাট্যভাবসমৃদ্ধ গীতিকাব্যসুলভ কীর্তন-গানে ও সংকীর্তনের নৃত্যে আনন্দলোক সৃষ্টি করেছেন।

যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষপ্রীতির একটি কারণ, এসকলের মাধ্যমে সম্ভব হয় জনগণের সঙ্গে একাত্মতালাভ। রঙ্গমঞ্চের আসরে জনসমাগম দেখে রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "অনেক লোক একসঙ্গে দেখলে উদ্দীপনা হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই তিনিই সব হয়েছেন।"

যেন দিগদিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে, রহস্যঘন তার রূপ, দুর্বোধ্য তার স্বরূপ। সম্মুখে অজ্ঞান অবিদ্যার পাঁচিল, সেকারণে মাঠ দেখা যাচ্ছে না, একাধারে শিল্পী ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি ফোঁকর, তাঁর ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়, দিগদিগন্তব্যাপী প্রান্তরের রহস্য সহজে উদ্ঘাটিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ শিল্পসাধনার মধ্যে কীর্তন ও নর্তনে তাঁর ভূমিকা এই দিগদর্শনের পক্ষে বোধ করি সর্বোত্তম। কীর্তনে ভাবস্থ সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের মন একখণ্ড শিলার সমুদ্রে পতনের মত অমৃতচৈতন্যে একাত্ম হয়ে যায়। শাস্ত্রকার বলেন, "যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মরামো ভবতি।" দিব্য আনন্দোচ্ছ্বাস যখন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে, সেসময়ে তাঁকে দেখে উপলব্ধি হয় রোমাঁ রোলাঁর উক্তির তাৎপর্য: "দিব্য নগরদুর্গের সকল দিকই রামকৃষ্ণ জয় করিলেন। এবং যিনি ভগবানকে জয় করেন, তিনি ভগবৎ প্রকৃতির অংশও গ্রহণ করেন।" ১২ কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ-রঙ্গমঞ্চে তাঁর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ লীলাবিলাস বৈ ত নয়।

ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন জনপ্রিয় সাধনাঙ্গ। নারদ বলেন, 'অব্যাবৃত ভজনাৎ' —নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের ভজনাদ্বারা পরাভক্তিলাভ হয়। তিনি আরও বলেন, "লোকোহপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ", অর্থাৎ সংসারে থেকেও ভগবানের গুণশ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভক্তিলাভ হয়। অনন্যচিত্ত সাধকের নামামৃত-সাধনের ফল সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন, "নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়।" ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য, কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। প্রায়োগিক শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সাবধান করে বলেছেন, "নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার।" যেখানে ঈশ্বরের আন্তরিক কথা হয়, ব্যাকুলতার

১২ রোমাঁ রোলাঁ: রামকৃষ্ণের জীবন, অনুবাদক ঋষি দাস, ৩য় সং পৃঃ ৩৩

সঙ্গে নাম হয়, সেখানে ঈশ্বরাবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণও অঙ্গীকার করেছেন ভক্তবর নারদের নিকট "মন্নাম গায়তি যত্র তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

কীর্তন বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। "নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।" উচ্চভাষণ সম্যক্ তাল ও যোগ্য রাগরাগিণী সমন্বিত হবে। কীর্তন দুই প্রকার: নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে শ্রীভগবানের নাম ও কৃপার বিবৃতি, আর লীলাকীর্তনে হরির রূপ গুণ ও ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য। যথাযথ তাল প্রয়োগ, বিশুদ্ধ স্বর ও বিবিধ রাগরাগিণীর দ্বারা গ্রথিত বাণীসমূহের প্রস্রবণ। কীর্তন ভাবপ্রধান সঙ্গীত। ভগবৎ ধ্যান-ধারণাই তার মুখ্য লক্ষ্য।

সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য নামসংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। বিপুল ও দুর্দম তার প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল।...বাঁধন ভাঙ্গিল—সেই বাঁধন বস্তুতঃ প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম।...তখন সংগীত এমন সকল স্বর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়"।১৩ ভাবের রসের দিকেই কীর্তনের ঝোঁক, রাগরাগিণীর রূপ-প্রকাশের দিকে মন নাই। কীর্তনে জীবনের রসলীলার সঙ্গে সংগীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত। প্রকৃতপক্ষে এখানে স্বর ও ভাবের মধ্যে মনোহর অর্ধনারীশ্বর-যোগ ঘটেছে।

বিভিন্ন রাগরাগিণীতে নানা ছন্দে তালে কীর্তন গাওয়া হয়। সঙ্গে বাজে খোল করতাল বাঁশি কাঁসির ঘণ্টা। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত লয়ে সংকীর্তনের স্বর মুদারা উত্তীর্ণ হয়ে তারায় ছুটে যায়। গানের বাণী ও সুরের ভাবে উদ্বোধিত গায়ক ও শ্রোতা নৃত্যে মেতে ওঠেন। সূক্ষ্ম রসের বিন্যাস ও স্বরলয়ের সঙ্গতি কীর্তনকে করে শ্রুতিমধুর। রসতুষ্টি-যুক্ত সুকণ্ঠ স্বরজ্ঞ ও তালমানযুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ রসের বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব আদি ক্রম অনুসরণ করে কীর্তনকে নিখুঁত করেন, তার পুষ্টিসাধন করেন।

কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ। যথা—কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট।১৪ এর

১৩ রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪ খণ্ড, পৃঃ ৮৯৭

১৪ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়: বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, সাহিত্য-সংসদ, পৃঃ ৮৪

মধ্যে কীর্তনরসাস্বাদনের প্রধান সহায় আখর। মূল গায়েন প্রয়োজনমত অলঙ্কার বা আখর (অক্ষর) জুড়ে দেন ; উদ্দেশ্য গীতার্থ বিস্তার করা, রচয়িতার গূঢ়ভাব সুরের রসধারায় সিঞ্চিত করে পরিবেশন করা। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য সময় সময় মূল পদাবলী অপেক্ষা আখরকে অধিকতর শ্রুতিমধুর করে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে, কীর্তনের আখর কথার তান। আখর শুধুমাত্র পদের ব্যাখ্যান নয়, পদে অনুক্ত কথাও আখরে প্রকাশ পায়। সেদিক হতে আখর হচ্ছে পদের ব্যঞ্জনা।

ছন্দ নানাবৈচিত্র্যে মুকুলিত, তাল নানারঙ্গে প্রকাশিত। কীর্তনে বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে গায়ক শ্রোতার মনের পর্দায় দীর্ঘসময় ধরে বিষয়বস্তুটি উপস্থাপিত করেন। বাদ্য ক্রমে বিস্তারলাভ ক'রে গানের পারিপাট্য বিধান করে। সেইসঙ্গে ভাবের আবেগ গায়ক ও শ্রোতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোরম ভঙ্গীতে ছন্দায়িত করে। ভাব ও রূপ সমন্বিত হয়ে রসমাধুর্য সৃষ্টি করে। কীর্তনের প্রাণ-রসকে একই সঙ্গে সঙ্গীতে ও নৃত্যে বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই কীর্তন-নর্তনের উদ্ভব। সুর-তাল-ব্যঞ্জনায় সুসমন্বিত কীর্তন-নর্তন বাংলার সংস্কৃতির গর্বের ধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নান্দনিক অনুভূতি ও সৃষ্টি অনন্যস্বতন্ত্র হলেও কীর্তন ও নর্তন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দেশীয় ঐতিহ্যানুগ। স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি বলতেন, "ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে—মাথুর, বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।" তিনিই অন্যত্র বলেছেন, "আমাদের দেশে যথার্থ সঙ্গীত কেবল ধ্রুপদ ও কীর্তনে আছে, আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে"। সেই স্বামী বিবেকানন্দ (পূর্বে নরেন্দ্রনাথ) একদিন তাচ্ছিল্য করে মন্তব্য করেছিলেন, "কীর্তনে তাল[১৫] সম্ এসব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে"। এই মন্তব্য শুনে প্রতিবাদ করেন দিব্যশক্তিসম্পন্ন কীর্তন গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেন, "সে কি বললি ! করুণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে"।[১৬]

১৫ কীর্তনে তালের সংখ্যা ১০৮ প্রকার। এই সকল তাল ছোট, মধ্যম ও বড় ভেদে নানাপ্রকার হয়। দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদই এই প্রকার-ভেদের হেতু। (খগেন্দ্রনাথ মিত্র : কীর্তন, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৫৫-৫৬)

১৬ কথামৃত, ৪।১৭।১

বহুশাখায় প্রসারিত জনসংগীতের মধ্যে কীর্তন গানের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্থান। বাঙালীর স্বাভাবিক টান করুণাত্মক রস। তাকে আশ্রয় ক'রে কীর্তন বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করেছে। কীর্তনের ভাবরূপসী করুণ-রসের রত্নমালা গলায় ধারণ ক'রে বাঙ্গালীর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে।

কলিতে নারদীয় ভক্তি। সহজ পথ, সরল তার প্রস্তুতি। ভক্তির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধনার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন গিরিশচন্দ্রকে, "ভক্তির মানে কি —না কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া; কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম-গুণ-কীর্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যানচিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ-মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম-গুণ-কীর্তন, এইসব করা"। "বৈধী ভক্তি-সাধনের অঙ্গ শ্রীভগবানের নাম-গুণ-কীর্তন, রাগাত্মিকা ভক্তির সিদ্ধ অবস্থাতেও নাম-মাহাত্ম্য একটি সহচর, কারণ 'তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়'।"[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের মন শুক্‌নো দেশলাইয়ের মত। সামান্য উদ্দীপনেই আগুন জ্বলে ওঠে। মধুর কণ্ঠে ভাবস্বরতাললয় সমন্বিত কীর্তন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমুদ্রে উত্তাল-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দক্ষ সাঁতারু শ্রীরামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাঁতরে চলেন, ভাসেন, ডোবেন—আবার সাগরপারে ফিরে গিয়ে তৃষিত ভক্তগণকে প্রেমযমুনার প্রেমবারি অঞ্জলি ভরে বিতরণ করেন। প্রত্যক্ষদর্শী কালীপ্রসাদ (পরে স্বামী অভেদানন্দ) স্মৃতিচয়ন করেছেন, "কখনও তিনি ভাবাবেশে হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন ও নাচিতেন এবং কখনও বা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতেন। আবার কখনও বা মধুরকণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রভৃতি সাধকগণের গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাজনরচিত পদাবলী গান করিতেন এবং আপন-ভাবে মাতোয়ারা হইয়া নূতন নূতন আঁখর দিতেন। কখনও বা পরমবৈষ্ণব তুলসীদাস যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপে রামসীতার লীলা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবাবেগে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইতেন"।[১৮]

কীর্তন ও নর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর যুক্ত ও সমৃদ্ধ। কীর্তনের বৈশিষ্ট্য

---

১৭ কথামৃত, ৩।১১।৩

১৮ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৩৮

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন, "ওর (কীর্তন সঙ্গীতের) মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি না।"[১৯] ছন্দোময় দেহে প্রাণের আন্দোলন ছাড়াও ভাবের আন্দোলনের যেভাবে স্ফূর্তি ঘটে তাতেই উদ্ভূত হয় কীর্তনাশ্রিত রসমাধুর্য।

কীর্তনের লক্ষ্যাভিমুখীন ছন্দোবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃশ্য অঙ্গসঞ্চালনের সমাবেশে উদ্ভূত হয় নৃত্য বা ভাবনৃত্ত। নৃত্য ও নৃত্ত দুটিরই মূলধাতু নৃতি। 'নৃতি'র অর্থ গাত্রনিক্ষেপ। নৃত্তের বিশেষ বিশেষরূপ ও গতির বিচিত্র সমাবেশ মানুষের মনকে সহজে ও বিশেষভাবে রঞ্জিত করে। "বাক্য ও অঙ্গাভরণের সুকুমারতা, গীতনৃত্য বিষয়ে উল্লাস ও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য" এই তিনের সমাবেশে কৌশিকী বৃত্তি। ভরত ও শার্ঙ্গদেবের মতে সঙ্গীতে চারিটি বৃত্তির মধ্যে কৌশিক বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। একে অবলম্বন করেই কীর্তন ও পদাবলীসমূহের সমৃদ্ধি। সংকীর্তন প্রথমাবস্থায় গীতপ্রধান। বাদ্য করে গীতকে অনুসরণ, ক্রমে নৃত্য করে বাদ্যকে। অগ্রগতির সঙ্গে সংকীর্তনে নৃত্য প্রাধান্য পায়, গীত ও বাদ্য তাকে অনুসরণ করে। গীতবাদ্য ও নৃত্যের সুষ্ঠু সমন্বয় কীর্তনের সৌন্দর্য ও ভাবব্যঞ্জনায় চরম মাধুর্য সৃষ্টি করে। কীর্তনের ভাবগরিমা, রচনালালিত্য, রসব্যাপ্তি ও সৌন্দর্যসৃষ্টির নৈপুণ্য শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যগীতনাট্যে সুপরিব্যাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সকল আয়াস-প্রয়াসের মূল-উৎস অধ্যাত্মশক্তিকুণ্ড। প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গাধর (পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ) আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি মধুর স্মৃতিখণ্ড। তিনি একদিন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বিছানায় বসে মধুরকণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর "বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাই-এর" কীর্তনটি গাইছেন। কীর্তনটি রঙ্গে-ভঙ্গে সম্পূর্ণ করতে করতে অজস্র অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ প্লাবিত হ'ল এবং তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। ঐ কীর্তন কতরকমেই না তিনি গাইলেন! সমস্ত বিকালটা কীর্তনেই কেটে গেল। জীবনে এরূপ "অদ্ভূত ব্যাপার" তিনি আর দেখেন নি।[২০]

নামকীর্তনে ভাবের সঞ্চার ও গভীরতাই কাম্য। কাব্যগুণ ও সুরমাধুর্য

---

১৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দঃ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, নবভারত পাবলিশার্স, পৃঃ ৬৮

২০ স্বামী অখণ্ডানন্দঃ স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪

সমন্বিত হয় কীর্তনে। নামমাহাত্ম্যের কীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্লান্তি ছিল না। তিনি বলতেন, "সর্বদাই তাঁর নামগুণ কীর্তন দরকার। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বরদর্শন হয়। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্তে লজ্জা ভয় ত্যাগ করতে হয়। যারা হরি নামে মত্ত হয়ে নৃত্যগীত করতে পারবে না, তাদের কোন কালে হবে না।...ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়।—দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাকো না ক্যান—যদি নাম কর্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই; তাঁর কৃপা হবেই হবে।"২১ শ্রোতাদের মনে চিরকালের মত গেঁথে দেবার জন্য তিনি যে সব উপদেশ উপহার দিতেন তা ছিল নানা রূপকল্পে সমৃদ্ধ চিত্রময়। তিনি বলেছেন, "তাঁর নাম-গুণ-কীর্তনকালে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহবৃক্ষে পাপপাখী; তাঁর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপরে পাখী সব পালায়, তেমনি সব পাপ তাঁর নামগুণ-কীর্তনে চলে যায়।" তাঁর উপদেশ ছিল তাঁর দিনচর্যার প্রতিফলন। তাঁর আচরণ ছিল নজির স্থাপনের জন্য, অপরের অনুসরণের জন্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ হরিনাম করিতেছেন। মাঝে মাঝে হাততালি দিতেছেন। সুস্বরে বলিতেছেন: হরিবোল, হরিবোল, হরিময় হরিবোল; হরি হরি হরিবোল। আবার রামনাম করিতেছে—রাম, রাম, রাম, রাম, রাম, রাম রাম, রাম, রাম। ঠাকুর এই প্রার্থনা করিতেছেন...আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন—আমি ক্রীয়াহীন।...দেখসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম।...কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না রাম।"২৩ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগরঞ্জিত করুণামাখা নামগান শুনে উপস্থিত অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না।

সর্বানন্দী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণমাতানো গানে শ্রোতার মন-ময়ুর নৃত্য করত। কিন্তু অন্তরের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ যখন তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাললয়যুক্ত হয়ে ছন্দায়িত হত, উপস্থিত সকলের শুধু প্রাণের আন্দোলনকে নয় ভাবের আন্দোলনকেও উত্তোলিত করে দিত এবং তারাও ক্রমে যেন বেসামাল হয়ে

২১ শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩৮৬

২২ কথামৃত, ৫।৪।১

২৩ কথামৃত, ২।১৬।২

পড়তেন। ভাবোদ্বেলিত পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনৌকা হেলেদুলে চলতে থাকত, এদিকে প্রেমাশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যেত তাঁর জামাকাপড়। তাঁর প্রেমানুরঞ্জনের দিব্যাভাসে সকলের প্রাণ রঞ্জিত হত।

ভাবে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণের একক নৃত্যের বা কি পারিপাট্য! বলরাম-ভবনে রথযাত্রার দিনে প্রত্যূষে শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নৃত্য করে, মধুর গান গেয়ে উপস্থিত সকলের মনমধুপকে আকৃষ্ট করেছেন। মনে পড়ে ঠাকুরের প্রিয়-গানের একটি কলি: "হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে।" পরদিন সকালবেলা! ভক্তগণ মুগ্ধবিস্ময়ে দেখেন, ঠাকুর রামনাম করে কৃষ্ণনাম করছেন। "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী! রাখালজীবন কৃষ্ণ! নন্দনন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!" আবার গৌরাঙ্গের নাম করছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ! হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।' আবার বিলম্বিত করুণস্বরে বলেন, 'আলেখ নিরঞ্জন'। তিনি প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। তাঁর কান্না দেখে, কাতর স্বর শুনে কাছে দাঁড়ানো ভক্তেরা কাঁদছেন। তিনি চোখের জল ফেলে বলছেন, "নিরঞ্জন! আয় বাপ—খারে নেরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস্।"

জগন্নাথের জন্য আর্তি করছেন—"জগন্নাথ! জগবন্ধু। দীনবন্ধু। আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ, আমায় দয়া কর!" প্রেমোন্মত্ত হয়ে গাইছেন—"উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী।" এবার তিনি নামকীর্তন করছেন—নাচছেন ও গাইছেন, "শ্রীমন্নারায়ণ। শ্রীমন্নারায়ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!" আবার নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গাইছেন, "হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই।" যেন পাঁচ বছরের বালক। ছোট ঘরটিতে বসে। প্রফুল্ল বদন। এই নামোচ্চারণের মধ্যে সুর ও কণ্ঠের জোর, হৃদয়াবেগের ঝোঁক, অনুরাগের আর্তি মধুর পরিবেশ রচনা করে।

রামনাম বা কৃষ্ণনাম ছিল সহজ উদ্দীপক। জগন্মাতার নামও সামান্যতেই মনবেলুনের হাওয়া উত্তপ্ত করে তাকে ভাবের আকাশে ঊর্ধ্বমুখী করত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার নবমী তিথি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। নিকটের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও মাষ্টার। ঘুম ভাঙতেই এঁরা দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা। আত্মানুভূত আনন্দে ভরপুর। মধুরকণ্ঠে নামগান করছেন, "জয় জয় দুর্গে! জয় জয় দুর্গে!" ঠিক

যেন একটি পাঁচ বছরের আনন্দমুখর বালক। কোমরে কাপড় নেই। জগন্মাতার নামগান করতে করতে ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছেন। আত্মারাম আনন্দসাগরে মীনবৎ ভেসে চলেছেন। এক একবার থেমে বলছেন— "সহজানন্দ! সহজানন্দ!" পরমুহূর্তেই কাতর আর্তকণ্ঠে বলছেন, "প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন।"২৪

বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক রোমাঁরোলাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের শিশু মোৎসার্ট। "শিল্পময় ভাবাবেগ এবং সৌন্দর্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বসিত একটি অনুভূতির মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত রামকৃষ্ণের মিলন ঘটে।" শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পচেতনা, সৌন্দর্যপ্রীতি, বিবিধ রসাস্বাদন চিদানন্দরসধর্মী। কিন্তু রসচর্চার আধার যে রামকৃষ্ণবিগ্রহ তার সসীম অবয়বের মধ্যে ভূমি ও ভূমার, রূপ ও অরূপের, সীমা ও অসীমের যুগপৎ অবস্থিতি অতুলনীয় মাধুর্যরস সৃষ্টি করত। এই অভূতপূর্ব সমন্বিত ভাবগুচ্ছ বিচিত্রধারায় বিচ্ছুরিত হত যখন শিল্পী একা অবতীর্ণ হতেন রঙ্গমঞ্চে। আবার দৃশ্যপটের কি অভাবনীয় পরিবর্তনই না ঘটত যখন ভক্তদর্শকবৃন্দের একাংশ বা অধিকাংশ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতে যোগ দিতেন! দৃশ্যপটের ভাবব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ ভিন্ন রস-মাধুর্যের সৃষ্টি করত যখন তিনি জনসঙ্গে থেকেও সম্পূর্ণ ভাবভোলা হয়ে নর্তনে-কীর্তনে মেতে উঠতেন।

শ্রীভগবানের ভাবোদ্দীপক কীর্তিকথনই কীর্তন। সম্যক্ তাল প্রযুক্ত, বিবিধ রাগাদিতে গীত, বিচিত্র ভাবনৃত্ত সংযুক্ত নামগুণকীর্তন যে রসমাধুর্য পরিবেশন করে সে সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে২৫ ব্যাসদেব বলেছেন,

স্বষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরশ্রুতম্।
বীণামৃদঙ্গমুরজযুক্তং ধ্বনিসমন্বিতম্॥
রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরম্।
মাধুর্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মনসো হর্ষকারণম্॥
বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমম্।
লোকানুরাগবীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকম্॥

গীত-নৃত্য-বাদ্যে ভাব প্রমত্ত হয়। ভাবহস্তী দেহমনকে তোলপাড় করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ঘর তোলপাড়। সে অবস্থায় আগে যেমন যন্ত্রণা, পরে

---

২৪ কথামৃত ২।১৭।১

২৫ শ্রীশ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্, প্রথমরাত্র, একাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২-৪

তেমনি গভীর আনন্দ।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সামান্য উদ্দীপনে ভাবাগ্নি দপ্ করে জ্বলে উঠত। অনুশীলিত কণ্ঠে মধুর সঙ্গীতের ভাবতরঙ্গ তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে খোলকরতাল বাজে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বেড়ে বেড়ে নৃত্য করছেন, কীর্তন গাইছেন, 'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগণ।' আবার গাইছেন, "সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে। নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।" ভাবাবেগে নরেন্দ্র নিজহাতে খোল ধরেন, মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গান ধরেন, "আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।" যেন স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। "চারিদিকে ঝলমল করে ভক্ত-গ্রহদল, ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।" শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধাপেধাপেউচ্চে উঠে যায়। ভগবদ্ভাবে সুরভিত পরিবেশের মধ্যে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর নরেন্দ্রকে অনেকক্ষণ ধরে বার বার আলিঙ্গন দান করেন। তিনি বলেন, "তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!" প্রত্যক্ষদর্শী-'শ্রীম' লিখেছেন, "আজ ঠাকুরের হৃদয়মধ্যস্থ প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন।"২৬ রসসম্ভোগে কখনও ভগবান হন ফুল, ভক্ত হয় ভ্রমর। আবার কখনও ভগবানই হন অলি, ভক্ত হয় ফুল। কখনও বা "আপন মাধুর্য হরে আপনার মন, আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া পদকর্তাদের গান শুনেছিলেন, কখনও তাদেরও গান শুনিয়েছিলেন। এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য নকুড় আচার্য, মনোহর সাঁই, রাজনারায়ণ, বৈষ্ণবচরণ, বনোয়ারী দাস, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, সহচরী প্রভৃতি। যাত্রাগানে কথকতায় কীর্তনে ব্যবহৃত রাগরাগিণী সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অভিজ্ঞতা শ্রীরামকৃষ্ণকে রাগসঙ্গীতে নিপুণ করে তুলেছিল। অসাধারণ একটি ঘটনা-চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা যাক। পদকর্তা, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সাধক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত শোনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় রাত্রিবাস পর্যন্ত করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের আসরে নীলকণ্ঠ গানের পর গান গাইছেন। প্রেমোন্মত্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করছেন। নীলকণ্ঠ গাইছেন, "শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়।" ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ 'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়' ধুয়ো ধরে নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে অপূর্ব নৃত্য করতে থাকেন। "সে

২৬ কথামৃত ২।১।২

অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না।" ভাব ও রূপের এরূপ সার্থক সমন্বয় এবং প্রাণবান নৃত্যছন্দ সকলকে বিমুগ্ধ করে রাখে। মর্তলোকে স্বর্গের শোভা অনুমান ক'রে ভক্তগণ আনন্দাবিষ্ট। এবার গান ধরেন, 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা দুভাই এসেছে রে।' এবং নীলকণ্ঠাদি ভক্তদের সঙ্গে প্রমত্ত নৃত্যে মেতে ওঠেন। মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ আখর বা 'কথার তান' জুড়ে দেন: 'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা তারা, তারা দুভাই এসেছে রে।' সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী নীলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্কীর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পনৈপুণ্যের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। ভাবগ্রাহী ভক্ত নীলকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পান "সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ"। শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মরসের রসিক। আসর সমাপনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে উপস্থিত সকলকে বলেন, "আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি—এদের আবার আমি গান শোনাচ্ছি।"২৭

ভজনে-কীর্তনে, নৃত্যে-নাট্যে শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রেম! তিনি বলতেন, "ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা, প্রেমের সুরা। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার।"২৮ ভগবদ্-ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে সাধারণ মানুষ মাতাল বলে ঠাউরেছে। মত্ত শুদ্ধ আত্মারাম শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের বাণীতে বলেন, "সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে। মন-মাতালে মাতাল করে, মদমাতালে মাতাল বলে।" ভাবের সুরায় শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন কাঁদেন নাচেন গান। কখনো প্রেমিক ভক্তভাব আরোপ ক'রে নিজেকে মনে করেন নর্তকী, আর ভগবানের সম্মুখে সখীভাবে দাসীভাবে নৃত্যগীত করেন। প্রকৃতপক্ষে নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য তিনি দুটি হন, একাধারে রস ও ভক্ত-রসিক, পদ্ম ও ভক্ত-অলি, ভগবান ও তাঁর ভক্ত। সেকারণে তাঁর নর্তন-কীর্তন, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সব কিছুর মধ্য দিয়ে লীলানিস্যন্দী আনন্দধারা ঝরে পড়ে অজস্রধারায়।

কীর্তনগানের মূল উৎস সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'কীর্তিগাথা' গান।২৯ নরোত্তমদাসের অভ্যুদয়ে কীর্তনগানের প্রসার হয়েছিল, আভিজাত্য লাভ

২৭ কথামৃত ৪।২২।৫

২৮ ঐ ৫।./১

২৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ: সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান, পৃঃ ৮৪

করেছিল। বাঙালীর গানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কীর্তনেও সঙ্গীত ও কাব্যের, সুর ও বাণীর মধ্যে শিবশক্তির মিলন ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মসূচীর মধ্যে দেখা যায়,

'অন্তরঙ্গসনে লীলারস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ লৈয়া হরিনাম সংকীর্তন॥"

শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের মধ্যে লীলারস কিরূপে আস্বাদন করতেন তার একটি ঘনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন অক্ষয়কুমার সেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের জন্য সমবেত হয়েছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণ আনন্দ-মুখর।

"খোল-করতাল-সহ কীর্তনের গান।
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর উঠিল তুফান॥
লীলারসাস্বাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল।
কীর্তনে আখর যোগ করেন কেবল॥
আখরের কি মাধুরী নহে কহিবার।
ক্রমশঃ আবেগ অঙ্গে প্রভাবে যাহার॥

*　　　　*

সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই প্রখরা।
সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রহে যারা॥
আবেগের পরে মহা সমাধি গভীর।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সহ ইন্দ্রিয়াদি স্থির॥
এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয়।
উপলব্ধি দরশনে বলিবার নয়॥[৩০]

'প্রেমের পরমসার মহাভাব।' মহাভাবে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলকাদি আটপ্রকারের সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হ'তে দেখে শাস্ত্রজ্ঞ সাধকগণ স্তম্ভিত হন। কিন্তু দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য মনে হয় গভীর ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দৈহিক পরিবর্তনাদি। প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন পানিহাটি উৎসবে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর সম্বন্ধে, 'তাঁহার উন্নতবপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, ভাবপ্রদীপ্ত

৩০ অক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সং, পৃঃ ৫২০

মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল… উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।"৩১ প্রত্যক্ষদর্শী গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "তাঁহার যে কি বর্ণ তাহা এত দেখেও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেকরকম বর্ণ দেখিয়াছি। তাহার পর জানিনা তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।"৩২ বিশেষ বিশেষ রসোচ্ছ্বাস স্ফুরিত হত তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৺কালীপূজার সন্ধ্যা। উপস্থিত ভক্তগণ শ্যামপুকুরের ভাড়া-বাড়ীতে রামকৃষ্ণ-কালীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলে "দিব্যভাবে ভাবিত ঠাকুর অমনিই প্রসন্নবদনা ও বরাভয়করা হইয়া এক অপূর্ব জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন।"৩৩ আবার ভক্তপ্রধান রামচন্দ্র দত্তের দৃষ্টিতে, "এবার একে তিন,—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! তাঁহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ অবতারে তিনাধারে তাঁহার বিকাশ ছিল।"৩৪ এই ত্রিধারার মহামিলন-রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বিচিত্রভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন বিভিন্ন সাধকের কাছে।

রামকৃষ্ণজীবনধারাতে নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব। ভাবের ঘোরে তিনি হাসেন, কাঁদেন, নাচেন, গান। ঘনীভূত ভাবের পরিণতি মহাভাব, সর্বশেষে প্রেম। 'প্রেমাব্ধিগম্ভীর' শ্রীরামকৃষ্ণ উর্জিতা প্রেমোচ্ছ্বাসে কীর্তন করতেন, ভাবনৃত্য করতেন, আবার কখনও বা ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হতেন!

প্রাচীন আচার্যগণের মতে "নৃত্তশিল্পী হলেন রসভাবের আধারমাত্র; তাঁর নিজের মনের মধ্যে ভাবও হবে না, রসও প্রত্যক্ষ হবে না। যদিও বা হয় তাহলে নৃত্য বা নাট্যকার্যই স্তম্ভিত হয়ে যাবে, পণ্ড হয়ে যাবে; অন্ততঃ এদের সুচারুত্বে হানি হবে। অন্যপক্ষে নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যের দর্শক সামাজিক ব্যক্তি

৩১ স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৫
৩২ রামকৃষ্ণ প্রচারে ৯।৫।১৮৯৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ
৩৩ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১৮৭
৩৪ গিরিশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ : ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২১

শিল্পীর অভিব্যঞ্জনা থেকে ভাবগুলি আহরণ করে নিজের সম্বিতে রস নামক রূপান্তরিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ও আস্বাদন করে।"৩৫ এখানে পাকাভক্তি-বিশিষ্ট মহান্ কীর্তনীয়া কিন্তু ভাবের আধার বা পাত্রমাত্র নন, অথবা রসের পরিবেশকমাত্রও নন। "কণ্ঠাবরোধ-রোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ" কীর্তনীয়া নিজে রসাস্বাদন করেন, অপরকে রসাস্বাদনে সাহায্য করেন।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্য সম্বন্ধে বলেছেন, "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ।"৩৬ রূপকার হিসাবে নৃত্যশিল্পী অন্তরের বিশেষ ভাব ও সৌন্দর্যকে বাইরের আচরণের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চলমান শিল্পরূপ সৃষ্টি করে নৃত্য। অন্তরের রস ও সৌন্দর্যের প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করে সুর ও ছন্দের ব্যঞ্জনায়। সেকারণে নর্তনে-কীর্তনে যে আনন্দবৃত্ত সৃষ্ট হয় তার রূপ ও রসের অজস্র বৈচিত্র্য গণচেতনাকে আকর্ষণ করে উদ্বুদ্ধ করে।

উচ্চকোটির ভাবশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভাবরসের বিশ্লেষণ করে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "যে ভাব যখন তাঁহার ভিতরে আসিত, তাহা তখন পুরোপুরি আসিত, তাহার ভিতর এতটুকু আর অন্যভাব থাকিত না— এতটুকু 'ভাবের ঘরে চুরি' বা লোকদেখান ভাব থাকিত না। সে ভাবে তিনি তখন একেবারে অনুপ্রাণিত, তন্ময় বা ডাইলুট হইয়া যাইতেন ;···ভিতরের প্রবল ভাবতরঙ্গ শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া শরীরটাকে যেন এককালে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিত।"৩৭ এ কারণেই গিরিশচন্দ্রের ভাষায় "একটা বুড়ো মিনসে নাচিলে যে এত ভাল দেখায়, একথা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।" শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন-নর্তনের ভাব ও রূপে নিমজ্জিত হতেন, তন্ময় হয়ে যেতেন, কখনও বা ভেসে উঠে নাট্যভাবসমৃদ্ধ কীর্তনগানে, নয়নাভিরাম লালিত্যগুণযুক্ত নৃত্যে মেতে উঠতেন, অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্যে নিজেকে প্রকটিত করতেন।

কথা ও সুরের টানাপড়েন কীর্তনগান। এই যুগলমিলনের সঙ্গে নৃত্যছন্দ

৩৫ অমিয়নাথ সান্যাল : প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতচিন্তা, বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ, পৃঃ ৪৩

৩৬ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় : ভারতের নৃত্যকলা, ১৩৭১ সাল, পৃঃ ২৭২

৩৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৯০

যুক্ত হয়ে ভাবৈশ্বর্যকে মধুরতর ক'রে প্রকাশ করে। ভাবের গাঢ়তায় কেউ বা বাহ্যসংজ্ঞা হারায়। শ্রীচৈতন্যের ভাবতরঙ্গে শান্তিপুর ডুবেছিল, নদীয়া ভেসেছিল। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত কীর্তন-নর্তনের গণ-আবেদন হিন্দু বৈষ্ণব ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মদের এমন কি খ্রীষ্টিয়ানদেরও আকর্ষণ করেছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগাষ্টের Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি তার প্রমাণ।

নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে শিল্পীর আত্মসচেতনতা, নৃত্যের রূপবন্ধ ও কল্পনা শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পুষ্টিলাভ করে। কীর্তনের সহচর[৩৮] নৃত্য কিন্তু ভাবপ্রধান। এর স্বতঃস্ফূর্ততা ও সক্রিয় প্রাণশক্তি শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশাসনের দিকে মনোযোগী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় কৃতী শিল্পীর ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী এ দুটি বিষয়ের মধ্যেও দেখা যায় সুসামঞ্জস্য। কীর্তন-নর্তনের জমজমাট আসরে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ত কীর্তনগানের ভাবের ফলিত ও চাক্ষুষরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে। কীর্তন ও নৃত্যে নিরত শ্রীরামকৃষ্ণের দেহপল্লবের হিল্লোল, ভাবের স্পন্দন, মুখদ্যুতির বিভা, ভ্রূভঙ্গিমার ঠাম ইত্যাদিতে যে নাট্যশক্তি বিচ্ছুরিত হ'ত, তা আধ্যাত্মিকভাবে বিমণ্ডিত হয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের অনাস্বাদিত রসমাধুর্য পরিবেশন করত।

অনন্ত গুণাধার শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনের আসরে যে হৃদয়-আলোড়নকারী ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করতেন তার মধ্যে বহুবিধ অসাধারণত্ব থাকলেও সাধারণত্বের লক্ষণগুলি ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কীর্তনের আসরে যে সঙ্গীতমালা গাঁথতেন তাদের ভাবানুষঙ্গ-সূত্রের মধ্যে একটি অখণ্ডতা ও স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি নানা পর্যায় হতে চয়ন করতেন ভক্তি-সুরভিত মালার ফুল। তাঁর ভাবোদ্দীপ্ত কীর্তন গান যেন উন্মুক্ত করত একটি নাটকের দ্বার, ঘটাত কত বিচিত্র দৃশ্য দৃশ্যান্তরের উপস্থাপনা, ক্রমে পৌঁছে দিত সুষ্ঠু পরিণতির দিকে। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরিশ, লাটু, হাজরা, মণি মল্লিক

৩৮ ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুতুলবাজি সহযোগে কৃষ্ণকাহিনী পদগীতির বই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অভিনীত

প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত। জ্ঞানপন্থী শশধর পণ্ডিতকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন, "যারই নিত্য, তারই লীলা। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানারূপ ধরিয়াছেন।" ভাবপ্রদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে মধুমাখা দিব্যকথার রাশ ঠেলে দেন জগন্মাতা। উপলব্ধির রসকুণ্ড হতে উৎসারিত হয় কিন্নরকণ্ঠের সংগীত। ঠাকুর প্রেমানন্দে প্রমত্ত। তাঁর গন্ধর্ববিনিন্দিতকণ্ঠে নিঃসৃত হয় সংগীতলহরী। রামপ্রসাদের 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দর্শন' - গানটি দিয়ে আরম্ভ হয়। সে-ভাবেরই রেশ প্রকটিত হয় দ্বিতীয় গানে, "মা কি এমনি মায়ের মেয়ে। যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে॥" সেই ভাবটিরই বিস্তাররূপে উপস্থাপিত করেন তৃতীয় গান, "প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।" এবারে কীর্তনের নাট্যাংশে দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে। মা-নামের সুধার মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে "আমি সুরা পান করি না, সুধা খাই জয়কালী বলে"—কীর্তনটিতে, সেইসঙ্গে গায়কের দেহাঙ্গে গানের ভাবার্থ স্ফুরিত হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে শ্যামা-সুধা খেলে চতুর্বর্গ মিলে যায় সেই সুধা মানুষ খায় না কেন? উত্তরের মুখে তিনি পরিবেশন করেন পঞ্চম গান, "শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়।" কমলাকান্তের এই গানের শেষে কিছুক্ষণের বিরতি পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা কিছুটা তরল হয়। সুরঝঙ্কার ও ভাবমূর্চ্ছনায় পরিমণ্ডল সম্পৃক্ত। শশধর পণ্ডিত বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। তাঁর আকাঙ্ক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরকণ্ঠের কীর্তন আরও শোনেন। এদিকে সঙ্গীত-নির্ঝর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লান্তিবিহীন। এবার তিনি তুলে ধরেন শ্যামাসাধন ও তার বিঘ্ন সম্বন্ধে একটি চিত্রধর্মী কীর্তন গান, "শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল" ইত্যাদি। কলুষের কুবাতাস হতে রক্ষা পাবার জন্য তিনি জগন্মাতার শরণাগতির নির্দেশ দেন দুটি কালীকীর্তনের মাধ্যমে—"এবার আমি ভাল ভেবেছি" এবং "অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।" দ্বিতীয় গানের "দুর্গানাম কিনে এনেছি" কলিটি শুনে পণ্ডিতের বুদ্ধির শান দেবার শিলা বিগলিত হয়ে অশ্রুধারায় ঝরে পড়ে। উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভাবের ঝড় ওঠে। ভাবসুধায় টলটলায়মান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গীতি-আলেখ্য নিয়ে অগ্রসর হন। 'কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।' 'দেহের মধ্যে ছজন কুজন'-রূপী ছাগল-গরু থেকে সযত্ন-রোপিত তরুটিকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য বাইরের কোন কিছুর আশ্রয় নিতে হবে না। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে নির্দেশিত হয় সাধকের ইতিকর্তব্য। তিনি

গান করেন, "আপনাতে আপনি থেকো মন যেয়ো না কো কারু ঘরে।" বিমুগ্ধ শ্রোতা পণ্ডিতের মনে গেঁথে দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ গানের সুরে বলেন, "মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড়।" পণ্ডিত বিচারমার্গী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য বিস্তার করেন একটি সুপ্রচলিত কীর্তন গানের মাধ্যমে। শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেন, "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।" গীতি-আলেখ্য শ্রোতাদের পৌঁছে দেয় কল্পলোকের অমরাবতীতে, শুদ্ধাভক্তির সরোবরের তীরে। এর জন্য ভিন্ন কোন সংলাপের প্রয়োজন হয় না। গানের সুসজ্জিত ভাবপুঞ্জ, কীর্তনীয়ার সুকণ্ঠে গীত সুর-তাল-সমন্বিত একাদশটি গান শ্রোতা ও দর্শকদের বিভিন্ন দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে শুদ্ধা ভক্তির বৃন্দাবনে পৌঁছে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গাওয়া কীর্তনে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন, অপরের গীত কীর্তনেও বিহ্বল হয়ে পড়তেন। দেহ রোমাঞ্চিত হত, প্রেমাশ্রু ঝরে পড়ে, মুখে দিব্য হাসির ছটা। বিশেষতঃ নরেন্দ্র প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ ও উচ্চকোটির সাধকের কণ্ঠে গান শুনলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রদীপ দপ্ করে জ্বলে উঠত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে নরেন্দ্রের গান শুনলে তাঁর ভিতর যিনি আছেন, "তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।" একটি মধুর ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ তানপুরা সহযোগে গাইছেন,

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী ॥
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।

গান অগ্রসর হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হন। ভাব ক্রমেই গভীরতর হয়। "গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্মরমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন।" কিছুক্ষণ পরে সমাধি হতে ব্যুত্থিত হন। ভাবের প্লাবনের পুনরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যেন ব্যর্থ হন। দেশকালের বোধ চলে যায়। ভাবের ঘোরে বলেন, "এখনও তোমাদের দেখছি,—কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ; কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নেই।" ভিন্ন আসরে উপস্থিত ভক্তেরা আবার কখনও বা বিস্মিত হয়ে শুনতেন, "মা গো, একটু দাঁড়া মা! তোর ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে দে মা।"

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্রের কমলকুটীরে কীর্তন-নর্তনে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তিন অবস্থার মধ্যে বা'চ খেলতে থাকেন। এর সঙ্গে তুলনীয় "তিনদশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল। অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর।" অর্ধবাহ্যদশায় সঙ্কীর্তন ও মধুর ভাবনৃত্ত। ভাবের গভীরে অন্তর্দশা সমাধি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ। সেবক হৃদয় তাঁকে ধরে থাকেন। ঠাকুর নিস্পন্দ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি না বইছে। মুখে দিব্য হাসি। ভগবানের চিদানন্দরূপ দর্শন করছেন। সেই অপরূপ রূপ দর্শন করে তিনি যেন মহানন্দে ভাসছেন। সুদক্ষ ফটোগ্রাফার এই দুর্লভ চিত্রটি সাদাকালোর রূপবন্ধনে ধরে রেখেছেন।৩১

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলনে যে ভাবোচ্ছ্বাসের উৎপ্লব উপস্থিত সকলকে আলোড়িত করত তার একটি নির্ভর-যোগ্য বর্ণনা। প্রত্যক্ষদর্শী অশ্বিনীকুমার দত্ত একখণ্ড মধুর স্মৃতি উপহার দিয়েছেন। অশ্বিনীকুমার লিখেছেন, ' কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেশব! কিছু হবে কি?' কেশবচন্দ্র সোৎসাহে উত্তর করেন, 'হাঁ, হবে বৈকি'!" এই ইঙ্গিতবাক্যে অশ্বিনীকুমার সন্দেহ করেন এঁরা সকলে বুঝি সুরাপানে মত্ত হবেন। তাঁর ভ্রান্তধারণা ভেঙে যায়। পরমুহূর্তে দেখেন মনোমুগ্ধকর এক দৃশ্য। তিনি লিখেছেন, "যেই কথা সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল। ঘন রোলে খোল-কর্তাল বাজিল। হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উর্ধ্বে উত্থিত হইল এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্তধারণ করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।" সেই কীর্তনানন্দের রূপ চাক্ষুষদর্শনের জন্য পাঠককে উপহার দিব একখানি মনোজ্ঞ চিত্র; সেখানে শ্রীচৈতন্য ও ঈশামশি অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎসঙ্কীর্তনের মাঝে দ্বৈতনৃত্যে প্রমত্ত। এবং সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে ধর্ম-সমন্বয়ের মূলভাবটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তৈলচিত্রখানিকে শ্রীরামকৃষ্ণ "সুরেন্দ্রের

৩১ এই গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্রটি 'কমলকুটীরে' গৃহীত হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর। গভীর ভাবসমাধিতে নিমগ্ন চৈতন্যধারীর এই চিত্র ধর্মজগতে দুর্লভ একটি দলিল।

পট" বলে চিহ্নিত করেছিলেন।৪০ এই চিত্রপটের ভাব ও শিল্পসৌন্দর্যের তিনি প্রশংসা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রও ছবিখানি দেখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Blessed is he who has conceived this idea." (সেই পুরুষ ধন্য যার হৃদয়ে এই ভাব জাগরিত হইয়াছে।) এই তৈলচিত্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নৃত্যরত মনোরম দৃশ্যটি ধারণা করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন-নর্তনের উদ্দেশ্য ও গতিবিধি বিচিত্রভাবে স্ফুরিত হত। একটি সুন্দর উদাহরণ পাঠকের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ দেবীভক্ত, ধর্ম-মোক্ষ দুয়েরই অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাভাজন। তার বাড়ীর দোতলায় কীর্তনের আসর বসেছে। সুকণ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের সংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তস্বরে বাঁধা হৃদয়বীণা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ক্রমে ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

ভাবাবেগে ওঠে ঝড় অঙ্গ-আন্দোলন।
সাগরে তরঙ্গ যবে প্রবল পবন॥
মনোহরা এক ছড়া কুসুমের হার।
সুরেন্দ্র করিয়াছিল যতনে জোগাড়॥
পিরীতে প্রভুর গলে পরাইলে পরে।
অমনি লইয়া মালা ফেলিলেন ছুঁড়ে॥

সুরেন্দ্রের প্রাণে লাগে, নয়নে অশ্রু ঝরে। বিষণ্ণ সুরেন্দ্র পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসেন। সম্মুখে উপস্থিত রাম, মনোমোহন প্রভৃতিকে দেখে বলেন, "আমার রাগ হয়েছে; রাঢ় দেশের বামুন এসব জিনিসের মর্যাদা কি জানে। অনেক টাকা খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম, সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন বুঝতে পারছি আমার অপরাধ; ভগবান পয়সার কেউ নয়; অহঙ্কারের কেউ নয়। আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন? আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই।"৪১ আকুল অশ্রুধারায় ভিজে তাঁর অহঙ্কারের ঢিপি নরম হয় অগ্রগতির পথের বাধা দূর হয়। বাহ্যতঃ অশ্রুধারায় বুক ভেসে যায়।

এদিকে কীর্তনীয়া নূতন এক গান ধরেছেন, 'হৃদয় পরশমণি"।

৪০ চিত্রটি প্রতিবাসী' 'জন্মভূমি' 'উদ্বোধন' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় ও কয়েকটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪১ কথামৃত ৫।পরি।২২

প্রেমোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচছেন। হঠাৎ পরিত্যক্ত মনোরম মালাখানি গলায় ধারণ করেন। আপাদবিলম্বিত কুসুমহারে শ্রীরামকৃষ্ণের রূপমাধুরী শতগুণে বৃদ্ধি পায়। পুঁথিকার বলেন

"নয়ন-বিনোদ দেহে কি লাবণ্য খেলে।
শান্তিময় কান্তিছটা বদনমণ্ডলে।"

নেচে নেচে গান করেন আনন্দঘন শ্রীরামকৃষ্ণ। মাঝে আখর জোগান 'ভূষণ বাকি কি আছে রে। জগৎচন্দ্র হার পরেছি!" সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর। দেখেন "প্রভুর গলায় মালা দুলিয়া দুলিয়া, হইতেছে আন্দোলিত পদ পরশিয়া।" সুরেন্দ্রের মনে ধারণা বদ্ধমূল হয়, ভগবান দর্পহারী, কিন্তু কাঙালের অকিঞ্চনের ধন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধমনে ফুট ওঠে, তিনি নটবর শ্রীগৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তন দেখবেন। জগন্মাতা তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে বাসগৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেন এক নয়নানন্দকর দৃশ্য। পঞ্চবটীর দিক হতে একটি বিরাট সংকীর্তনের দল বকুলতলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বকুলতলা হয়ে কালীবাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে অগ্রসর হয়। মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য ভাবে বিহ্বল। জনসমুদ্রের সর্বত্র আনন্দ ও উল্লাস পরিব্যাপ্ত। এই সংকীর্তন দলের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন বলরাম বসু ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলির মধ্যে একখানি ছিল সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের নগরসংকীর্তনের ছবি। দু'রঙে ছাপান মনোহর ছবিখানি। ১৮৮৫ খ্রীঃ ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চিত্রপটখানি দান করেছিলেন মাষ্টারমশাইকে। বর্তমানে এই ছবিখানি কথামৃত ভবনে (কলিকাতা-৬) সুরক্ষিত।

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলাতে মহাপ্রভু বলেছেন, "নাম সংকীর্তন হইতে সর্বানর্থনাশ। সর্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস।" ভাবচক্ষে মহা-সংকীর্তন প্রত্যক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন সে মহাসংকীর্তন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে তাঁর নিজের জীবনে। ভাগ্নে হৃদয়কে সঙ্গে করে তিনি শিহড়গ্রামে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্মৃতিচারণ করেছিলেন, "ওদেশে যখন হৃদয়ের বাড়ীতে ছিলুম তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলুম গৌরাঙ্গভক্ত, গাঁয়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম

গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাতরাত লোকের ভীড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক! নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন ভীড়।...রব উঠে গেল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল—তাকুটি, তাকুটি!...আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলুম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়।"৪২ শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ এই মনোহর সংকীর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন, "কীর্তনের আরম্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহু বাহ্যচৈতন্য হারাইতে লাগিলেন, কখনও ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যেন সর্বাঙ্গ অস্থিহীন—তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবৎ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ. স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে। অমনি হৃদয় আসিয়া পশ্চাৎ হইতে অঙ্গ ধরিয়া কর্ণে প্রণবোচ্চারণ করিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন।...সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূর্তি অবলোকন করিতেছেন।...দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শঙ্খ-কাঁসর ঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহুঙ্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্তনের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও বাহ্যজ্ঞান নাই। পুনরায় রাত্রি আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইল।"৪৩ জীবনীকার রামচন্দ্র লিখেছেন, "এমন নৃত্য কেহ কখনও দেখে নাই, এসব কীর্তন কেহ শুনে নাই।"

এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখেছেন,

> অদ্যপি শিহরে এই কীর্তনের কথা!
> দেখাশুনা যাহাদের, মনে আছে গাঁথা।
> ... ...
> স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়।
> আমরি আমরি কথা কহিবার নয়॥ (পৃঃ ২৩২)

৪২ কথামৃত ৪।২০।২

৪৩ গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৪-৬

মহাসংকীর্তনের ভাবৈশ্বর্য 'ইয়ংবেঙ্গলদের' দেখাবার জন্য ব্যগ্র হন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সার রোগের সূচনা পরিস্ফুট। অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তিনি সাবধানে থাকবেন, সমঝিয়ে চলবেন ইত্যাদি ভরসা দিয়ে নৌকায় করে পানিহাটির উৎসবে যান। সেদিন জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী। সেখানে চিড়ার মহোৎসব, আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার। শ্রীরামকৃষ্ণ সদলবলে পানিহাটি পৌছান দুইপ্রহরে। মণিসেনের বাড়ীতে নাটমন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়ে শিখাসূত্রধারী, তিলকচক্রাঙ্কিত, দীর্ঘস্থূলবপু গৌরবর্ণ এক পুরুষ; পরিধানে ধোপদুরস্ত রেলির উনপঞ্চাশের ধুতি, ট্যাঁকে একগোছা পয়সা, ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যরত। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন "ঢং দেখ"। এদিকে নকল ইঙ্গিত করে আসলের, ভেক স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যবস্তুকে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকরগণ তাঁর মন্তব্যের তাৎপর্য অবধারণ করার পূর্বেই তিনি একলাফে অবতীর্ণ হন কীর্তনদলের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতে সুস্থির গম্ভীর, তাঁর প্রসন্ন বদনে হাস্যদীপ্তি। কিঞ্চিৎ ভাবসম্বরণ হলে তিনি মধুর নৃত্যের ছন্দে দোলায়িত হন, উপস্থিত সকলের অন্তরে দোলের সৃষ্টি করেন। প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, "তিনি কখনও অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখনও সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসর এবং কখনও পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সাগরে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।...কিন্তু দিব্যভাবাবেগে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্রমধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির

অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না।"৪৪ প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি রাঘবপণ্ডিতের বাটীর দিকে অগ্রসর হন। পর্যায়ক্রমে অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ভাসমান শ্রীরামকৃষ্ণের বিগ্রহে পরিবর্তনশীল ভাববিচ্ছুরণ দেখে দর্শকগণ অনন্তভূত রসাস্বাদ লাভ করেন।

কীর্তন নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্যের সমন্বয় ঘটেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যছন্দের মধ্যে পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতা ও উদ্দামতার সঙ্গে কোমল করুণ রসের সমন্বয় খোল-করতালের তালে তালে মধুময় পরিমণ্ডল রচনা করে। প্রত্যক্ষদর্শী কথামৃতকার মন্তব্য করেছেন, "পেনেটির মহোৎসবে সমবেত সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একজন ভাবিতেছে, ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গ।"৪৫

মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দামনৃত্যের যে ভাবরূপটি পুঁথিকারের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়েছিল সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেশরি-বিক্রম-নৃত্যে শিল্পীর আকুল গাত্র পুলকিত।

শিল্পীর ছন্দায়িত দেহভঙ্গিমার মধ্যে লক্ষ্য করেন পুঁথিকার:

নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কর,
আকর্ণ পুরিত টানে যেইরূপ ধনুর্গুণে,
ধানুকী ছাড়িতে যায় শর।
বাম হস্ত প্রসারিত সরল শরের মত,
দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া,
ঠিক যেন আধাআধি গলা কিম্বা কণ্ঠাবধি,
বক্ষে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়া।
ধরে অঙ্গে মহাবল পদচাপে ধরাতল,
অবিকল হেলাহেলি করে।
কভু অঙ্গ এত ঢলে পড়ে যেন ভূমিতলে,
পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে ॥৪৬

৪৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৩-৭৫। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্ত ভাবনৃত্যটি একটি রেখাচিত্রে পরিস্ফুট করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও বইয়ে ছবিটি ছাপা হয়েছে।

৪৫ কথামৃত ৪।৬।১

৪৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ঐ, পৃঃ ৫৭১

সংকীর্তনে গণমানসের সাযুজ্য বাংলার সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণকৃত সংকীর্তনে ঐতিহ্যানুগ সাধারণধর্ম তো ছিল। সেই সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনবত্ব, স্বকীয়তা, সর্বোপরি নিখুঁত উদ্দেশ্যতানতা। সংকীর্তনপ্রিয় রামচন্দ্র দত্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন স্বীয় ধারণা; 'আমরা অনেক সংকীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি···অনেক লয়-মান-সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। ··হরিভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সেই সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেগে পুলকিত হইতেন। একথা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাঁহারা তমোগুণের আকর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিতেন না,···যাঁহারা ভাব ও প্রেমকে মস্তিষ্কের বিকার বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাঁহারাও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সংকীর্তনে নৃত্য করিয়াছেন।"৪৭ কীর্তনে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তনে প্রধান উপজীব্য ভাব। ঈষৎ অঙ্গভঙ্গী ও প্রবল বা স্পষ্ট অঙ্গভঙ্গী ভাবের গভীরতার সঙ্গে প্রকটিত হত।

অধ্যাত্মভাবসম্পৃক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সংকীর্তন ও নৃত্যের কল্যাণপ্রসূ প্রভাব ছাড়াও নান্দনিক মূল্যবিচার করেছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। লিখেছেন বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, "চিরঞ্জীব শর্মার একতারা বাদনে 'নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে' গীতশ্রবণে ভাবাবেশে গলিত কাঞ্চনবপু প্রভু ভক্তগণকে স্বর্গসুখ বিতরণমানসে বামবাহু উত্তোলন ও দক্ষিণভুজ কুঞ্চনে, বামপদ আগে ও দক্ষিণচরণ পিছে বাড়াইয়া এমন মধুর নৃত্য করেন, তাহা বর্ণনাতীত। আপনি মেতে জগৎ মাতায় এই প্রথম দেখিলাম। এ নৃত্যদর্শনে ভক্তের তো কথাই নাই, দর্শকেরাও সংক্রামিত হইয়া নৃত্য করিতেছে বোধ হল। যেন সমগ্র ভবনটিই নাচিতেছে।"৪৮

আধ্যাত্মিকভাবের সঞ্চরণ ও পরিপুষ্টিই শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য ও সংকীর্তনের মুখ্য লক্ষ্য। সেইসঙ্গে নান্দনিক গুণযুক্ত শিল্পানুভূতিও কিভাবে উদ্ভূত হ'ত সেটি বিশেষ লক্ষণীয়। মুক্ত প্রাঙ্গণে পাণিহাটিতে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা দেখেছি, মণিমল্লিকের বাড়ীর দোতালায় নৃত্যকারী শিল্পীকে দেখেছি। গৃহাভ্যন্তরে নৃত্যরত শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন,

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৬৯

৪৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬

"অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে;...আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখনও দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন আবার কখনও বা ঐরূপে পশ্চাতে হাঁটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেইদিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াসগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে। এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ-বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই;...নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখনও ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর- ব্রহ্ম-স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন।"৪৯ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্তরের দীপ জ্বলে উঠেছিল। ভাবোজ্জ্বল পরিবেশে মৌতাত সৃষ্টি হয়েছিল।

নৃত্য-নাট্যে অসাধারণ প্রতিভাধর গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনৃত্য ও তার বিপুল প্রভাব সম্বন্ধে 'নৃত্য'-প্রবন্ধে লিখেছেন, "কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য, আমরা যে রামকৃষ্ণদেবের নৃত্য দেখিয়াছি। 'নদে টলমল করে' মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন; যে ভাগ্যবান দেখিয়াছেন—আমরা দর্শন করিয়াছি, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাবপ্রবাহে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টল্‌মল্ করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা। যে সে নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি। সৌন্দর্য যে তাহার ভিত্তি।"৫০ শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্যের সমাপ্তি ভক্তিরসমার্গে সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের অপরিসীম শক্তি ও অপার সৌন্দর্য সম্পর্কে নৃত্যকলাবিদ গিরিশচন্দ্রের মূল্যায়ন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ

৪৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চমখণ্ড, পৃঃ ৩১

৫০ গিরিশগ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫০

সংযোজন। কাব্য, সুর ও নৃত্যের ত্রিবেণীসঙ্গমে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি সর্বানুস্যূত অখণ্ড পরমসত্তা বিচিত্রবৈভবে অভিব্যক্ত।

নৃত্যশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি বিষয়ে স্বকীয়তা বিশেষ লক্ষণীয়। নাতি-দীর্ঘ, ক্ষীণকায়, চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, মুখমণ্ডলে সাত্ত্বিকভাবের বিভা, বয়সটা পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু নৃত্যরত শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবল্লরীতে স্ফুরিত পৌরুষদৃপ্ত তেজ, প্রাণবন্ত শক্তির মাধুর্য দর্শকমাত্রকেই বিস্মিত করত। শ্রীরামকৃষ্ণের কীর্তন ও নৃত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, "পরমহংস মশাই-এর কীর্তনের মধ্যে...ভাবের আধিক্য হওয়ায় তাঁহার অঙ্গসঞ্চালন হইত ;...দেহ ভাবরাশির শক্তি ধারণ করিতে পারিত না বলিয়া, কখনো বা অঙ্গসঞ্চালন হইত, কখনো বা দেহ নিঃস্পন্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে একপ্রকার আভা বাহিত হইত। .. সাধারণ লোকের কীর্তন হইল 'গতি' হইতে 'ভাব' এ...পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল 'ভাব' হইতে 'গতিতে'।...সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 'নরনৃত্য' পরমহংস মশাই-এর নৃত্য হইল 'দেবনৃত্য', যাহাকে চলিত কথায় বলে 'শিবনৃত্য'।...এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন। . সকলেই যেন নির্বাক, নিঃস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চস্তরে চলিয়া যাইত।...পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপজমাট ভাবমূর্তি লইয়া, সকলের ভিতর অল্পবিস্তর সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।...কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদাই অনুভব করিতাম।...একটি বিষয় আমি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে পরমহংস মশাই-এর পদসঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন কাঁটায় কাঁটায় মাপ করিয়া তাঁহার পদসঞ্চালন হইত।"[৫১] এসকল টেকনিকের বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভাবের আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যকলা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ ও নব নব রসতরঙ্গে উৎপ্লাবিত।

সঙ্গীত নৃত্যনাট্য বিষয়ে রসজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সমকালীন

৫১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ১১৪-১৬

ব্যক্তিদের এবং তৎপরবর্তীকালের রামকৃষ্ণজীবন অনুধ্যানকারীদের বিস্মিত করেছে। অনেকবারই লক্ষ্য করা গেছে দীর্ঘকাল নৃত্যগীত করে অপরে শ্রান্তক্লান্ত বিশ্রামকাতর কিন্তু "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত" শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকতর উল্লাসে সৎপ্রসঙ্গ বা সঙ্গীতে আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমানুষিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, "ভাগবতী তনু ব্যতীত মানবদেহ এরূপ বন্যা ধারণে কদাচ সমর্থ হয় না।"

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অপর একটি অতিমানবিক শক্তিও কম বিস্মিত করে না। স্বার্থ ভোগসুখ-স্পৃহাশূন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছিল। তাছাড়াও সাধারণ ভাবভূমি উত্তরণ করে তিনি উচ্চ-উচ্চতর পর্যায় হতে রূপরসাত্মক জগৎমালঞ্চ নব নব-ভাবে উপলব্ধি করতেন। সেই-সঙ্গে তাঁর সমগ্র মন একতানে একটি বিষয়কে গ্রহণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে তদনুকূল অনুষ্ঠান করতে অভ্যস্ত ছিল। মনমুখের ঐক্যসিদ্ধির ফলেই উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কর্ম তিনি করতেন না বা করতে পারতেন না। সেইসঙ্গে 'ভাবমুখে' অবস্থিতি শিল্পী ও বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোককে একটি দুর্লভ অনুভূতিতে অনুরঞ্জিত করে রেখেছিল। লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় ভাবমুখে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে: "যাহা হইতে যতপ্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট আমিই তুমি, তাহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবন যাপন করা ও লোককল্যাণ সাধন করা।" শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ও মনের এ'সকল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে অনুমান করা যায় অধ্যাত্মশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক উপলব্ধি। তিনি বলেন: "আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠল, আবার ঐতেই লয় হয়ে গেল।"৫২ এই জগৎ-মালঞ্চে রসাস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ শিল্পী তাঁর চূড়ান্ত অনুভূতি ব্যাখ্যা করে সাদাসিধে ভাষায় বলেছেন, "যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি। আবার যখন বাইরের জগতে মন এল, তখনও দেখছি তিনি।"৫৩ তাছাড়াও তাঁর নিশ্চিত উপলব্ধির অন্তর্গত মৌল ভাব: "এক এক সময় ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি।"৫৪

৫২ কথামৃত ১।১৩।৬

৫৩ কথামৃত ৪।২০।৬

৫৪ কথামৃত ৫ পরিশিষ্ট

সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন বিশ্বাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের আন্তর উপলব্ধির ঐশ্বর্যই চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে স্ফুরিত হয়েছিল। বিশ্বাত্মার ছন্দে ছন্দায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের চলন-বলন ধরন-ধারণ অতি চারুদর্শন, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কারু ও চারু শিল্প নয়নানন্দকর, তাঁর বিবিধ বিচিত্র শিল্পচর্চা নন্দনতত্ত্বের অন্দরমহলে প্রবেশ করেও তাদের শাসনের উঁচু প্রাকার অতিক্রম করেছে। সেকারণেই সর্বানন্দী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব শিল্পচর্চার দ্বারা ধোঁকার টাটি সংসারক্ষেত্রকে 'মজার কুঠি'তে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্পনা করতে পারি, মজার কুঠি এই সংসারমঞ্চে "রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া আবার কখনও বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন।...আবার কখনও 'লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা' উদ্দামনৃত্য, যেন সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাব অনুযায়ী তাল ও লয় তরঙ্গ, তাল ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা। ঘর দ্বার পৃথ্বী বায়ু আকাশ সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেমপ্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা।"[৫৫]

এই প্রেমহিল্লোলে শোভমান ভাবোল্লাসপূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে দেখে, "ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো। গৌর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ঋষির প্রজ্ঞা ও শিল্পীর সূক্ষ্মানুভূতি মিলিত হয়েছে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, "ঠাকুর নিজে একজন কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন।" 'সর্ববিদ্যার ন্যায় যুগাবতার" শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গণজীবনের দিকে দিকে নবোন্মেষ ঘটেছিল, এখনও ঘটে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে "ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে।" ভারতবর্ষের চিরাচরিত লোকশিক্ষার বাহন কীর্তন, নর্তন নাট্য, মূর্তিগড়ন ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় এই সুকুমার শিল্পগুলি সার্থক মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবহেলিত শিল্পিগণ সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এই বাস্তব মূল্যায়নেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর সর্বশিল্পী-সমাদৃত শিল্পঘনমূর্তি। নান্দনিক তত্ত্বের মাপকাঠিতে তিনি শিশু মোৎসার্ট, কিন্তু সামগ্রিকদৃষ্টিতে তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরের আনন্দস্ফোটমাত্র।

৫৫ গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, পৃঃ ২৪৩-৪৪

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ধর্মসমন্বয় তথা সর্বধর্মসমন্বয় ভাবটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। 'সমন্বয়' শব্দটি শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীগণের মনগড়া কিছু নয়, তিনি নিজেই শব্দটি ব্যবহার করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের পিতাকে বলছেন, 'যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে, আমি কিন্তু দেখি সব এক।' ১ আবার তিনি ঈশান মুখোপাধ্যায়কে বলছেন, 'আর সেই সমন্বয়ের কথা? সব মত দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়।' ২ প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তাঁর জীবন ও বাণীতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বলতেন, 'একঘেয়ে হোস্ নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়', 'আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি সুন্দর তৈলচিত্র। ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র জনৈক সুদক্ষ শিল্পীকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের ভাবটি ছবিতে তুলে ধরেন। ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গন্তব্যস্থান এক, শুধু পথ আলাদা। তৈলচিত্রটি নন্দ বসুর বাড়ীতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, "···ওর ভিতর সবই আছে।—ইদানীং ভাব।" ৩

ধর্মসমন্বয়-ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা আকস্মিক সংযোজন নয়। সমন্বয়ের ভাবাদর্শ তাঁর জীবনে অনুস্যূত। তাঁর বলদ বরদ জীবনরসে পরিপুষ্ট। 'তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেননি, সমদর্শিতাই তাঁর ভাব।' ৪ সকল মত-পথের সঙ্গে অবিরোধে অবস্থিত তাঁর যে সর্বাবগাহী ভাবাদর্শ তা সার্বভৌম; সেই কারণে তিনি 'সমন্বয়াচার্য'। তাঁর জীবনে সকল ধর্মের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত, সেই কারণে তিনি 'সর্বধর্মস্বরূপ'। মানবকল্যাণে

---

১ কথামৃত ৪।১৫।১

২ ঐ ৫।৮।১

৩ ঐ ৩।১৮।২

৪ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।৬৮

নিযোজিত সকল ভাবের মিলনসাগর তাঁর চরিত্র, সেই কারণে তিনি 'সর্বভাব-স্বরূপ'। ৫ তাঁর জীবন ও বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেখানে মন মুখ এক। লাল-ফিতে পাড় ধুতি, বনাতের কোট বা মোলস্কিনের চাদর, মোজা ও কালো বার্নিশ করা চটিজুতা, কখনও বা কানঢাকা টুপি ও গলাবন্ধ পরিহিত 'পরমহংস' দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবান ব্যক্তিমাত্রই তাঁর পূতসঙ্গলাভ করে দেখেছেন তাঁর মধ্যে কখনও ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তাঁর প্রচারিত বাণীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাঁর জীবন। তাঁর জীবনবৃক্ষে কখনই কোন বিরোধ বাসা বাঁধতে পারেনি, সর্বভাবসমন্বিত সুসংহত তাঁর জীবন ও বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়-ভাবটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন: 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা, ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা'। ৬ অধ্যাত্মজগতের সেরা ভাবাদর্শগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' একত্রে গেঁথে শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ মালাখানি আপন গলায় পরেছেন। অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি মহামিলনের প্রতীক। তাঁর জীবন মিলনের পীঠস্থান। তাঁর বাণীতে ধ্বনিত মিলনের সুর। সেই কারণে তাঁর জীবন ও বাণী এত মাধুর্যময়, সকল দেশের সকল কালের মানুষকে এত আকৃষ্ট করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন, 'এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে, হিঁদু মুসলমান খৃষ্টান শাক্ত বৈষ্ণব এসব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।' ৭

'ধর্মসমন্বয়' কথাটির দু'টি পক্ষ। ধর্ম কাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। শাস্ত্র-শরিয়তে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা। কণাদ বলেন, 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধন, সর্বোপরি ত্রিতাপ হতে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির পথ নির্দেশ করে ধর্ম। জৈমিনি বলেন, 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত আচার পালন ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হতে নিবৃত্তিই ধর্ম, যা আচরিত হলে মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে উন্নত

৫ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'সমন্বয়াচার্য', 'সর্বধর্মস্বরূপ', আর স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'সর্বভাবস্বরূপ'।

৬ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৪২

৭ কথামৃত ৪।২৮।১

জীবনযাপনের জন্য প্রেরণা, হেয়-উপাদেয় বোধ ও কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে। আবার পতঞ্জলি বলেন, পাঁচটি যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এবং পাঁচটি নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এই দশটির পালনই ধর্ম। আবার ধর্মবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, ধর্ম জগৎসংসারকে ধারণ করে আছে। মহাভারতকার বলেন, 'ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহুঃ ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ'। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষ ধর্ম-পথ অবলম্বন করে চলে, কারণ সে জানে 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে ধর্মসম্বন্ধে যে সংজ্ঞাগুলি পাওয়া যায় তাদের সবগুলিকে উপর্যুক্ত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিতও হয়েছে। বর্তমানের Encyclopaedia Britannica একটি সর্বজন-গ্রাহ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'Religion is man's relation to that which he regards as holy' অর্থাৎ মানুষ যা পবিত্র মনে করে, তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই হচ্ছে ধর্ম। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে ধর্ম হচ্ছে গীতোক্ত 'সাত্ত্বিক সুখলাভের সর্বমানবসাধারণ উপায়'। ৮

দ্বিতীয়তঃ সমন্বয় শব্দটির অর্থ কি? তর্কের কূটজালের মধ্যে না প্রবেশ করেও বলা যেতে পারে সমন্বয় দ্বারা বোঝায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, অবিরোধ, মিলন, ধারাবাহিক কার্যকারণ সম্বন্ধ। সেই সঙ্গে বোঝা দরকার যে সমন্বয় মানে সমীকরণ, সদৃশীকরণ বা একজাতীয়করণ নয়। বৈচিত্র্যময় ধর্মসকলের বিবাদ-বিসংবাদ, বিদ্বেষ-বিভেদ দূর করে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করাই ধর্মসমন্বয়ের লক্ষ্য।

এত রকমের ধর্মমত কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন, 'কি জানো, রুচি-ভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। ···মা ছেলেদের জন্য বাড়ীতে মাছ এনেছেন। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও, করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেটরোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।' ৯ এক এক জাতীয় রুচি-বুদ্ধি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানুষ এক একটি দার্শনিক মতবাদ, এক একটি সাধনপদ্ধতি এবং সাধনানুকূল এক এক প্রকার আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করেছে। স্থান কাল ভেদে এই বৈচিত্র্য

৮ 'পরমহংসদেবের ধর্মসমন্বয়ের একদিক', উদ্বোধন, ৩৯।৬২

৯ কথামৃত ৩।৯।৫

বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য মতবাদ, অগণিত সাধনপদ্ধতি, বহুধা বিচিত্র বিধিনিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণ পুষ্টিসাধনের জন্য গড়ে উঠেছে নানা ধর্মসম্প্রদায় ; গড়ে উঠেছে মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ; সৃষ্টি হয়েছে পাদ্রী-পুরোহিত-মোল্লা সম্প্রদায় ; লেখা হয়েছে শাস্ত্র-শরিয়ৎ-স্ক্রিপচারস্। মতবাদের অনৈক্য ও আচারবিচারের বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারভোগের আকাঙ্ক্ষা ধর্মসেবীদের প্রায়ই অধর্মের পথে প্ররোচিত করেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মনেতাদের উস্কানিতে সাধারণ মানুষ ভুলে বসে, '···সমগ্র ধর্মভাব অপরোক্ষানুভূতিতেই কেন্দ্রীভূত। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেব-বিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র ; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে'।১০ ধর্মচেতনার উন্মেষের সহায়ক মাত্র যাবতীয় শাস্ত্র-শরিয়ৎ, মন্দির-গীর্জা, আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ। এদের বৈষম্য থেকে কালে উপস্থিত হয়েছে বিরোধ, অনৈক্য থেকে সন্দিগ্ধতা, সঙ্কীর্ণতা থেকে দলাদলি। শকুন উঁচুতে ওড়ে, মন পড়ে থাকে ভাগাড়ে। তেমনি স্বার্থান্বেষী ধর্মধ্বজীদের মুখে মহান্ তত্ত্বকথা আর আচরণে বিভেদ-বঞ্চনা, মারামারি, হানাহানি! স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।'১১ মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, ধর্মোন্মত্ততা প্রভৃতি পিশাচদের দূর করে হৃদয়বেদীতে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম-সমন্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ আন্তর্ধর্মসমন্বয় সাধন করেছিলেন, আবার ধর্মে ধর্মে যে বিরোধ তার নিষ্পত্তি করে সর্বধর্মসমন্বয় করেছিলেন। সেই সময় হিন্দুধর্ম অন্তর্বিরোধে শতধা-বিভক্ত। হিন্দুসমাজ ভোগাধিকারতারতম্যে দুর্বল পঙ্গু। সগুণবাদ ও নির্গুণবাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, স্বর্গবাদ ও মোক্ষবাদ, ভক্তিবাদ ও জ্ঞানবাদ, কৃপাবাদ ও পুরুষকারবাদ—সে সময়ে বিবদমান এই বাদসকলের

১০ বাণী ও রচনা, ১।২৪

১১ ঐ ১।১০

সংঘাতে সনাতন হিন্দুধর্ম জর্জরিত। সনাতন হিন্দুধর্মের ভিতরের বিরোধ ও বৈষম্যের গভীর অরণ্য ভেদ করে অগ্রসর হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন, 'যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হ'লে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, বলা যায়না।' ১২ 'কালীই ব্রহ্ম, কালীই নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী'। তিনি দেখালেন, 'দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।...উহারা পরস্পরবিরোধী নহে. কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ।' ১৩ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস।—তবে একজন বলছে 'জল', আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।" ১৪

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মবৃক্ষের তলায় বাস করতেন। তিনি বহুরূপী ঈশ্বরতত্ত্বের নানা বর্ণবৈচিত্র্য তো বটেই আবার বর্ণশূন্যতাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সামগ্রিকভাবে অনুভব করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চরম সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। আর্য ঋষিদের উচ্চারিত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি বেদমন্ত্রের সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পুনঃপ্রমাণিত হয়—শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' পুনরায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। তাঁর বৈচিত্র্যময় সাধনজীবনের দ্বারা হিন্দুধর্মের যাবতীয় অন্তর্বিরোধের অবসান হয়। হিন্দুধর্মসংহতিতে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

'...আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্মনামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতনধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোক-হিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ

১২ কথামৃত ২।২।৫

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ২।২১

১৪ কথামৃত ৪।২৪।৮

হইয়াছেন।' ১৫ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের নির্যাস উদ্‌ঘাটিত করে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন: 'বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের যে মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি মাত্র, সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—হিন্দুধর্মে এগুলির প্রত্যেকটিরই স্থান আছে।' ১৬ সনাতন হিন্দুধর্মের এই গভীর অথচ ব্যাপক ও সর্বজনীন অচ্ছেদ্য অখণ্ড রূপ তুলে ধরেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুধর্মের সমন্বিত অখণ্ড ভাবাদর্শ প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই ভাবাদর্শ ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ করে বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষের সংহতি সাধনে সাহায্য করে। এই দুরূহ কাজে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা আদিগুরু শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তুলনীয়। ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর অধিকাংশের ধর্ম—হিন্দুধর্মকে সুসংহত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিবদমান ধর্মমতগুলির মধ্যেও তিনি একটি সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেছিলেন। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মমত ও তাদের অন্তর্গত সম্প্রদায়গুলি দীর্ঘকাল ধরে ঈর্ষা, অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষের তুষানলে দগ্ধ—সহানুভূতির অভাবে একে অপরের উপর খড়্গহস্ত। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় সংগঠনের অত্যাচার-উৎপীড়নে সমাজদেহ দীর্ণ, গৌরবান্বিত মানবসভ্যতার কিরীট ধূলায় অবলুণ্ঠিত, ধর্ম বৈষম্য-ব্যাধিতে পীড়িত সমাজদেহ পঙ্গু। শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘকাল দক্ষিণেশ্বরে সাধন ভজন করে আবিষ্কার করলেন বৈষম্য-ব্যাধির নিরাকরণের তত্ত্ব। উন্মোচিত হ'ল মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্ত।

ধর্মে ধর্মে বৈষম্যব্যাধিটি প্রাচীন, ব্যাধি-নিরাময়ের প্রচেষ্টাও প্রাচীন। দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ, শাস্ত্র-শরিয়তের প্রমাণপত্র, ধর্মমতের তুলনামূলক বিচার, রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ, সামাজিক চাপ ইত্যাদি নানা উপায়ে বৈষম্যব্যাধি নিরাময়ের চেষ্টা হয়েছে। অবতারপুরুষ, পয়গম্বর, প্রেরিতপুরুষ—এঁরা নিজেদের জীবনদান করে বিরোধ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। যাবতীয়

১৫ স্বামী বিবেকানন্দ: হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ

১৬ বাণী ও রচনা, ১।১৩

১৭ K. M. Panikkar: The Determining Periods of Indian History, p. 53

প্রচেষ্টা ও তার বিফলতার কারণ বিশ্লেষণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : "আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্মমতই সত্য'—একথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউরোপে চীনে জাপানে তিব্বতে এবং সর্বশেষ আমেরিকায় একটি সর্ববাদিসম্মত ধর্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সবগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ তাহারা কোন কার্যকর প্রণালী অবলম্বন করে নাই।" ১৮ শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রেমসূত্রের তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই তত্ত্বটিকে বাস্তবে রূপদানের কার্যকর কর্মপ্রণালীও দেখিয়েছিলেন। তাত্ত্বিক অনুভূতির স্বর্ণকে তিনি বাস্তবের খাদ মিশিয়ে দৃঢ় ও উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সূত্রাকারে সমাধান দিয়েছিলেন, 'যত মত তত পথ।' ১৯ বিশ্বের বুধমণ্ডলী এই সমাধান-সূত্রকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ এর যৌক্তিকতা, যাথার্থ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। জনৈক প্রতিষ্ঠিত বাঙালী বিদ্বান্ লিখেছেন : 'ধর্মসমন্বয় কথাটা অর্বাচীন যুগের বিকৃত মস্তিষ্কের একটা খিচুড়ি। ধর্মের সমন্বয় হয় না, ধর্ম বৈচিত্র্যময়।' জনৈক ভারত-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'যত মত তত পথ'-নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন : " 'যত মত তত পথ'—সমন্বয়ের এই যে মূলমন্ত্র, কার্যক্ষেত্রে ইহা যদি সম্ভবপরও হয় তাহা হইলেও ইহার পরিণাম খুব অশুভও হইতে পারে।" অন্যত্র তিনি আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : "এই সব কথা চিন্তা করলে 'যত মত তত পথ' এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয় করা কঠিন হয়, সন্দেহ জন্মে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 'মত' কোন অংশটুকু ?" অপরপক্ষে বিশ্ব-বরেণ্য শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে সর্বমতের সমন্বয় হইয়াছে।' ২০ বিদগ্ধ সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ 'রামকৃষ্ণ-জীবনীর' ভূমিকায় লিখেছেন, 'And it is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived, but realised in himself the

১৮ বাণী ও রচনা, ৩।১৫৯

১৯ কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এটি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নয়। এ ধারণা ভুল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপদেশ', এবং লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব ও গুরুভাব (উত্তরার্ধ) দ্রষ্টব্য।

২০ উদ্বোধন, ১৩৫২, জ্যৈষ্ঠ

total unity of this river of God, open to all rivers and all streams, that I have given him my love.' উপনিষদের যৎ পশ্যসি তদ্‌বদ—যা দেখছেন তাই বলুন—এই নীতিতে গড়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি যা দেখেছেন জেনেছেন প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন তাই তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ভিত্তিক সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিশ্ববাসী, জানিয়েছেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি। ২১

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়-মতবাদ যা বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করেছে তার প্রকৃত রূপ ও তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক্। ধর্মসমন্বয়ের বহুবিধ আকার কল্পনা করা যেতে পারে; সংহতি সামঞ্জস্য সমীকরণ বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। আবার ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সমন্বয়-তত্ত্বের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের বোধসৌকর্যের জন্য প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ধর্মমতের মধ্যে রয়েছে দার্শনিক ভাগ বা ধর্মের মূলতত্ত্ব, যা ধর্মের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যকে আয়ত্ত করার উপায় নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ পৌরাণিক ভাগ যা সেই দর্শনের স্থূলরূপ প্রকটিত করে। তৃতীয়তঃ ধর্মের অধিকতর স্থূলভাগ অর্থাৎ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানাদি। চতুর্থতঃ ও প্রধান হচ্ছে তত্ত্বানুভূতি অর্থাৎ ধর্মের তত্ত্ব বোধে বোধ করা, অপরোক্ষানুভব করা। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষ সংঘর্ষ দূর করে বিভিন্ন ধর্মসেবীদের প্রেম-মৈত্রীর রাখিবন্ধনে বাঁধার জন্য উপরোক্ত এক বা একাধিক স্তরে চেষ্টা করা হয়েছে। এই সকল প্রচেষ্টার স্বরূপ-নিরূপণ এবং তার পটভূমিকাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুসৃত সর্বধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য ধৈর্যসহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(১) বিভিন্ন ধর্মের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের জীবন ও বাণীতে অপর ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্র-শরিয়তে পরধর্মসহিষ্ণুতার হিতোপদেশ পাওয়া যায়। তৎসত্ত্বেও ধর্মসম্প্রদায়গুলি বারংবার ধর্মের দোহাই দিয়ে হিংসা-দ্বেষের বিষবাষ্প ছড়ায়, মানুষকে উদ্বাস্তু করে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবন বিপর্যস্ত করে। সম্প্রদায়কর্তারা গোঁড়ামির তাড়নায় দাবী করে, 'অন্য ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ সত্য আমাদের ধর্মেই।

২১ Arnold Toynbee's Introduction to 'Sri Ramakrishna and His Unique Message'

আমাদের ধর্মই মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণ করতে সমর্থ।' আত্যন্তিক-কল্যাণ-বিধানে তৎপর অত্যুৎসাহী সুসংবদ্ধ ধর্মধ্বজীগণ ছলে বলে কৌশলে হিদেন কাফের ম্লেচ্ছদের ধর্মান্তরিত করতে থাকে, অপর সকল ধর্মমত দাবিয়ে নিজেদের ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তারের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠে। জেহাদ, ক্রুসেড, ধর্মের লড়াই ধর্মের বেদীতে অধর্মের পিশাচকে প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মধ্বজীগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক চাপের সৃষ্টি করে অপরের ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নাশ করে। এইভাবে সকল ধর্মমতকে 'একজাতীয়করণের' দ্বারা ধর্মের বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা অনেকে অনেকবার করেছে। একটি ধর্মমতের অপর সকলের উপর বিজয়লাভ তথা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এর প্রতিক্রিয়ার বিষবাষ্পে মানবসমাজ বারংবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

প্রাগুক্ত ধর্মে ধর্মে বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বন্দ্ব-কোলাহলের পটভূমিকাতে শুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: 'যত লোক দেখি, ধর্ম ধর্ম করে—এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া! এ বুদ্ধি নাই যে যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়! এক রাম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।...তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি; এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে, আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।'২২ ধর্মে ধর্মে বিরোধের মূলে কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা, ধর্মোন্মত্ততা। ধর্মের গোঁড়াদের লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই।...তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের ভুল। আমার ধর্ম ঠিক; আর ওদের ধর্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝতে পাচ্ছিনে এ ভাব ভাল'।২৩

(২) বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা করে 'বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ' নীতি অনুসারে কোন কোন ধর্মনেতা বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ সঙ্কলন করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবৃক্ষ হতে নিজের পছন্দমত ফুল তুলে

২২ কথামৃত ২।১৩।৩

২৩ ঐ ২।১৫।১

ধর্মসমন্বয়ের মালা গেঁথেছেন, মানবসমাজকে সর্ববাদিসম্মত নূতন ধর্মমত উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা স্মরণ করা যেতে পারে। উদারহৃদয় আকবর প্রধান ধর্মমতগুলির সারভাগ একত্র করে 'দীন-ই-এলাহি' নামে নূতন ধর্মমত চালু করেন। মোহম্মদ দারাসিকোহ ফারসী ভাষায় 'মজম-উ-ল-বহরৈন' (দুই সাগরের মিলন) রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ইদানীং কালে রামমোহন রায় বিচার বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন, প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের লক্ষ্য 'একেশ্বরবাদ'। তাঁর ধর্মসমীকরণ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম ও খ্রীষ্টধর্মের চয়নের সমন্বয় বলা যেতে পারে। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও চীনদেশীয় ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ২৪

এ-ধরনের সমন্বয় প্রচেষ্টা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। ২৫ এ-ধরনের নূতন ধর্ম-মতের পশ্চাতে আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি বিশ্বাসের ধারাবাহিকতা না থাকায় মানুষ তৃপ্তিলাভ করে না, নূতন ধর্মমতের প্রতি ধর্মপিপাসুগণ আকৃষ্ট হয় না। অপরপক্ষে নূতন ধর্মমতের প্রচার ও পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজন সম্প্রদায়ের এবং সম্প্রদায় গড়ে উঠলেই গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি দোষগুলি বাসা বাঁধতে থাকে। এইভাবে সমুচ্চয়ের সমন্বয় ধর্মবিরোধের স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না।

(৩) প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মমতের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে দুর্লভ রত্ন। নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান সংস্কার বিশ্বাসের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, শ শরিয়ৎ, মন্দির-মসজিদ, অবতার-পয়গম্বর, পুরোহিত-মোল্লা প্রভৃতির দ্বারা সুরক্ষিত সেই দুর্লভ রত্ন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বিভিন্ন ধর্মমতের রত্নপেটিকার মধ্যে লুকানো রত্নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারলেই বিরোধ-বিদ্বেষ হ্রাসের সম্ভাবনা। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির সযত্নে সুরক্ষিত রত্নভাণ্ডার অনুসন্ধান ক'রে তিনটি প্রধান সূত্র পাওয়া যায়; সেগুলির সাহায্যে ধর্মমতগুলির বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ধর্মগ্রন্থ ও সাধকদের জীবন ও বাণী থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সকল ধর্মের উপাস্যের মধ্যে রয়েছে একত্ব। তত্ত্ব বা সত্য একই—

২৪ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 46

২৫ Rev. Frederic A. Wilmot: Prabuddha Bharata, 1935, Jan.

বিভিন্ন তার নাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায় ; সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ ক'রে থাকেন।' ২৬ যে নামেই ডাকা যাক্ আন্তরিক হলে ভগবান শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তিনি যে অন্তর্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক বাপের অনেকগুলি ছেলে ; বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা' এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে বাবা কি তাদের উপর রাগ করবেন ? বাবা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।" ২৭

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধর্মে উপাস্যকে লাভ করার জন্য যে সকল পথ নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে অনৈক্যের নিষেধ। পথ অনেক, কিন্তু পথ-বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেটে আসে। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দলাভ হয়ে থাকে। নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক। সকল ধর্মই সত্য।' ২৮ এর সঙ্গে তুলনীয় পুষ্পদন্তের উক্তি : 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং, নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসিপয়সামর্ণব ইব'। কোন কোন উন্নাসিক ধর্মসেবী বলেন, মত পথের এই যে ঐক্য এটা আংশিক সত্য। তাঁরা বলেন, নানান পথ দিয়ে কালীবাড়ী পৌঁছান যায় বটে, কিন্তু প্রাঙ্গণের ফটক থেকে মন্দিরে যাবার একটিই পথ। যেমন ভক্তি কর্ম যোগ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হলেও সাধক একমাত্র জীবব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের দ্বারা ভববন্ধন হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত ধর্ম একটিই। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন একই ধর্ম নানান ধর্মমতের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন।'২৯ স্বামী বিবেকানন্দও বলেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট শিখেছিলেন, 'জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নহে। এগুলি এক

---

২৬ সুরেশচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ৬০৫

২৭ কথামৃত ৫।২।১

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাসার (পঞ্চম সংস্করণ), পৃঃ ৪৮০-৮১

২৯ কথামৃত ২।১৫।১

সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন ভাবমাত্র। এক সনাতন ধর্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতেছে।' ৩০ সুতরাং ধর্মে ধর্মে যে বিভেদ এটা বাহ্যিক, প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের মধ্যে রয়েছে একটি আন্তর ঐক্য।

ধর্ম একটিই। আমার ধর্ম'ই অপর সকলের ধর্মের আকারে বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে। সকল ধর্মই আমার ধর্মের রূপভেদমাত্র, এই দৃষ্টিতে স্বধর্মানুষ্ঠান করলেও ধর্মের বিরোধ শান্ত হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, 'আপন ইষ্টমূর্তির উপর বিশেষ নিষ্ঠা রাখিবে, কিন্তু অন্যান্য মূর্তিও সেই ইষ্টমূর্তির ভিন্ন রূপ ভাবিবে ও শ্রদ্ধা করিবে। দ্বেষভাব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।' ৩১

উপাস্য দেবতাসকলের বিচিত্র নাম রূপ উপাধির মধ্যে এক অদ্বিতীয় পরম-দেবতা বিরাজমান, উপাসনা-আরাধনার বিভিন্ন ধারা একই উদ্দেশ্যমুখীন, বিভিন্ন পুরাণ আখ্যায়িকা একই পরম সত্যের মহিমা খ্যাপন করছে ইত্যাদি ধারণা পরধর্মসহিষ্ণুতা, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও উদারতা শিক্ষা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একই মূল ভাবকে প্রকাশ করেছে। শ্রীশ্রীমা তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন, 'ব্রহ্ম সকল বস্তুতে আছেন। তবে কি জান? সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক. সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা কালো লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল-গুলিকেই আমরা পাখীর বোল বলি— একটিই পাখীর বোল আর অন্যগুলি পাখীর বোল নয়—এরূপ বলি না।' ৩২ এইভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সুসামঞ্জস্য ঐক্য সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেও ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্বেষ যেন দূর হতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণটা ধরা যাক্। তিনি বলতেন, "একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে; হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্ছে কলসী করে, বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে চামড়ার ডোলে করে— তারা বলছে 'পানী'। খ্রীষ্টানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—তারা বলছে

৩০ বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৮।৪০২

৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ৬২৬

৩২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৪৭

'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে, 'না এ জিনিসটা জল নয়, পানী ; কি পানী নয়, ওয়াটার ; কি ওয়াটার নয়, জল' তাহলে হাসির কথা হয়।" ৩৩ হাসির কথা হলেও দীর্ঘকালের কুসংস্কার যেতে চায় না, বিদ্বেষের বীজ সহজে মরে না। ফলে ভুলক্রমেও যদি মুসলমান হিন্দুর ঘাটে নামে বা খ্রীষ্টান হিন্দুর জলের কলসী ছুঁয়ে ফেলে ধর্মধ্বজীদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়ে যায়।

সাম্প্রদায়িক ধর্মমতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি-কৌশলে মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বেঁধে রাখে। সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনায় মানুষ নীচতা ক্রুরতা উন্মত্ততা প্রভৃতির বিষবাষ্প উদ্‌গিরণ করে। সর্বনাশা বিষবাষ্প হতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হলে শুধু বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ঐক্য অনুসন্ধান, বা উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার উপদেশ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। পরমতসহিষ্ণুতাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পরমতকে আত্মীয়বোধে দেখা, প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "Not only toleration, for so-called toleration is often blasphemy, and I do not believe in it. I believe in acceptance. Why should I tolerate? Toleration means that I think that you are wrong and I am just allowing you to live. Is it not a blasphemy to think that you and I are allowing others to live? I accept all religions that were in the past and worship with them all."৩৪

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের সোপান দিয়ে তত্ত্বানুভূতির শীর্ষে আরোহণ করে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে দেন। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নির্যাস তুলে ধরেন সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে, 'সকলেই আপনার জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয় ; কিন্তু আকাশকে কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। এক অখণ্ড আকাশ সকলের উপর বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্মের উপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজিত দেখে।' ৩৫

৩৩ কথামৃত ২।১৩।৩

৩৪ Swami Vidyatmananda (Ed.): What Religion is in the words of Swami Vivekananda, First Indian Ed. (1972), p. 24

৩৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, নং ২৭

শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা করেছিলেন তার দুটি বৈশিষ্ট্য :

প্রথমতঃ তিনি দেখেছিলেন, 'যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকে, তাদের ভিতর কোন দলাদলি থাকে না। যেমন পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না।' 'যতক্ষণ ঈশ্বর থেকে দূরে ততক্ষণ বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গেলে তিনি কি স্পষ্ট বুঝতে পারবে।' ৩৬ তিনি বুঝেছিলেন দর্শনতত্ত্বের কোলাহল, স্মৃতিশাস্ত্রের বাক্-নৈপুণ্য, পুরাণকাহিনীর মনোহারিত্ব বা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর—এসকলের মধ্যে ধর্মসমন্বয়ের সূত্র পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন ধর্মের যথার্থ সামঞ্জস্য হতে পারে একমাত্র তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে। স্বামী বিবেকানন্দ একটি উপমার সাহায্যে বলেছেন, "যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ এবং আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি বৃত্তের বিভিন্ন ব্যাসার্ধ ধরিয়া সেই কেন্দ্রেরই দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রে পৌঁছিব এবং যে-কেন্দ্রে সকল ব্যাসার্ধ মিলিত হয়, সেই কেন্দ্রে পৌঁছিয়া আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্যন্ত না সেখানে পৌঁছাই, সে পর্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে।" ৩৭ শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়সাধনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য. 'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেমন প্রত্যেক মতের কিছুমাত্র ত্যাগ না করিয়া সমান অনুরাগে নিজ জীবনে উহাদের প্রত্যেকের সাধনা করিয়া তত্তৎমত-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়া ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সে ভাবে পূর্বের কোন আচার্যই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন নাই।' ৩৮ শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধনপথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছে সাধ্যবস্তুর ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন ; সেই সঙ্গে বিভিন্ন সাধনপথ অনুসরণ করে তাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন। তিনিই বিভিন্ন ধর্মমতের যথার্থ মর্যাদা দান করেছিলেন। এইভাবে 'যোগবুদ্ধি ও সাধারণবুদ্ধি' উভয়-সহায়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র।'৩৯ তিনি যুক্তি বিচার ও তত্ত্বানুভূতির মিলিত আলোকে সর্বধর্মসমন্বয়ের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

৩৬ শশীভূষণ ঘোষ : শ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩৬১

৩৭ বাণী ও রচনা, ৩।১৬০

৩৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ২০০-০১

৩৯ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৪০৪

আওতায় বাস করছে এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে দ্বেষ-বিদ্বেষে মেতে উঠছে তাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়-সূত্র কি ভাবে প্রযোজ্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্মানুষ্ঠান করা। স্বধর্মানুষ্ঠান করেও কি ভাবে অপর সকল ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করা সম্ভব সে সম্বন্ধে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, 'ও কি হীন বুদ্ধি তোর? জানবি যে তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বেষবুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি। দেখ না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর, ভাসুর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন জানবি। আর তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ হতেই তাঁর অন্য সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা—এইটে জানবি। ঐরূপ জেনে দ্বেষবুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি।'[৪০] ইষ্টনিষ্ঠা তথা স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে বসবাস করতে হবে। সহৃদয় আচরণের মধ্য দিয়ে অপর ধর্মের মানুষকে আত্মীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে বৃহৎ এক ধর্মপরিবার—এই বোধে সক্রিয় সহাবস্থান ও সহৃদয় লেনদেনের মধ্য দিয়ে ধর্মসমন্বয়ের চর্যা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক হয়ে যাবে—বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। 'ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান' এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে—যতদূর পার। আর ভালবাসবে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শান্তি আনন্দ ভোগ করবে। 'জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না'।"[৪১] অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রীতি সহানুভূতিই ধর্মসমন্বয়-চর্যার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে বিভিন্ন ধর্মগুলি একটি

৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ, পৃঃ ৪৪

৪১ কথামৃত ১।১২।৯

অপরটির সম্পূরক, একটি অপরটির বিরোধী নয়। এই ভাবটি ধরে 'প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হইবে।' ৪২ স্বধর্মনিষ্ঠার গভীরতা ঐকান্তিকতার সঙ্গে পরধর্মসেবীদের প্রতি প্রীতি ভালবাসার সার্থক সমবায়ের উপর ধর্মসমন্বয়ের সাফল্য নির্ভর করছে।

ধর্মের প্রাণ প্রত্যক্ষানুভূতি এবং বোধে বোধ অর্থাৎ তত্ত্বানুভূতিই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সমন্বয়সৌধের ছাদ—নানা মতের সাধনা সেই সৌধের সোপান। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য তথা ঐক্য সম্ভব একমাত্র তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে। কোন কোন তাত্ত্বিক জটিল প্রশ্ন তুলেছেন,—যেহেতু লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিদ্ধপুরুষের তত্ত্বানুভূতির আকার এক হতে পারে না, সুতরাং ঐক্য সম্ভব নয়। অদ্বৈতপন্থী জ্ঞানমার্গী বলেন, প্রত্যেক ধর্মসাধনার চূড়ান্ত পরিণতি জীবব্রহ্মৈক্য-বোধরূপ অদ্বৈতানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা,...জানবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।' এই মতে ঐক্য সম্ভব একমাত্র অদ্বৈতানুভূতির পর্যায়ে। ৪৩ কিন্তু ধর্মসাধনার শেষ ধাপ অদ্বৈতানুভূতি, এই সিদ্ধান্ত অনেক ধর্মাবলম্বী মানেন না। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়-পরিকল্পনায় কি এঁদের স্থান নেই? তাছাড়া এঁদের বাদ দিলে সর্বধর্মসমন্বয়-পরিকল্পনাই যে ব্যর্থ হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বভাব-অবগাহী উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের বোধ হয় অভিপ্রেত নয়। তাঁর

৪২ বাণী ও রচনা, ১৷৩৪

৪৩ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ: সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রকৃত পথ কি? উদ্বোধন, ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা:

"নানা পথ থাকিলেও একটি সাধারন পথও আছে। অন্য সকল পথ পরিণামে একই পথে মিলিত হয়। সেইটিই সাধারণ পথ। ইহাই সেই অদ্বৈত পথ।...এই অদ্বৈত পথে আরূঢ় হইবার জন্য বহু পথ আছে। সেই সমস্ত পথের সঙ্গে অন্য উপায়গুলি মিশিয়া যে বহুপথের কল্পনা করা যায়, সেই সকল উপ-পথকে লক্ষ্য করিয়াই 'যত মত তত পথ' বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই উপপথের পর যে পথ তাহা একই পথ, তাহা সেই জীবব্রহ্মৈক্যবোধরূপ একটি মাত্র পথ, তাহাই অদ্বৈতবাদীর পথ।"

জীবনীতে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন সাধনপথে 'ভাবসাধনার পরাকাষ্ঠায় উপনীত' হবার পর শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে 'সর্বভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে' প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমন্বয়সূত্র দিয়েছিলেন, 'যত মত তত পথ'। অপথ, কুপথ, বিপথ পরিত্যাগ করে মানুষকে তার সহজ স্বাভাবিক পথ বেছে নিতে হবে। যদি আন্তরিক হয়, প্রত্যেক পথই পৌঁছে দেবে তত্ত্বানুভূতির রাজ্যে, তা সেই অনুভূতির আকার যাই হোক না কেন। ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরকৃপালাভ এই ভাবটিকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন ধর্মের একই প্রাণ-মন্দাকিনী বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত। সাধারণভাবে এই ঈশ্বরানুভূতি তথা তত্ত্বানুভূতির পর্যায়েই সকল ধর্মের সমন্বয় এবং বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান সম্ভব। ধর্মসেবীমাত্রই ভগবানের ভক্ত। সকল ভক্তের এক জাত। ভক্তে ভক্তে বিরোধ অস্বাভাবিক, অবাস্তব। এই দৃষ্টিতে সামাজিক ভাব-বিরোধের অবসান করা দরকার। উদারদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'সব মতই পথ। মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়।' 'তাই প্রথমে একটা ধর্ম আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরলাভ হলে সেই ব্যক্তি সব ধর্মপথ দিয়ে আনাগোনা করতে পারে; যখন হিন্দুদের ভিতর থাকে, তখন সকলে মনে করে হিন্দু; যখন মুসলমানের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে মনে করে মুসলমান; আবার যখন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মেশে, তখন সকলে ভাবে ইনি বুঝি খ্রীষ্টান।' ৪৪ অপরপক্ষে মতলববাজ সম্প্রদায়কর্তাদের লক্ষ্য করে বলতেন, 'শ্যালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মরছে—মর শ্যালারা—ডুব দেয় না।' ৪৫

অবশ্য এটা অনস্বীকার্য যে, 'অভেদজ্ঞান পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না' এবং অদ্বৈততত্ত্বই সকল ধর্মসাধনের পরাকাষ্ঠা। ফলত, চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন অদ্বৈতানুভূতিতে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব সর্বধর্মমত গ্রাহ্য নয় সুতরাং অদ্বৈতানুভূতির স্তরে সকল ধর্মের মিলন সর্ববাদিসম্মত কার্যকর আদর্শ হতে পারে না। ঈশ্বরলাভ তথা তত্ত্বানুভূতির পর্যায়ে (তত্ত্বানুভূতির আকার যাই হোক) সকল ধর্মের মিলন সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বধর্মসমন্বয় একটি বাস্তব সর্বজন-সমাদৃত কার্যকর আদর্শ। এরূপ সমন্বয় Pan Islam-এর মত 'একধর্মীকরণ' মতবাদ নয়, নববিধানের মত ত্যাজ্যগ্রাহ্য বিশ্লেষণাত্মক বিচারের দ্বারা সমীকরণ নয়, বা দার্শনিক হেগেলের dialectic synthesis নয়, সর্বশাস্ত্রস্বীকৃত

৪৪ কথামৃত ২।১৫।১ ও ৫। পরিশিষ্ট পৃঃ ১২

৪৫ ঐ ৪।২০।৫

প্রত্যক্ষ সাধনভজনের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমন্বয়। এই ধর্মবিরোধ নিষ্পত্তির সূত্র একটি ভাবগত তত্ত্বমাত্র নয়, বাস্তবে সুপরীক্ষিত একটি কার্যকর পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-আদর্শের বৈশিষ্ট্য ;—কাউকেই নিজের ধর্ম ছাড়তে হবে না, অপর প্রচলিত বা অভিনব কোন ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে না। যে যেখানে আছে সে সেখানে থেকেই অগ্রসর হবে নূতন লক্ষ্যের দিকে। অভিব্যক্তিভিত্তিক এই সমন্বয়ের আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। ইতিবাচক এই আদর্শটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে, 'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি।…হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গাতেই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।'[৪৬] সার্বভৌমিক এই সর্বধর্মসমন্বয়ের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মসেবীকে জো সো করে ধর্মের লক্ষ্য ঈশ্বরানুভূতির দিকে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। অপর সকল ধর্মের আচার্য ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে ধর্মমতের মিলনকেন্দ্র ঈশ্বরানুভূতির দিকে ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে অপর ধর্মাবলম্বীদের আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। সাধকের বহির্জীবন ও আন্তরজীবনের সমন্বয় কি ভাবে করতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, "রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন গরু সব মাঠে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। আবার যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, তখন আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে 'আপনাতে আপনি থাকে'।"[৪৭] একই মানব-সমাজের অঙ্গ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের ধর্মমত ভিন্ন হলেও তাদের মিলনে সত্যসত্যই কোন বাধা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপলব্ধ সার্বভৌমিক সর্বধর্মসমন্বয়-সিদ্ধান্তটি স্বামী বিবেকানন্দ জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা পুনঃ প্রমাণিত করেছেন। জগতে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মসাধনার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। ভাবপ্রবণ, বিচারশীল, কর্মপটু ও ধ্যাননিষ্ঠ,—এই চার প্রকার মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। জগতের

৪৬ কথামৃত ৪।২২।৪

৪৭ ঐ ১।১২।৯

বিভিন্ন ধর্মমত চারটি যোগের এক বা ততোধিক যোগ (অর্থাৎ উপায়) ধরে মিলিত হয়েছে ঐক্যবিন্দু ঈশ্বরদর্শন তথা তত্ত্বানুভূতিতে। ধর্মবিজ্ঞানের আদর্শ ও উপায় নির্দেশ করে স্বামীজী লিখেছেন, "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this Divine within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free." ৪৮ ধর্মবিজ্ঞানের নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠন করাই বর্তমান যুগের আদর্শ। যেমন সুষম খাদ্য (balanced diet) স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সাহায্য করে তেমনি মানব-প্রকৃতির মূল চারটি উপাদানের সুষম বিকাশের দ্বারা মানুষ দৃঢ় পদক্ষেপে ধর্মজীবনের মূল লক্ষ্য—তত্ত্বানুভূতির দিকে অগ্রসর হতে পারে ; সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্কীর্ণগণ্ডি সহজে অতিক্রম করে ধর্মসমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু-অভিমুখীন জীবন গড়ে তুলতে পারে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বানুভূতি-কেন্দ্রিক ধর্মই বর্তমানের চাহিদা। বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'We want···a religion which is the basis of all special religions, a religion which can include them all, and one which harmonizes with science, philosophy and metaphysics.'৪৯ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীপাঠক মাত্রই জানেন যে স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধর্মসমন্বয় বা স্বামী অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক ধর্মের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বগ্রাহী উদার ধর্মমতের দ্বারা শুধুমাত্র যে বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়সকলের বিরোধ নিঃশেষে ভঞ্জন হতে পারে তাই নয়, এই সমন্বয়-নীতির ভিত্তিতে জগতের মানুষের জীবন-সমস্যার সামগ্রিকভাবে সমাধান সম্ভব, পৃথিবীতে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মিলন ও শান্তি স্থাপন সম্ভব। সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের কোলাহলে বিরক্ত হয়ে মানুষ কখনও কখনও 'ঢাকী শুদ্ধ ঢাক' বিসর্জন দেবার চেষ্টা করেছে। বৃহস্পতি-চার্বাক-মার্কসের

৪৮ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. I (1963), p. 257

৪৯ Prabuddha Bharata, 1900, Vol. V, p. 102

চেলা-চামুণ্ডারা ধর্ম 'শোষিতের দীর্ঘশ্বাস', 'আম জনতার আফিঙ্' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে ধর্মবর্জনের জন্য ঢেঁড়া দিয়েছে। ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই জানেন মানুষের মনের চিরন্তন গভীর বুভুক্ষা মিটাতে একমাত্র সক্ষম ধর্ম, মানুষের লুপ্তপ্রায় গুপ্ত মহত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রবুদ্ধ করতে সমর্থ একমাত্র ধর্ম, বিশ্ব-শান্তির মূল নিদান একমাত্র ধর্ম। এষ ধর্মঃ সনাতনঃ। এই ধর্মকে অবলম্বন করে, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত সর্বধর্মসমন্বয়ের মৌলিক আদর্শ অনুসরণ করেই ব্যক্তি-সত্তার জাগৃতি, সমষ্টি-মানুষের সমৃদ্ধি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সর্বভাবস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক অবদান সর্বধর্মসমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে ইনি আমাদের মতের লোক।'[৫০] বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজে এই ভাবাদর্শের বিশাল ভূমিকা। প্রশ্ন করা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কি? তিনি কি যথার্থই সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন? তাঁকে এই সকল জটিল প্রশ্ন করলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, 'অত সব জানিনি বাপু। আমি খাই দাই থাকি মায়ের নাম করি।' অনুরূপ প্রশ্ন করা হয়েছিল শ্রীমাকে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, তিনি যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানেরা, মুসলমানেরা, বৈষ্ণবেরা যে যেভাবে তাঁকে ভজনা করে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা করে নানা লীলা আস্বাদন করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকৃত না।…সর্বধর্মসমন্বয় ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্যবারে একটা ভাবকেই বড় কবায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।'[৫১] জগজ্জননীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের সাধনা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিত হয়েছিল; সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সমন্বয়-ভাবাদর্শ এত সৌন্দর্য মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজমুখেও বলেছেন, '…তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মা-ও তখন তাঁহার ঐ ভাব

৫০ কথামৃত ৪।২০।৩

৫১ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৫৮৫

দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। এইরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।'৫২

এটা রামকৃষ্ণের যুগ, সত্য যুগ। যুগকর্তার ইঙ্গিতে স্বামী বিবেকানন্দ সকল ধর্মমতের সকল পথের মানুষকে সমবেত করে নিজে পুরোগামী হয়ে চলেছেন। বিভিন্ন জন বহন করছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পতাকা। প্রত্যেকটি পতাকার উপর লেখা রয়েছে, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত-বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'৫৩ আর শান্তগতি জনসমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে এক অশ্রুতপূর্ব মহামিলনের ঐকতান। স্বরসমন্বয়ের মধ্যে চেনা যায় প্রত্যেকটি সুরের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি সুরের মূলগত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে স্বরসমন্বয় করেছেন ওস্তাদ সুরশিল্পী। ফলে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ঐক্য অপূর্ব এক সুরলোক সৃষ্টি করেছে। প্রগতিশীল নির্দলীয় এই দলটি সার্বভৌম সর্বধর্মসমন্বয়ভিত্তিক মানবসমাজকে স্বাগত জানাচ্ছে।

৫২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ২৮০-৮১

৫৩ চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বাণী

'সুরেন্দ্রের পট'

শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়ীতে ঈশ্বরীয় ছবি দেখতে গিয়েছিলেন। দোতলায় হলঘরের চারিদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি। ঈশ্বরীয় মূর্তিসকল দেখে তাঁর আনন্দ আর ধরে না। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে একটি নূতন ধরনের তৈলচিত্রের উপর। তিনি সহাস্যে ব'লে উঠেন, "ও যে সুরেন্দ্রের পট!"

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রসন্নের পিতা। তিনি মৃদু হেসে বলেন, 'আপনিও ওর ভিতর আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—"ওই একরকম, ওর ভিতর সবই আছে—ইদানীং ভাব।"

'সুরেন্দ্রের পট' আধুনিক, ওর ভিতর "সবই আছে"—সকল প্রকার ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। পটখানি সত্যসত্যই অসামান্য; ভাব-গাম্ভীর্যে ও ভাবের প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। পটীয়ান্ পটুয়ার শিল্পনৈপুণ্যে বিধৃত হয়েছে প্রধান সকল ধর্মভাবের সমাবেশ। চিত্রপটে ধর্মে ধর্মে বিরোধের নিষ্পত্তি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অনৈক্য ও দ্বন্দ্বের অবসান সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত, নিবিড় ঐক্যের আকর্ষণে অতীতের অশ্রুলবণাক্ত বিচ্ছেদের বাঁধগুলি বিধ্বস্ত। শান্তি-সৌন্দর্য-সংবলিত চিত্রপটে প্রীতি শান্তি সদ্ভাব অপর্যাপ্তভাবে উচ্ছল। এখানে ভাবসমন্বয়ের রহস্যসূত্র অপাবৃত করাই পটুয়ার প্রধান লক্ষ্য। সমন্বয়-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আচার্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সমন্বয়সূত্র অনুসন্ধানে নিরত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র —একজন গুরু, অপরজন শিষ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ। উত্তম গুরু শ্রদ্ধাবান শিষ্যের সামনে তুলে ধরেছেন সমন্বয়ের রাখীবন্ধনে সুসংবদ্ধ ভাবরাজ্যের এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। পটের ভিতর পট, যেন পটনাট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র দৃক্, তাঁদের দৃশ্য মর্ত্যলোকে আবির্ভূত এক স্বর্গলোকের দৃশ্যকাব্য। চমৎকার চিত্র-পরিকল্পনা, গভীরভাবদ্যোতক তার ব্যঞ্জনা। ধর্মজগতের অতীত বিষাদের ইতিবৃত্ত ও বর্তমানের বিভ্রান্তিকর সমস্যার আঙ্গিকে মহান্ ভবিষ্যতের আভাস রঙবিচিত্রার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শিল্পীর সুপরিকল্পনা, গভীর দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ রেখা ও রঙ-ব্যবহার পটটিকে স্বাতন্ত্র্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে

তুলেছে। আবার পটনাট্যের প্রধান দুই নায়ক, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের প্রশংসার শীলমোহরযুক্ত এই চিত্রপট ভাববস্তুর প্রামাণিকতায় অবিসংবাদিত-ভাবে ঐতিহাসিক-গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রপটের ভাববস্তুর যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের কয়েকটি অংশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। মুসলমান রাজত্বকালে কয়েকশত বছরের শাসন ও শোষণে ভারতবর্ষ পর্যুদস্ত, সে সময়ে সোনার ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ। ভারতবাসী ইংরেজের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বলদর্পী বিদেশী রাজদণ্ডের আশ্রয়পুষ্ট খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপক-ভাবে ভারতবাসীর ধর্মান্তরকরণে নিযুক্ত হয়। ১

এদিকে বিবিধ ঐতিহাসিক উপাদানের সংঘাতে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয় নূতন প্রাণশক্তির জাগরণ। দেশী-বিদেশী পণ্ডিতগণের চর্চা ও চর্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ধনরত্ন পুনরাবিষ্কৃত হয়। অতীতের গৌরব দেশবাসীকে সচেতন ও মহান্ ভবিষ্যতের রূপায়ণে প্রবুদ্ধ করে। নবজাগৃতির শিহরণ ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপুল আলোড়ন তোলে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। চৌদ্দ বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। কেশবচন্দ্র সেনের যোগদানে আন্দোলন জনপ্রিয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়, কিন্তু ভাবগত অনৈক্যে দ্বিধা-বিভক্ত হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়; আদি সমাজের পুরোধায় থাকেন দেবেন্দ্রনাথ। কয়েক বছর পরে সমাজের বিধিভঙ্গের অভিযোগে নেতা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সৃষ্টি করেন 'নববিধান'।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ মুসলিম ও খ্রীষ্টধর্মের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহমদ-

---

১ ১৮৬৬ খ্রীঃ ৫ই মে তারিখে কেশবচন্দ্রের ভাষণ হ'তে জানা যায় ১,৫৪,০০০ জন ভারতবাসী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তার জন্য ৫১৯ জন বিদেশী পাদ্রী নিযুক্ত ও তাদের সেবাধর্মের জন্য বার্ষিক ব্যয় ২,৫০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৭৬-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদের মধ্যে অন্নের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম বিতরণ করা হয়। ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটে। ক্রমে ধর্মান্তরের প্লাবন উত্তর-ভারতকেও গ্রাস করে।

সংগঠিত সদর অঞ্জুমান-ই-আহ্‌মদীয় মুসলিম ধর্ম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে বদ্ধপরিকর হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে গড়ে উঠে থিয়োসফি আন্দোলন, চার বছর পরে মূল কার্যালয় ভারতবর্ষে স্থানান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম ফলশ্রুতি, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীর সচেতনতা। ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ধর্মভাবের প্লাবন নূতন যুগের সূচনা করে এবং ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেন নবজাগৃতির প্রাণ-উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মিলন ঘটে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সান্নিধ্যে অভিভূত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিনলিপিকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "ইংরাজী-পড়া কেশবচন্দ্র সেন-আদি পণ্ডিতেরাও ঠাকুরকে দেখে অবাক্ হয়েছেন। কি আশ্চর্য! নিরক্ষর ব্যক্তি এসব কথা কিরূপে বলছেন? এ যে ঠিক যীশুখ্রীষ্টের মত কথা! সেই গ্রাম্য-ভাষা! সেই গল্প ক'রে বুঝান—যাতে পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। যীশু Father Father করতে করতে পাগল হয়েছিলেন, ইনি মা মা করে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নহে—ঈশ্বরপ্রেম 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' ইনিও যীশুর মত ত্যাগী, তাঁহারই মত ইঁহারও জ্বলন্ত বিশ্বাস, পাহাড়ের মত অটল বিশ্বাস। তাই কথাগুলির এত জোর!... কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরো ভাবেন, এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন করে হ'ল! কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই, সব ধর্মাবলম্বীদেব আদর করেন—কাহারও সহিত ঝগড়া নাই।" ২

প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি রবিবারে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বার্ষিক-উৎসবে ঘোষণা করেন তাঁর মানসপুত্র 'নববিধানে'র জন্ম। তিনি আবেগময়ী ভাষায় বলেন, "...অদ্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন?' বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, 'পৃথিবী, শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল। বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর... এক সর্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ-বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে।...ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মোহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে

২ তত্ত্বমঞ্জরী, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৪৯-৫০

লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটি ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া, তাঁহাদের কত আহ্লাদ!...পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতর এক করিয়া লইয়াছেন। শিশু জন্মিবামাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম এক হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল।...নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন।...নূতন বিধান, নূতন শিশু সকলের ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন।' " ৩

পরের বছর ২২শে জানুয়ারি কেশবচন্দ্র কলিকাতা টাউন হলে একটি ভাষণে বলেন, "নববিধানের এই রূপ! যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রবিধান ও সকল আপ্তপুরুষের সমন্বয় নববিধান। এটা বিচ্ছিন্ন একটি মতবাদ নয়। নববিধান একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যা সকল ধর্মকে গ্রথিত করেছে, প্রকাশ করেছে ও সমন্বিত করেছে।...নববিধান মূল্যবান কণ্ঠহার, যাতে যুগযুগান্তরের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মণিমুক্তা নিবদ্ধ।...এভাবে আমরা নূতন মানুষ সৃষ্টি ক'রব, সেই মানুষের ইচ্ছাশক্তি হবে ভগবান যীশু, মস্তিষ্ক সক্রেটিস, হৃদয় শ্রীচৈতন্য, আত্মা হিন্দু ঋষি এবং দক্ষিণ হস্ত জনসেবী হাওয়ার্ড।" ৪ নববিধানের ভাবাদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য নূতন পতাকা ও প্রতীক তৈরী হয়, নব-সংহিতা রচিত হয়; 'নিশান-বরণ ও আরাত্রিক', 'হোমানুষ্ঠান', 'ঈশ্বরের ব্যাপ্তিজলে জলাভিষেক অনুষ্ঠান', 'দোষস্বীকার-বিধির প্রবর্তন' প্রভৃতি সংযুক্ত হয়; নূতন ভাব জনপ্রিয় করার জন্য নগরসঙ্কীর্তন প্রবর্তিত হয়, কয়েকবার 'নববৃন্দাবন' নাটক মঞ্চস্থ হয়, 'নবনৃত্য' অনুষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহগামিগণ বিশ্বাস করতেন যে, কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশে নববিধানের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে নববিধান যে-রূপ ধারণ করে তা বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস-বেত্তা লিখেছেন, "Thus the thing is coming to this that the New Dispensation is tending to become a stereotyped creed like Mahomedanism, with the New Samhita

৩ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়: 'আচার্য কেশবচন্দ্র', শতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩৬-৩৮

৪ Keshub Chunder Sen: Lectures in India, Navavidhan Publication Committee, পৃঃ ৪৫২-৫৩

as an infallible book like the Koran, and with Mr. Sen as the central figure and Minister, like Mahomed the Prophet." ৫ সাধারণ মানুষের কাছে নববিধানের যে ভাবমূর্তি প্রকটিত হয় তার চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার :

কেমন নূতন ধর্ম কেশবের গড়া।
ঠিক যেন বিবিধ কুসুমে বাঁধা তোড়া॥
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায়।
সকল ধর্মের কিছু কিছু আছে তায়॥
মহাভাব গৌরাঙ্গের প্রেমসমন্বিত।
কৃষ্ণের প্রকট জ্ঞান গীতায় কথিত॥
সহিষ্ণুতা ক্রাইষ্টের নির্ভরতা বল।
অপার করুণারাজি ভাব সমুজ্জ্বল॥
বাল্যভাব শ্রীপ্রভুর পরা যত্নে রাখা।
সন্তানের সমতুল্য মা বলিয়া ডাকা॥
অন্য অন্য স্থানে যাহা বুঝিল সুন্দর।
লইল তাহার কিছু করিয়া আদর॥
আগাগোড়া বাদ দিয়া কণাংশ লইয়া।
নববিধানের দেহ দিল সাজাইয়া॥ (পৃঃ ৩৩৮)

নববিধান বৈচিত্র্যের সমাবেশে আপাতমনোহর হলেও ধর্মানুরাগী মাত্রই অনুভব করেন "নববিধানের গাছে ফল নাহি ফলে॥ ফল-ফলা অসম্ভব স্পষ্ট দেখা যায়। তোড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তায়॥"

অনেকেই মনে করেন কেশবচন্দ্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর প্রভাবের আংশিক প্রতিফলন নববিধানের রূপ ধারণ করেছে। 'বেদব্যাস' (মাঘ ১২৯৪) লেখেন, "পরমহংসদেবের আশ্রয় পাইয়া কেশববাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্তনের ফলে 'নববিধান' প্রসব হয়।" 'তত্ত্বমঞ্জরী' (দ্বিতীয় ভাগ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯) লেখেন, "কেশববাবু যে পরমহংস-দেবের ভাব লইয়া নিজের অবস্থা ও বর্তমান ইয়ুরোপীয় ভাবে রঞ্জিত করিয়া

৫ Shibnath Sastri: History of the Brahmo Samaj, Vol. II, P. 106

নববিধানের নাম দিয়াছিলেন তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যাহা তিনি নববিধানে নূতন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছুই নূতন নহে। যাহাকে নূতন বলিয়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতাবস্থা মাত্র।"
এবিষয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থের সামগ্রিক অভিমত বিশেষ লক্ষণীয়। "দেখা যায়, একপক্ষে তিনি (কেশবচন্দ্র) ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন···যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।···অপরপক্ষে তিনি ঠাকুরের 'সর্ব ধর্ম সত্য যত মত তত পথ' রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ ত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৬ (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৩৭)

আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য চিত্রপটখানির উদ্যোক্তার ধারণাও ছিল অনুরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবের প্রচারের ফলে দক্ষিণেশ্বরে লোকের ভিড় হ'তে থাকে। সেই সঙ্গে আসে অনুরাগী ভক্তগণ। ক্রমে ক্রমে আসেন রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, রাখালচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মিত্র যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্যতম রসদ্দার ব'লে চিহ্নিত করেছিলেন ও স্নেহভরে 'সুরেন্দ্র' বা 'সুরেন্দর' ব'লে ডাকতেন—তিনি ছিলেন সরল বিশ্বাসী ও বিশেষ উৎসাহী। তাঁর আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তা সর্বসমক্ষে প্রচার করতে দেরি বা দ্বিধা করতেন না। অন্যান্যদের মত রাম, সুরেশ ও মনোমোহন শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের জীবন ও

---

৬ বিদেশী দুজন বিখ্যাত রামকৃষ্ণ-জীবনী-লেখকের মতও অনুধাবনযোগ্য। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন, "The essential ideas were already formed when he met Ramakrishna for the first time (p. 169)." অপরপক্ষে ইদানীংকালে ঈশারউড্ লিখেছেন, "The New Dispensation was fundamentally a presentation of Ramakrishna's teachings—as far as Keshab was able to understand them. ···he regarded Ramakrishna as a living embodiment of his creed." (p. 165)

বাণীতে শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের নিকট সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবাদর্শ চিত্রপটে চিত্রাংণ করার আকাঙ্ক্ষা হয় সুরেশচন্দ্রের। সুরেশ, রামচন্দ্র ও মনোমোহন একই পল্লীতে বাস করতেন। সুরেশ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চিত্রপটের পরিকল্পনা করেন। জনৈক গুণী চিত্রশিল্পী সেই সুন্দর পরিকল্পনাটিকে রূপদান করেন একটি তৈলচিত্রের মাধ্যমে। পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম রামচন্দ্র লিখেছেন, "এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটি ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটি পরমহংসদেবের নিজের সাধনার ফলস্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহা কেশববাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন।" ৭ রামচন্দ্র অন্যত্র লেখেন, "সেই ছবিতে পরমহংসদেবকে সর্বধর্মসমন্বয়ের গুরুরূপে এবং কেশববাবুকে শিষ্যস্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল।" ৮ 'জন্মভূমি' পত্রিকাও লেখে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার সারকথা এবং কেশবচন্দ্রের ঐ ভাবগ্রহণ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই চিত্রপটের পরিকল্পনা। ৯ সুরেশচন্দ্র তৈলচিত্রখানি কেশবচন্দ্রকে দেখতে পাঠান। কেশবচন্দ্র তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেন একখানি চিঠিতে। তিনি লেখেন, "Blessed is he who has conceived this idea." ১০ উৎসাহিত সুরেশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তৈলচিত্রখানি দেখিয়ে আনেন। চিত্রপট সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিলম্ব প্রতিক্রিয়া লিখিত নাই, কিন্তু চিত্রের ভাব তাঁর অনুমোদন লাভ করে, সন্দেহ নাই। সুরেশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানার দেওয়ালে পটখানি টাঙিয়ে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাড়ীতে বসে পটখানি দেখেন, পূর্বে না হলেও অন্ততঃ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তৈলচিত্রখানিকে বলতেন 'সুরেন্দ্রের পট'; রামদত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের মতে ছবির বিষয়বস্তু 'কেশবের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ', শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকারের মতে 'নববিধানের ছবি', সাধারণ লোক ছবিটির নামকরণ করে 'সর্বধর্মসমন্বয়'। ১১ আর নববিধান সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে

---

৭ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০

৮ তত্ত্বমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১২৯৩ সাল, শ্রাবণ

৯ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১০ জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০ ; তত্ত্বমঞ্জরী দাবী করেন ঐ চিঠিখানি সুরেশবাবুর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

১১ জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৯৯

ছবিটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'নববৃন্দাবন মেলা'। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চিরঞ্জীব শর্মা-প্রণীত নববৃন্দাবন নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যাবতীয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধুর মিলন। সেখানে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িয়ে সব ধর্মের মানুষ একত্রে গাইছে:

জয় দয়াময় দয়াময় দয়াময়
জয় প্রভু পরব্রহ্ম হরি লীলারসময়।
জয় মা আনন্দময়ী জগতজননীর জয়।
আজ নববৃন্দাবনে, লয়ে যত ভক্তগণে
করিলেন প্রেমময় সর্বধর্মসমন্বয়।
জনক নারদ ঈশা যোগী যাজ্ঞবল্ক্য মুশা;
শিব শাক্য মহম্মদ ধ্রুব শ্রীগৌরাঙ্গের জয়।
যত শাস্ত্র যত ধর্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম,
সকলেরই এক মর্ম, একেতে হইল লয়॥

মূল তৈলচিত্রখানি ৪২"×৩০" ক্যানভাসের উপর আঁকা। বর্তমানে চিত্রপটের সম্মুখভাগ কাঁচে ঢাকা এবং প্রায় ৩" কাঠের ফ্রেমে বাঁধান।১২ এই তৈলচিত্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'Unity and the Minister', Supplementary copy, 'প্রতিবাসী' (দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১৯, বৈশাখ), 'জন্মভূমি' (২১ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩২০, বৈশাখ) ইত্যাদি। আর জনপ্রিয়তার জন্য তৈলচিত্রের অনুলিপি বিভিন্ন বাড়ীতে ঠাঁই পায়, যেমন কেশব-অনুরাগী নন্দ বসু ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মনোমোহন মিত্রের বাড়ীতে।

তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি, তাঁর ১৮৮১ খ্রীঃ ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের প্রায় অনুকৃতি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, চিত্রে কেশবচন্দ্র যে প্রতীকচিহ্নটি ধরে আছেন সেটি কেশবচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীঃ জানুয়ারিতে ব্রাহ্ম উৎসবের দিনে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন ১৩ এবং পরবৎসর জানুয়ারিতে সেটি নিয়ে নগরকীর্তন

১২ মূল তৈলচিত্রখানি সযত্নে রক্ষিত আছে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যম ও বয়সে বড় ভাই মহেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র উমাপতিনাথ মিত্রের নিকট। প্রায় ৪০ বছর পূর্বে জনৈক চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তৈলচিত্রখানি মেরামত করা হয়।

১৩ J. N. Farquhar: Modern Religious Movements in India, p. 56.

করেছিলেন। অনুমান হয়, তৈলচিত্রের রচনাকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হ'তে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে।

সুদক্ষ পেশাদার শিল্পীর মুন্সিয়ানা চিত্রপটে সুস্পষ্ট। খদ্দেরের অর্ডার মাফিক চিত্রপট আঁকা হলেও শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য ও নৈপুণ্য ভাবসম্মেলন ও প্রকাশব্যঞ্জনায় প্রকট। কবি ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন ভাষা, চিত্রশিল্পী অনুভূতি প্রকাশ করেন বর্ণিকার সাহায্যে। চিত্র, চিত্রোপকরণ ও চিত্রকরের ভাবের সাম্যে চিত্রপট সার্থক হয়, আবার চিত্রকর ও চিত্রদ্রষ্টার সহ-মর্মিতায় চিত্রপটের ভাববস্তু হয় প্রাণবন্ত। আলোচ্য চিত্রপট এই বিচারের মাপ-কাঠিতে সুপ্রশংসিত।

পটভূমিকায় নীলাকাশের চন্দ্রাতপ সবুজ বনানীর শীর্ষরেখা স্পর্শ করেছে যেন। সম্মুখে বামদিকে একটি গীর্জা, মধ্যে একটি মসজিদ, ডাইনে একটি শৈব মন্দির।১৪ মসজিদ ও মন্দিরের মধ্যে নীলাকাশে ভাসছে একটি শঙ্খচিল, নীচে তাকিয়ে দেখছে বিচিত্র একদল মানুষের জমায়েত। পটভূমিকা ইঙ্গিত করছে মন্দির-মসজিদ, শাস্ত্র-শরিয়ৎ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মজীবনে প্রয়োজনীয় হলেও গৌণ। ধর্মজীবনের লক্ষ্য তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি। উপর্যুক্ত আঙ্গিকের পটভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহা-মানবগণ, যাঁরা ধর্মতত্ত্ব বোধে বোধ করেছেন।

ভাববস্তুর বিচারে দৃশ্যপট দুভাগে বিভক্ত—দৃক্ ও দৃশ্য। বাস্তবসত্তা'ক শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র এখানে দৃক্‌স্বরূপ এবং প্রাতিভাসিক ভাবরাজ্যের আনন্দঘন একটি প্রকাশ এখানে দৃশ্য। বাস্তব ও প্রাতিভাসিক সত্তার মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য শিল্পী শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের গলায় মালা দেননি, ভাবরাজ্যের সকল মূর্তির গলায় দিয়েছেন। ঘড়ির টাওয়ার শোভিত এ্যাংলিকান চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ। যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত কেশবচন্দ্রের জীবন ও সেইকারণে পশ্চাদ্-ভূমি গীর্জার সম্মুখে কেশবচন্দ্রের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর পরে কেশবচন্দ্র সর্ববামে দাঁড়িয়ে। তাঁর ডানহাতে একটি পতাকাবাহী দণ্ড, সবুজরঙের পতাকা দণ্ডে জড়ানো, আর দণ্ডের উপর

---

১৪ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ হতে প্রকাশিত Memoirs of Ramakrishna গ্রন্থে সংযুক্ত এই ছবিতে একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। শৈব মন্দিরের স্থানে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির।

একটি প্রতীক। অর্ধচন্দ্রের উপর একটি ত্রিশূল, বামে একটি ক্রুশ ও ডাইনে একটি পাঞ্জা। অর্ধচন্দ্রের নীচে নক্সা করা পাদপীঠ, তাতে লেখা 'হরের্নামৈব কেবলম্'। নববিধান আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ধর্মসমন্বয়ের এই প্রতীক।১৫ ধীর স্থির কেশবচন্দ্র শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরনে সবুজ বনাতের কোট, লালপেড়ে ধুতি, ধুতির আঁচল বাম কাঁধে ঝুলছে। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিওতে তোলা আলোকচিত্রের সঙ্গে এই ছবির গভীর সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট। পার্থক্য হাত দুটির বিন্যাসে। আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ডান হাত একটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, আর বাম হাত বুকের নীচে ভাঁজ করা। তৈলচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ বাম হাতে সম্মুখের একটি দৃশ্য নির্দেশ করছেন, ডান হাত বুকের নীচে বিন্যস্ত কিন্তু তাঁর হাতের আঙুল নির্দেশ করছে প্রাগুক্ত দৃশ্য। আলোক-চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে চটিজুতা, এখানে খালি পা। তা ছাড়াও এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখারবিন্দে যে দিব্যদ্যুতির আভাস, আলোকচিত্রে তার অভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে ভাবের নেশা, তিনি যেন ভাবমুখে কেশবচন্দ্রকে উপদেশ দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করলে চোখে পড়ে ভাবরাজ্যের একটি মনোরম দৃশ্য। মন্দির ও মসজিদের মধ্যের ভূখণ্ডে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্য। তাঁরা প্রেমভরে অচৈতন্য হয়ে নৃত্য করছেন, চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়েছেন আনন্দের ফাগ। তাঁদের ঘিরে আছেন বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধক ও সিদ্ধ ভক্তগণ। খ্রীষ্ট ও চৈতন্যের ডাইনে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভূমি মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন

১৫ সুরেন্দ্রনাথ সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব নিয়ে এই প্রতীক-যন্ত্রটি তৈরী করেন। কেশবচন্দ্র ঐ যন্ত্রটি নিয়ে একবার নগরকীর্তনে বের হন। (পরম-হংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪০; জন্মভূমি, ১৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) সম্ভবতঃ সেই দিনটি ছিল সোমবার, ১৮৮২ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি। কেশবচন্দ্রের সমাধি-স্থানের উপর স্থাপিত নববিধানের প্রতীকে দেখা যায় অর্ধচন্দ্র, ত্রিশূল, ক্রুশ ও বৈদিক ওঁকারের সমন্বয়। (P. C. Mazoomdar: The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, p. 324) আবার তৈলচিত্রের প্রায় অনুরূপ প্রতীক-যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির অন্যতম আলোকচিত্রে। সেখানে ভক্ত বলরাম বসু প্রতীক যন্ত্রটি ধরে আছেন।

বৈষ্ণবাচার্য, তাঁর হাতে শ্রীযন্ত্রসংবলিত দণ্ড, দণ্ডে লাল রঙের ত্রিকোণ পতাকা; তারপর দাঁড়িয়ে একজন তান্ত্রিকাচার্য, তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। চোগাচাপকানধারী পাগড়ি-দাড়ি-শোভিত তৃতীয় ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের নেতা। হাতে দণ্ডে-বাঁধা সবুজ ত্রিকোণ পতাকা, চূড়ায় প্রতীক পাঞ্জা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একজন এ্যাংলিক্যান চার্চের পাদরী হাতে ক্রুশের প্রতীক; পিছনে দাঁড়িয়ে একজন কনফুশিয়স-ধর্মাবলম্বী চৈনিক, তাঁর মাথার চারদিক চাঁছা—মধ্যে ঝুলছে মোটা বেণী; তাঁর সম্মুখে দাড়ি ও পাগড়ি-শোভিত জনৈক মোল্লা—হাতে দণ্ড, দণ্ডের চূড়াতে অর্ধচন্দ্র। মোল্লা-সাহেব ও যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে জনৈক বৌদ্ধ। এই সাতজন দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের দ্বৈতনৃত্য উপভোগ করছেন। শ্রীচৈতন্যের বামে অর্থাৎ হিন্দু মন্দিরের সম্মুখে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দশজন ভগবদ্ভক্ত। শ্রীচৈতন্যের বামে একজন গুজরাতী ও একজন মাড়োয়াড়ী ভক্ত। সম্মুখভাগে দুইজন খোল বাজাচ্ছে, একজন বাজাচ্ছে রামশিঙা অপর একজন একজোড়া বড় খঞ্জনী। নৃত্যের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এদের দেখা যাচ্ছে। তাঁদের পাশে একজন শৈব ও একজন তান্ত্রিক ও অপর দুজন রামাইত সম্প্রদায়ের ভক্ত তালে তালে নৃত্য করছেন। কল্পনা করা যেতে পারে তাঁদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্বধর্মসমন্বয়ের ঐকতান। ঐকতানে প্রত্যেক সুরের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট অথচ সব কিছু মিলে সৃষ্টি করেছে সুরলোকের অতুলনীয় সুরব্যঞ্জনা। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতীকচিহ্নগুলি মাল্যশোভিত, কারণ প্রতীকগুলি প্রবর্তকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ।

ভাবরাজ্যের দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করলে পরিস্ফুট হবে একটি গভীর ভাব। মোটামুটিভাবে, নৃত্যরত খ্রীষ্ট-চৈতন্যের ডানদিকের ব্যক্তিদের সমাবেশ বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় এবং বামদিকের ব্যক্তিদের মিলন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয় সূচনা করছে।[১৬] একদিকে সাম্প্রদায়িক ধর্মে নিষ্ঠা, অন্যদিকে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদারতা ও বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা এই দুই-ই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ শিক্ষা। একদিকে স্বধর্মের মাধ্যমে কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে ধর্মসমন্বয়ের

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১।২।১০): 'কেশবকে ঠাকুর দেখাইতেছেন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সকল ধর্মের সমন্বয়। আর বৈষ্ণব শাক্ত শৈব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়।' এই প্রসঙ্গে তত্ত্বমঞ্জরী, চতুর্থ খণ্ড একাদশ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভাবাদর্শে সঙ্কীর্ণতার বন্ধনমোচন—এই দুইটি ভাবের মিলন ঘটেছে চিত্রপটে। স্বধর্মে নিষ্ঠা ও পরধর্মের প্রতি প্রীতি ও আত্মীয়তা—এই আপাতবিরোধী ভাবদ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাধান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিস্বরূপ স্বধর্ম-নদী ও সর্বধর্মের মোহনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতন ভারতবর্ষের তপোবন। সেই তপোবনের কুলপতি যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শিক্ষার্থী তাপসগণের প্রতিনিধি কেশবচন্দ্র। এই তপোবনে শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে গড়ে উঠবে নূতন ভারতের সমাজ, এখানকার ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে স্থায়ী বিশ্বশান্তি।

'সুরেন্দ্রের পট' সেই তপোবনের প্রতিচ্ছায়া। পটের অলোকসুন্দর লালিত্য সর্বপ্রকার সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের দ্যোতক, পটের বর্ণালির আভা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাসক। ফারকুহার মনে করেন এই অলোকসামান্য চিত্রপটখানি 'সামগ্রিক পুনর্মিলনের' স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যোগ্য উৎসর্গ।[১৭] আমাদেরও মনে হয়, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি 'সুরেন্দ্রের পট'। সেই কারণেও 'সুরেন্দ্রের পট' শুধুমাত্র অসামান্য নয়, অদ্বিতীয়।

১৭ J. N. Farquhar: Modern Religious Movement In India (1915) p. 199, "It seems to me that nothing could be more fitting than to dedicate this interesting piece of theological art to the versatile author of Re-union All Round."

শ্যামপুকুরে কালীপূজা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কালীময়, তাঁর সাধনকালে জগজ্জননী মাকালীর সঙ্গে নিত্য বোঝাপড়া, সাধনোত্তরকালে মাকালীর সঙ্গে নিত্য লীলা-বিলাস। শ্রীরামকৃষ্ণ 'মাকালীর অবতার।'[১] শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবরূপে কালী, আদ্যাশক্তি, অনন্তরূপিণী। তিনিই 'আত্মারামের আত্মা কালী'। তিনিই ত্রিগুণধারিণী জগদ্ধাত্রী। "বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার অসংখ্য পুত্রকন্যাগণকে জ্ঞানভক্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ।"[২]

জগজ্জননী মাকালীই মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের কল্যাণের জন্য এসেছেন। মানুষের সাজে, মানুষের মাঝে এসেছেন, তাঁকে চেনা কঠিন। 'মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।' অপর দশজনের মত তাঁর শরীর আধি-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ব্যাধির প্রাবল্যে তাঁর সুঠাম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা যায়। রোগ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না, উপরন্তু আগস্ট মাসে তাঁর কণ্ঠতালু হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ ভক্তগণকে ভাবিত করে। ভক্তগণ যুক্তিবিচার করে প্রস্তাব করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নেওয়া দরকার। বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে রাজী হন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় চলে আসেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। শনিবার সকাল বেলা। বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জি ষ্ট্রীটের স্বল্প-পরিসর বাড়ী ঠাকুরের পছন্দ হয় না। তিনি নিকটবর্তী বলরাম বসুর বাড়ীতে ওঠেন।

১ Sister Nivedita's letter dated 16.3.1899 to Miss McIeod: "The Mother says that Sri Ramakrishna told her that Swami was···a direct incarnation of the National God and He Himself of Kali."

২ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বাভাস। উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

ঠাকুরের কলকাতায় অবস্থানের সংবাদ প্রচার হতেই বলরামভবনে যেন ভক্তের মেলা বসে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি ঠাকুরকে পরীক্ষা করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন, ব্যাধি দুরারোগ্য। ইংরাজ ডাক্তারও রোগমুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। নিরূপিত হয় ব্যাধি রোহিণী অর্থাৎ ক্যানসার।

ভক্তগণ নিকটবর্তী শ্যামপুকুর অঞ্চলে একটি পছন্দমত বাড়ীর সন্ধান করতে থাকেন। শ্যামপুকুর পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পরিচিত। এই পল্লীতে কাপ্তেন বা বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষ, মাষ্টার বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণের বাস ছিল। ঠাকুর এই সব ভক্তের বাড়ীতে কয়েকবার গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে এই বাড়ী। তখনকার ঠিকানা ছিল ৫৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাড়াবাড়ীতে আসেন ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যার পর। সেদিন ছিল শুক্রবার, ১৭ই আশ্বিন, ১২৯২ সন।[৩] গঙ্গা থেকে বেশ কিছুটা দূর হলেও, বাড়ীখানি[৪] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পছন্দ হয়।

একখানি লম্বা ঘর—সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাবার পথ। প্রথমেই 'বৈঠকখানা' নামে পরিচিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢোকার দরজা। এই ঘরখানি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বৈঠকখানার পশ্চিমে ছোট ছোট দুখানি

---

৩ এই তারিখ দুটি সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা "শ্যামপুকুর বাটীতে কালীপূজা" প্রবন্ধ (উদ্বোধন ৬১ বর্ষ ৬৩৯ পৃঃ) হতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ) বলেন, ঠাকুর দুর্গামহাষ্টমীর প্রায় একমাস পূর্বে শ্যামপুকুরে আসেন। লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা (পৃঃ ২৩৪) ও লীলাপ্রসঙ্গ (৫ম খণ্ড, ২৯৬ পৃঃ) অনুসারে ঠাকুর বলরামভবনে মাত্র সাত দিন বাস করেন। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, তিনি কথামৃতকারের দিনলিপি থেকে তারিখ দুটি পেয়েছেন।

৪ পরবর্তীকালে এই বাড়ীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। ৫৫।এ ও ৫৫বি, দুটি প্রাঙ্গণে বিভক্ত হয়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু টিনের প্রাচীর। বর্তমানের ৫৫এ প্রাঙ্গণটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন। তিনি দোতলায় যে হল ঘরটিতে বাস করতেন সেটা বর্তমানে একাধিক কক্ষে বিভক্ত। দোতলায় ওঠার একটি পৃথক সিঁড়িও তৈরী হয়েছে।

ঘর—একটি ভক্তদের জন্য, অপরটি শ্রীমাতাঠাকুরানীর রাত্রিবাসের জন্য। বৈঠকখানা ঘরে যাবার পথে পূর্বদিকে ছাদে উঠার সিঁড়ি। ছাদে যাবার দরজার পাশে চার বর্গহাত পরিমাণ একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল।

শ্যামপুকুরের এই বাড়ী অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাগন্ত্যলীলাভূমি। এই লীলাক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান দুই মাস নয় দিন মাত্র। তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যা'ন ১১ই ডিসেম্বর। এখানকার লীলাবাসর কত না আনন্দস্মৃতির সঙ্গে জড়িত। দিনগুলি ভক্তি-ভাব-রসে জারিত। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানাভিমানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃপা করেন, বলেন, "(তুমি) শুদ্ধ—তুমি রসবে।" তাঁর পুত্রকে ডেকে বলেন, "বাবা, আমি তোমার জন্য এখানে এসেছি।" এখানেই ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘোষণা করেন—ঢাকাতে অলৌকিকভাবে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন। এখানেই খ্রীষ্টান প্রভুদয়াল মিশ্র ঠাকুরের শরণাগতি নেন। এখানেই কৃপাকাতর বিনোদিনী সাহেব সেজে ঠাকুরের দর্শনলাভে সমর্থ হন। এখানে কত কত নূতন ভক্ত উপস্থিত হন। অবতারের লীলাবিলাসের অমিয় স্মৃতিতে পরিপূর্ণ এখানকার দিনগুলি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাড়ীতে এসেছিলেন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য। তাঁর আগমনবার্তা লোকমুখে রাষ্ট্র হয়। পরিচিত-অপরিচিত লোক দলে দলে উপস্থিত হয়। তাঁর কাছে এলেই লোকের শান্তি ও আনন্দ। আনন্দপুরুষের সান্নিধ্য, তাঁর কৃপালাভের জন্য লোকের ভিড় লেগে যায়। অহেতুককৃপাসিন্ধু! তাঁর দয়ার ইয়ত্তা নাই—সর্বদাই তাঁর একমাত্র চেষ্টা কিসে লোকের মঙ্গল হয়। মনে হয় শহরের লোকদের বিশেষভাবে কৃপা করার জন্যই যেন তিনি কলকাতায় বাস করছেন। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার চিকিৎসা শুরু করেন। ব্যাধির স্থায়ী প্রশমন হয় না। ঠাকুরের সুঠাম শরীর শীর্ণ দীর্ণ হয়ে যায়। গলার ক্ষত হতে পুঁজ রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু সে বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। তিনি অকাতরে কৃপা বিতরণ করতে থাকেন। তিনি যে অবতার। অবতার ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তি। অবতার আসেন তারণ করতে। তারণ করাই তাঁর অনুগ্রহ। অনুগ্রহ-বিতরণ যেন তাঁর বিষম এক দায়। "যার দায় সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়।" —অবতারের এই আকূতি চিকিৎসক বোঝে না, সেবকগণ মানতে চায় না। কৃপাদাতা দয়াল ঠাকুরের কৃপাবিতরণ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়।

রোগীর সেবাশুশ্রূষার জন্য নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবকভক্ত এগিয়ে

আসেন। লাটু, গোপাল (ছোট), কালী, শশী, শরৎ প্রভৃতি কয়েকজন 'জীবনোৎসর্গ করিয়া সেবাব্রত' আরম্ভ করেন। রোগীর পথ্য প্রস্তুত করার জন্য শ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বর থেকে আসেন, অসংখ্য অসুবিধা অগ্রাহ্য করে ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, সুষ্ঠু সেবাযত্নের বিধিব্যবস্থা হয়, কিন্তু ব্যাধির প্রাবল্যের ঝাপটা-হাওয়াতে সেবক ও ভক্তদের আশাদীপ প্রায়ই কেঁপে কেঁপে উঠে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবে বাংলাদেশ মেতে উঠেছে। কলকাতার পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের ছড়াছড়ি। ভক্ত 'সুরেন্দর' ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন। মহাষ্টমীর রাতে সন্ধিপূজার সময় ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেগে দাঁড়িয়ে পড়েন। নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, লাটু, নিরঞ্জন ও অন্য ভক্তগণ ঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।[৫] ঠিক সেই সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মশরীরে জ্যোতির্বর্ত্ম ধরে সুরেন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে উপস্থিত হন, সুরেন্দ্র তাঁকে দুর্গাপ্রতিমার পাশে দেখতে পান। পূজামণ্ডপের পরিবেশ আনন্দঘন হয়ে উঠে। ভক্তগণ বিমোহিত হন।

ক্রমে আসে কোজাগরী পূর্ণিমা। আনন্দময় ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন, "চতুর্দিকে আনন্দের কোয়াশা।" ভাব গভীর হলে সমাধিস্থ হন, আবার ভাবচক্ষে দেখেন, ভয়ঙ্করা কালকামিনী মূর্তি, যেন বলছে, 'লাগ্! লাগ্! লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্!' সত্যিই যেন ভেলকি! শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি, অসহ্য যন্ত্রণা, রক্তক্ষরণে শরীর অতি ক্ষীণ, জীর্ণ, দীর্ণ, কিন্তু দেহ-বোধ-বিবিক্ত যোগী পুরুষ সদাসর্বদা ঈশ্বররসে ভাসছেন, ডুবছেন। তিনি নিজমুখে বলেন, "কিন্তু দেখছি যে এটা আলাদা।...নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়। তখন নারকেল টের পাওয়া যায়—ঢপর ঢপর করছে।"[৬] রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সর্বদাই আনন্দে ভাসছেন, অনুগ্রহ করে অপরকে আনন্দ দান করে আনন্দলাভ করছেন।

এগিয়ে আসে আশ্বিন-অমাবস্যা। ৺শ্যামাপূজার প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের অনেকদিনের বাসনা প্রতিমা গড়ে

৫ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃ: ৭৬

৬ কথামৃত ৪।২২।২

শ্যামাপূজা করেন। নানা কারণে বাসনা পূর্ণ হয়নি। আবার অপূর্ণ বাসনার উদয় হয়। ভাবেন জগজ্জননীর আদরের সন্তান ঠাকুরের উপস্থিতিতে প্রতিমায় শ্যামাপূজা করতে পারলে জীবন সার্থক হয়। বিশেষ দিনে বিশেষতঃ কালী-পূজার দিনে ঠাকুর ভাবের ঘোরে ভাসতেন। ভাবের আধিক্যে ব্যাধির বৃদ্ধি আশঙ্কা করে ভক্তগণ দেবেন্দ্রের প্রস্তাব নাকচ করেন।

ভাবগ্রাহী ভগবান। ভক্তের আর্তিতে তিনি সহজেই সাড়া দেন। অচিন্ত্য উপায়ে ভক্তের শুদ্ধ বাসনা পূরণ করেন। শ্যামপুকুর বাটীতেও শ্যামাপূজাব প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রস্তুতি চলে গোপনে। আদরিণী শ্যামা মাকে গোপনে ডাকতে হয়। গোপনে জানাতে হয় হৃদয়ের আকৃতি। প্রতিমাতে কি আর জগজ্জননীকে ধরা যায়? মাতৃসাধক গেয়েছেন :

"মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥"

আদরিণী শ্যামা মা ভাবেতে ধরা দেন। ভাবের মূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্যামপুকুর বাটীতে শ্যামাপূজার প্রস্তুতি চলেছিল। শ্যামাপূজার দিন বিশেষভাবে পূজানুষ্ঠানের জন্য ভাবের প্রতিমা তৈরী হচ্ছিল। শ্যামাপূজার পূর্বদিন উপস্থিত কয়েকজন ভক্তকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "পূজার উপকরণ সকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।" ৭ শ্যামাপূজা হবে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যায়। সংবাদে ভক্তগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। কিন্তু পূজার আয়োজন সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ না থাকায় ব্যবস্থাপকগণ নানা জল্পনা করতে থাকেন। কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। শেষকালে মুরুব্বি ভক্তগণ স্থির করেন, গন্ধপুষ্প ধূপ-দীপ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন জোগাড় করা যাক,৮ পরে ঠাকুর যেমন নির্দেশ দেবেন তেমন করা যাবে। বীরভক্ত

৭ স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর "আমার জীবনকথা" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৭) লিখেছেন, "কাল মা কালীর পূজা করতে হবে। সংক্ষেপে পূজার উপকরণগুলি আয়োজন করে রাখিস।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার বলেন, কালীপূজা নিকটবর্তী হলে কোনও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে পূজার আয়োজন করতে বলেন।

৮ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৮৭, "প্রভু ভক্তগণকে কহিলেন,···তোমরা সাত্ত্বিকভাবে তাঁহার পূজার আয়োজন কর।" এ ছাড়াও

কালীপদ ঘোষ পূজোপকরণ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিকটে ২০ নং শ্যামপুকুর লেনে তাঁর বাড়ী। তাঁর কর্মতৎপরতা ভক্তমহলে সুবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক জীবনীকার লিখেছেন যে, শ্যামপুকুরে ঠাকুরের অবস্থান-কালে "তিনি পরমহংসদেবের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন!" ঠাকুর তাঁকে ডাকতেন ম্যানেজার। নরেন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন দানাকালী। তিনি পরম উৎসাহে শ্যামাপূজার আয়োজন করতে তৎপর হন।

এদিকে ঠাকুরের দেহের ব্যাধির বাড়াবাড়ি চলেছিল। শ্যামাপূজার পূর্বদিন ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র চিন্তিত হয়ে ঔষধের পরিবর্তন করেন। তিনি এক দাগ নক্সভমিকা ঔষধ দেন। মনে হয় এই ঔষধসেবনে কোন উপকার হয় না।[৯] কণ্ঠপীড়ার বাড়াবাড়ি চলেছে, সেদিকে ঠাকুরের যেন কোন খেয়াল নাই। 'হাড়মাসের খাঁচা' শরীরের প্রতি তাঁর বরাবরই অবজ্ঞা। বিস্মিত ভক্তসেবক নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। "ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রফুল্লতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকট প্রতিভাত হইল।"

ক্রমে উপস্থিত হয় শ্যামাপূজার দিনটি। সেদিন ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার। প্রাতঃকাল থেকেই চিত্তহ্রদসুধাতে মহানন্দে বিহার করতে থাকেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে থাকে ভাবঘন-দ্যুতি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মহেন্দ্র মাষ্টার সকালবেলাতে ঠনঠনের ৺সিদ্ধে-শ্বরী কালীমাতাকে ফুল ডাব চিনি সন্দেশ দিয়ে পূজা দিয়েছেন। স্নান করে পূজা দিয়েছেন। নগ্নপদে ঠাকুরের কাছে মায়ের প্রসাদ এনে দিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঠাকুরের পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র, কপালে চন্দনের ফোঁটা—মনোমোহন তাঁর মূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে এনেছেন, ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে উপহার দেবেন।

চটিজুতা পায়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন, সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুরের সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় এবং ঠাকুরের শরীরের অত্যধিক অসুস্থতা বিবেচনা করে ভক্তগণ সংক্ষেপে পূজোপচার সংগ্রহ করেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

৯ পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রোগীর সমস্ত বিবরণ শুনে প্রতাপ-চন্দ্রের ঐ ঔষধের সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত নিয়ে কথা হয়। তিনি রামপ্রসাদের চারটা গান বাছাই করেন। মাষ্টার বলেন যে ঐ ধরনের গানের ভাব ডাক্তার সরকারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আর ও গানটাও বেশ!—'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' আর 'এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি'।" বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব সুস্পষ্ট এই গানের কলিতে। তাই এতে তাঁর আনন্দ।

হঠাৎ ঠাকুরের শরীরের মধ্যে চমক্ খেলে যায়। তিনি চটিজুতা ছেড়ে স্থিরভাবে দাঁড়ান। গভীর সমাধিতে স্থাণুবৎ অবস্থান করেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি অতি কষ্টে ভাব সংবরণ করেন।

দোতলার 'বৈঠকখানা' ঘরের পশ্চিমভাগে দেয়ালের পাশে একটি বিছানা পাতা। বিছানার উত্তরাংশে তাকিয়ার মত উঁচু গোছের একটি বালিশ।১০ অনেক সময় ঠাকুর তাতে হেলান দিয়ে উত্তরমুখী হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করতেন। সেদিন বেলা দশটা নাগাদ ঠাকুর বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত চতুর্দিকে বসে ঠাকুরের অমৃতবাণী আগ্রহভরে শোনেন। ঠাকুর এক সময়ে মাষ্টারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "আজ কালীপূজা, কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার বলে এস। পাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।"১১ ইতিমধ্যে মাষ্টার ও রাখাল ভিন্ন অপর সকলে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিলেন। মাষ্টার পাশের ঘরে গিয়ে ঠাকুরের আদেশ সকলকে জানান।

অন্যান্য দিনের মত অপরাহ্ণ প্রায় দুটার সময় ডাক্তার সরকার উপস্থিত হন। সঙ্গে বন্ধু নীলমণি সরকার। সে সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র,

---

১০ মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের স্মৃতিকথা: উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

১১ গিরিশচন্দ্র ঘোষ "রামদাদা" প্রবন্ধে (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) লিখেছেন, "ঠাকুর শ্রীমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।' বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মতে ঠাকুর শ্যামাপূজার দিন ভক্তদের বলেছিলেন পূজার আয়োজন করতে। অনুমান হয় ঠাকুর পূজার পূর্ব দিন ও পূজার দিন একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে বলেছিলেন।

'পাঁকাটি'র রহস্য জানা যায় না। অনুমান করা যেতে পারে কি যে ঠাকুর হোমের জন্য প্রস্তুত হতে ইঙ্গিত করেছিলেন? হোমের বিষয় অবশ্য কেউই বলেননি।

কালীপদ, মাষ্টারমশাই, নিরঞ্জন, রাখাল, মণীন্দ্র, লাটু প্রভৃতি অনেকে। প্রারম্ভিক কথাবার্তার পর ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার গানের বই দুটি ডাক্তার সরকারকে উপহার দেন। যদিও ডাক্তার সরকার মা কালীকে বলেছিলেন 'সাঁওতাল মাগী', শ্যামাসঙ্গীত তাঁর খুবই প্রিয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ভজন-কীর্তন শোনেন। ঠাকুরের আদেশে মাষ্টার ও একজন ভক্ত ঠাকুরের নির্বাচিত চারটি গান পরিবেশন করেন:

(১) 'মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।'

(২) 'কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন।'

(৩) 'মন রে কৃষিকাজ জান না।'

(৪) 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।'১২

অতঃপর ডাক্তারের ইচ্ছা হয় 'বুদ্ধচরিতে'র গান শোনেন। ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ যৌথকণ্ঠে গান ধরেন, "আমার সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।" তারপর গান করেন, "জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই" ইত্যাদি। বুদ্ধ-গীতের পর হয় গৌরাঙ্গ-গীতি: "আমায় ধর নিতাই, আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন;" "প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জগাই-মাধাই" এবং "কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।" যখন গায়কদ্বয় গাইতে থাকেন "প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেমতরঙ্গে প্রাণ নাচায়," সে সময় লাটু, মণীন্দ্র এঁদের ভাবাবেশ হয়। তাঁরা বাহ্যজ্ঞান হারান। ক্রমে সকলে সহজ স্বাভাবিক হন। বেলা গড়িয়ে চলে। ডাক্তার ঔষধের বিধান করে বন্ধুসহ ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

দিনমণি অস্ত যায়, অমাবস্যার সন্ধ্যা নেমে আসে। নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী মহাকালী মহাকালের সঙ্গে রমণ করেন। জগদম্বার বরপুত্র ঠাকুর আজ ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি অহর্নিশ মাকে দেখেছেন, তিনি একদণ্ডও মা ছাড়া থাকতে পাবেন না, তিনি যে বালক। তদুপরি আজ বিশেষ দিন, তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না।

শ্যামা মায়ের আরাধনার ব্যাপক আয়োজন করেছেন বিশ্বপ্রকৃতি।

১২ সেদিন সকাল ন'টার সময় ঠাকুর নিজে এই চারটি গান বাছাই করে-ছিলেন এবং বলেছিলেন, 'এই গান সব ডাক্তারের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে।' (কথামৃত ৩।২২।১ ও ৩।২২।২ দ্রষ্টব্য)

এদিকে ঘরে ঘরে দীপান্বিতা। আলোয় আলোময় ঘরদোর রাস্তা ঘাট। জ্যোতির্ময়ী শ্যামা মায়ের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আলোকসজ্জা, চতুর্দিকে আলোর ঝরনাধারা, আনন্দের মৃদুমন্দ হাওয়া। ধরণী আজ উৎসব-চঞ্চল। আনন্দপিয়াসী সন্তান মায়ের বরাভয়রূপটি দেখার জন্য ব্যাকুল। ঢাকঢোলের বাজনায় শহর পল্লী মুখরিত, দীপান্বিতার আলোয় আতসবাজির ঝলকে শহরবাসী সচকিত। ভক্ত কালীপদের উদ্যোগে শ্যামপুকুর বাটীও দীপমালায় ঝলমল করে! বাটীর ভিতরে পূজার প্রস্তুতি হতে থাকে।

রাত্রি প্রায় সাতটা। শীতের রাত। দোতলার বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উপবিষ্ট। কল্পনা করা যায় ঠাকুরের গায়ে সবুজ বনাতের কোট। পরনে লালপেড়ে ধুতি। পায়ে গরম মোজা। গলায় গরম গলাবন্ধ। পূর্বাস্য। পা মুড়িয়ে আসন করে বসে আছেন। শান্ত ধীর স্থির গম্ভীর। ভাব-প্রদীপ্ত প্রফুল্ল মুখমণ্ডল। অধরে হাসির রেশ। কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা। উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আনন্দ-পুরুষ ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য কোনরূপ নির্দেশ না পাওয়াতে পূজোপকরণগুলি ভূমি মার্জনা করে তাঁর সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পূজার আয়োজন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেছেন,

হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥
ফুলুকা ফুনুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপদীপ ফুল ॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি জোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী ॥১৩

১৩ 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' (পৃঃ ৪৮২) গ্রন্থে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন যে কালীপদ ঘোষের গৃহিণীর মাথা গরম ছিল, তাঁর পক্ষে এই কাজ সম্ভব ছিল না। কালীপদর কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া সুজির পায়েস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, "একদিকে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী; প্রভু অন্ন আহার করিতে পারিতেন না; তাঁহার জন্য বার্লিও আছে। অপরদিকে স্তূপাকার ফুল—রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক।"১৪ রামচন্দ্র বলেছেন, "তাঁহার (ঠাকুরের) দুই দিকে দুইটি বৃহৎ মোমের বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুই দিকে দুইটি সুবৃহৎ ধূপ হইতে সুগন্ধ ধূম উত্থিত হইতেছিল, সে সময়ে তিনি কি অপূর্ব-ভাবে শোভা পাইতেছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে বাক্য পরাজয় হইয়া যায়। অপূর্বরূপ বলিলে যদ্যপি কোন ভাব লাভ করা যায় তদ্দ্বারা বুঝিয়া লউন।"১৫ ঠাকুরের আদেশে সেবক লাটু ধূপ-ধুনা দিয়েছিলেন। এ সকল প্রস্তুতিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কোনরূপ অসম্মতি জানালেন না। তখন অনেকেরই ধারণা হল যে, "তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তিরূপিণীর পূজা করিবেন অথবা জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা করিবেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৩৩২)।

বৈঠকখানা ঘর আলোয় ঝলমল করছে। ঘরের হাওয়া ধূপ-ধুনার সৌরভে আমোদিত। পূর্বপশ্চিমে লম্বা ঘর ক্রমে ভক্তদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। ত্রিশ বা ততোধিক ভক্ত সেখানে উপস্থিত।১৬ কেউ বসেছে ঠাকুরের কাছে কেউ বা দূরে। মাষ্টার রাখাল প্রভৃতি কাছে বসেছেন। ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে বসেছেন রামচন্দ্র, তাঁর নিকটে গিরিশচন্দ্র। তাছাড়া সেখানে উপস্থিত দেবেন্দ্রনাথ, কালীপদ, শরৎ, শশী, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী, কালী (অভেদানন্দ), বৈকুণ্ঠ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল। সম্ভবতঃ সেখানে উপস্থিত ছিলেন মণীন্দ্র (খোকা), মনোমোহন, বলরাম, প্রভৃতি। ঘরের বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে এতগুলি লোক সেখানে। সবাই অনিমেষ নয়নে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ঠাকুর কি করেন, কি বলেন জানবার জন্য সবাই উন্মুখ। "কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।" (দিব্যভাব, ৩৩৩)। এক সময়ে মহেন্দ্রমাষ্টার দেখেন ঠাকুর ভক্তিভরে জগন্মাতাকে গন্ধপুষ্প নৈবেদ্য সবকিছু নিবেদন করলেন এবং মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, "একটু

---

১৪ তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 'রামদাদা' প্রবন্ধ

১৫ রামদত্তের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪০, বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩

সবাই ধ্যান করো।"১৭ ভক্তগণ ধ্যান করতে চেষ্টা করেন। কেউ নীরদবর্ণা শ্যামা মাকে, কেউ বা জগন্মাতার বরপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহকে মানসপটে স্থাপন করেন। চতুর্দিক নীরব, নিথর। আনন্দের মৌতাতে সবাই যেন মজেছে।

পিছনে রামচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বসেছিলেন। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যে গন্ধপুষ্পাদি সব জগন্মাতার উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। তিনি বিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, পরমহংসদেবের উদ্দেশ্য কি? পূজার আয়োজন করে এভাবে বসে আছেন কেন? একবার তাঁর মনে হয়, পরমহংসদেব কি পূজা করবেন? ভক্তদেরই কর্তব্য তাঁর পূজা করা। ভক্তগণ তাঁদের কর্তব্য বুঝতে পারছেন না। তিনি তাঁর ভাবনা নিম্নকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রকে নিবেদন করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিশের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'। রামচন্দ্রের কথা তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। গিরিশ উৎসাহিত হয়ে বলেন, "বলেন কি? আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন বলেই তিনি অপেক্ষা করছেন?"১৮ ভাবের ইঙ্গিত ভাবুক গিরিশের মনে ভাবের তুফান তোলে। সেই সময়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর মনের ভাব বর্ণনা করেছেন, "আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন যেন নয়। কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে, রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'যাও, যাও না।' রামদাদার কথায় আমার আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—কি, কি, এসব আজ করতে হয়। আমি অমনি 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' বলিয়া দুহাতে ফুল লইয়া 'জয় মা' শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম।"১৯ গিরিশচন্দ্র তখন উল্লাসে অধীর, ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রায় বেসামাল। প্রাণের আবেগে তিনি

১৭ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, (পৃঃ ৭৮): "ইতিমধ্যে তিনি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূজার দ্রব্যাদি নিজের মধ্যে বিরাজমানা জগন্মাতাকে নিবেদন করিলেন এবং সমবেত ভক্তগণকে ধ্যান করিতে বলিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতে লিখেছেন, "ঠাকুর ভাবভরে নিজ শিরে পুষ্প দিয়া কহিলেন—তোমরা সব মা কালীর ধ্যান কর।"

১৮ রামচন্দ্রের লেখা পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ও রামদত্তের বক্তৃতাবলী (প্রথম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১৯ গিরিশচন্দ্রের 'রামদাদা' প্রবন্ধ: তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ১৩১১ সাল।

ঠাকুরের পাদপদ্মে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি দেন। পুষ্পপাত্র থেকে একগাছি মালা দিয়ে ঠাকুরের পাদপদ্ম সাজান। এদিকে ঠাকুরের মধ্যে দ্রুত দেখা দেয় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। ঠাকুরের সমস্ত শরীরে শিহরণ। তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হন। "তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় এবং দিব্যহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়-মুদ্রা ধারণপূর্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরাস্য হয়ে উপবিষ্ট, নিস্পন্দ বাহ্যজ্ঞানশূন্য তাঁর শরীর। ভক্তগণ দেখেন, 'ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা।' চৈতন্যবান নরদেহে চৈতন্যময়ীর আবির্ভাব, অপরূপ তাঁর রূপসৌন্দর্য। অবর্ণনীয় তাঁর দিব্যদ্যোতনা। 'সৌম্য হতে সৌম্যতরা'র আবির্ভাব দর্শন করে ভক্তহৃদয়ে ওঠে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ। জনৈক উপস্থিত ভক্ত লিখেছেন, "ফলতঃ প্রভুর এমন আনন্দঘনরূপ আমরা ইতি-পূর্বে দর্শন করি নাই। এ রূপ বর্ণনার অতীত, কেবল ধ্যানেরই উপভোগ্য।"২০

ভক্তগণ সম্মুখে দেখেন জীবন্ত শ্যামাপ্রতিমা। কোন ভক্তের মানস-আরশিতে ঝিলিক দেয় অতীতের ঘটনা। ভক্ত মথুর চর্মচক্ষে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে শিব ও কালী মূর্তির ক্রমসমুচ্চয়। মনে পড়ে ভাবস্থ ঠাকুর জগন্মাতার

গিরিশচন্দ্র আরও লিখেছেন, "সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয় রামদাদাকে মনে পড়ে, মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।" লীলাপ্রসঙ্গ-কারের মতে 'অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের'...আপনা হতে মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, ঠাকুর তাঁর শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা গ্রহণ করবার জন্যই পূজার আয়োজন।

গিরিশচন্দ্র ২৪।১০।১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় বলেছিলেন, "(ঠাকুর) আমাকে বলিলেন, আজ মার দিন এমনি করিয়া বসিতে হয়। আমার কি মনে হইল, আমি জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া সেই চন্দন ও ফুল তাঁহার চরণে দিলাম এবং উপস্থিত সকলেই সেইরূপ করিল" তত্ত্বমঞ্জরী, ১২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ১৬৮ অনুসারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ, সে-সময়ে গিরিশচন্দ্র 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে পুষ্পাদি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন।

২০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ১৮৮। ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যে, উপস্থিত ভক্তদের অনেকের ধারণা হয় যে, ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখেই গিরিশচন্দ্র ফুল ও মালা ঠাকুরের শ্রীপদে অঞ্জলি দেন।

সঙ্গে কথা বলছেন, "তুমিই আমি, আমিই তুমি। তুমি খাও; তুমি আমি খাও!" মনে পড়ে কয়েকদিন পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, "এর ভিতরে তিনিই আছেন। এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন।"২১ ভক্তদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন, "এক রূপে শ্যামারূপ, অপরে গোঁসাই"—একই কল্যাণীশক্তির দুটি ভিন্ন রূপ। প্রত্যক্ষে প্রতীত ব্যাপারটির সংঘটন দেখে ভক্তগণ বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েন। পুঁথিকার লিখেছেন,

কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাহাতে॥

দুর্লভ ক্ষণ। ভক্তগণের প্রাণে উল্লাস। সম্মুখে জীবন্ত রামকৃষ্ণকালীবিগ্রহ। ভক্তগণ ইচ্ছামত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিগ্রহের পাদপদ্মে ফুলচন্দন অঞ্জলি দেন। মাষ্টার গন্ধপুষ্প দেন। ভাববিহ্বল রাখাল পুষ্পবিল্ব দেন। রামচন্দ্র মুঠোভরে ফুল দেন, লাটু একটি ফুল দেন, অন্যান্য ভক্তেরা দেন। নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়ে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলে শ্রীপাদপদ্মে মাথা রেখে প্রণাম করেন। কালীপ্রসাদ, অক্ষয় মাষ্টার, চুনীলাল প্রভৃতি 'জয় মা কালী' উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। চতুর্দিকে 'জয় মা! জয় মা!' ধ্বনি।২২

ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ। কেউ স্তব করেন, কেউ সুর করে স্তব করতে থাকেন। গিরিশচন্দ্র জলদগম্ভীর স্বরে স্তব করেন,

কে রে নিবিড়-নীল-কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল-চরণযুগল হর-উরসে বিরাজে॥ ইত্যাদি

গিরিশ গান ধরেন,

"দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজস্তমত্রিগুণধারিণী।
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।"

সবাই আনন্দে বিহ্বল, ভাবে মাতোয়ারা। কয়েকজন ভাবোচ্ছ্বাসে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে থাকেন, কেউ বা করতালি দিয়ে নৃত্য করতে থাকেন।২৩

২১ কথামৃত ২।৩।৪ এবং কথামৃত ৪।২৪।৩ দ্রষ্টব্য।

২২ ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা স্মৃতিকথা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্র গুপ্তের অভিমত যে, জয় মা ধ্বনির পর ঠাকুর বরাভয়করা মূর্তি ধারণ করে সমাধিস্থ হন। অপর অধিকাংশের মত—গিরিশের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেই ঠাকুর এইভাবে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

২৩ রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১

মনে হয় 'বসেছে পাগলের মেলা'। অপরে কে কি বলে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। 'ভাবের সুরায় ভাবুকদল প্রায় বেসামাল।' 'মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।' বিহারী২৪ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন তাঁর প্রাণের আকূতি—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,
হৃদয়মাঝে উদয় হইও মা যখন হব অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তিচন্দন মা পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

মহেন্দ্রমাষ্টার অন্যদের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ধরেন,

'সকলি তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' ইত্যাদি।

ভক্তগণ পর পর কয়েকটি গানের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত করেন ভাবের আবেগ। সঙ্গীততরঙ্গে সবাই যেন ভাসতে থাকেন। গান চলতে থাকে—

"তোমারি করুণায় মা সকলি হইতে পারে" ইত্যাদি।
"গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না" ইত্যাদি।
"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি" ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে ঠাকুর ভাবসমাধি হতে ব্যুত্থিত হন। ক্রমে তাঁর বাহ্যস্ফূর্তি দেখা যায়। ঠাকুর একটি শ্যামাসঙ্গীতের ফরমাশ করেন, ভক্তগণ গান করেন, "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।" তারপর ঠাকুরের আদেশে তাঁরা গান করেন,

শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধাপানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥

গানের লহরীতে ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। তিনি গভীরভাবস্থ হয়ে পড়েন।

আবার ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্তির লক্ষণ দেখা যায়। ভক্ত রামচন্দ্র

তত্ত্বমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা: 'সকলে জয় রামকৃষ্ণ রবে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।'

২৪ বীরভূম জেলার 'বাহিরী' গ্রাম-নিবাসী বিহারী নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে থেকে চাকরী করতেন। তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। (ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারের 'মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ' পৃ. ৬৯ দ্রষ্টব্য।)

বলেন, "প্রভুর ভাবাবসানপ্রায় বুঝিয়া আমি ভোজ্যপাত্রগুলি একে একে তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলাম; দয়াময় দয়া করিয়া দুই হস্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কণ্ঠের পীড়ার জন্য প্রভু আমার অন্য কঠিন বস্তু ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। অদ্য সে ব্যক্তি কোথায় গেল! যে গলদেশ দিয়া ক্লেশে দুধ প্রবেশ করিত, সেই গলদেশে লুচি প্রভৃতি চলিয়া গেল! পরে সুজির পাত্র ধরিলাম।২৫ তিনি তাহাও প্রীতিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তাম্বুলগুলি দুই হস্তে উত্তোলনপূর্বক বদনে প্রবিষ্ট করাইলেন।"২৬ ভাবে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করে ঠাকুর পুনরায় "একেবারে ভাবে বিভোর বাহ্যশূন্য হইলেন!"২৭

পুরুষ ভক্তগণ যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে মহানন্দে প্রমত্ত, সে সময়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কি করছিলেন, প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রীমায়ের মুখে শোনা যায় শ্যামপুকুর বাড়ীতে তিনি একাকী থাকতেন। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ তাঁর কাছে থাকত।২৮ অনুমান করা যেতে পারে দক্ষিণেশ্বরের মত এখানেও শ্রীমা দরজার ফাঁক দিয়ে আনন্দবিলাস যৎসামান্য দেখেছিলেন। তাঁর নিকটে ছিল গোলাপ-মা, ভক্ত কালীপদের স্ত্রী, বোন মহামায়া এবং সম্ভবতঃ ভব মুখুজ্যেদের মেয়েটি।

ঠাকুর ক্রমে ভাব সংবরণ করেন। ভক্তগণও ধীরে ধীরে সুস্থির হন। একে একে সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করে পাশের হলঘরে (ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট বৈঠকখানাতে) সমবেত হন। রামকৃষ্ণ-কালীর মহাপ্রসাদ সকলে আনন্দে ভাগ বাঁটোয়ারা করে গ্রহণ করেন। "এই মহাপ্রসাদ লইয়া সেদিন যে কি আনন্দোৎসব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অধিকার বহির্ভূত।" স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার এঁকেছেন একটি মনোরম চিত্র। তিনি লিখেছেন,

আনন্দের স্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥২৯
শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুসুমের হার।

---

২৫ পুঁথিকারের মতে পাত্রে ছয়সের পরিমাণ পায়েস ছিল। ঠাকুর ভাবেতে প্রায় সবটুকুই গ্রহণ করেন।

২৬ রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী, ১ম ভাগ. পৃঃ ৩৪১

২৭ কথামৃত ৩।২২।৩

২৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭। "আমার জীবনকথা" (পৃঃ ৭১, ৭৬)। লেখক বলেন, গোলাপ-মা সেবকদের রান্নাবাড়া করতেন।

২৯ দানা-কালীর কনিষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র ঘোষের কাছে শোনা যায়

কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥
কেহ বা সঞ্চয়হেতু বাঁধিল বসনে।
কেহ বা গরবভরে পরে দুই কানে ॥
কেহ·বা ঢলিয়া পড়ে অপরের গায়।
হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহার ॥
কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার সাধ্য কয়।
চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয় ॥

রামকৃষ্ণ-কালী-পূজা[৩০] ও উৎসব সমাপ্ত হয়। তখন রাত প্রায় নয়টা। ঠাকুরের আদেশে ভক্তগণ সিমলা স্ট্রীটে ভক্ত সুরেন্দ্রে'র বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। 'সুরেন্দ্র' ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্যামাপূজার আয়োজন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদেব সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ। ভক্ত ও সেবক সকলকেই ঠাকুর পাঠিয়ে দেন, শুধু ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে থাকেন সেবক লাটু।

অশ্রুতপূর্ব সেই শ্যামাপূজা দুঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু আনন্দোৎসবের রেশ চলতে থাকে। ভক্তগণ ঠাকুরের অলৌকিক কৃপার বিষয় আলোচনা করতে করতে সুরেন্দ্রের বাড়ীর দিকে যান। কেউ ভাবেন ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ থেকে ব্যাধি দূর হয়েছে। "ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেবে। আজি অঙ্গে মা কালীর আবেশের ভরে।।" কেউ মনে করেন অবতারপুরুষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যাধিরূপ ছলের আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ ভাবেন অবতারদেহে জগন্মাতার দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করার পর মাটির প্রতিমাতে আর জগন্মাতাকে দেখবার সার্থকতা কি? কেউ বা ভাবেন সেদিনকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অতুলনীয় সম্পদ।[৩১] প্রাণে প্রাণে অনুভব

কাহিনীর এক টুকরো। তিনি তখন বালক। ঠাকুর তার হাতে একটি সন্দেশ দেন। উঠে যাবার সময় বালক হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, সন্দেশ হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যায়। ভক্তেরা ছুটে এসে প্রসাদের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নেন। বালক কেঁদে ফেলে। ঠাকুরের আদেশে তাকে আরেকটি সন্দেশ দেওয়া হয়। তখন সে শান্ত হয়।

৩০ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল বর্ণিত, ঐ, পৃঃ ১৮৭

৩১ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৭৮ঃ "সেই ঘটনার কথা আজও আমার মনে জাগরূক আছে। সেই অপূর্ব দৃশ্য আমরা জীবনে কোনদিন ভুলিতে পারিব না।"

করেন শুদ্ধ সাত্ত্বিক পূজাই আসল পূজা। শুদ্ধ ভাব আশ্রয় করে ভাবের পূজা করাই সাধকের কর্তব্য।

এদিকে শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবামৃত অযাচিতভাবে বিতরণ করতে থাকেন। নিকটে সেবক লাটু। তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করেন সাধন-রাজ্যের গুহ্য তথ্য। সেবক লাটু স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "...তিনি সকলকে সুরেন্দর বাবুর বাড়ীতে যেতে বললেন। হামার আর সেদিন যাওয়া হোলো না।...সে রাতে উনি হামাকে কতো কথা বলেছিলেন! সাকার ধ্যানের কথা বলতে বলতে নিরাকার-ধ্যানের কথাও হামায় জানিয়ে দিলেন। সেদিন বলেছিলেন—'ধ্যান কি এক রকম রে? এক রকম ধ্যান আছে, যেখানে নিজেকে ভাবতে হয় একটা মাছ আর ব্রহ্ম যেন অগাধ সমুদ্দুর—তাতে খেলে বেড়াচ্ছি, আর একরকম আছে, যেখানে নিজের শরীরকে ভাবতে হয় শরা আর মনবুদ্ধি হচ্ছে জল, সেই জলে সচ্চিদানন্দ-সূর্যের ছায়া পড়েছে। ন্যাংটা এক রকম ধ্যানের কথা বলতো—জলে-জল, উপর-নীচে জল, তার ভিতরে যেন একটা ঘট রয়েছে—বাহিরে ভিতরে জল, আর একরকম আছে সেখানে সচ্চিদানন্দ-আকাশে পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। এসব হচ্ছে জ্ঞানীর ধ্যানের কথা। এসব ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন।৩২

আশ্বিনের অমানিশায় বাংলার গ্রাম শহর 'কালী করালবক্ত্রান্তর্দর্শ-দশনোজ্জ্বলা'র পূজা-আরাধনায় মেতে উঠেছিল, সে সময় শ্যামপুকুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণভক্তগণ 'সদানন্দময়ী' 'মনোমোহিনী' রামকৃষ্ণকালী পূজা করে ধর্ম-জগতের ইতিহাসে একটি নূতন ভাবাদর্শ স্থাপন করলেন। ঈশ্বর-অবতারের দক্ষিণেশ্বর-লীলাবিলাসে ভক্তগণ 'আপন হতে আপন' ভাবে পেয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ, জেনেছেন কালশক্তি কালীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রামকৃষ্ণ-অবতার, বুঝেছেন অবতার এসেছেন তারণ করতে। আবার ভাগ্যবান কোন কোন ভক্ত প্রাণে প্রাণে বুঝেছেন শ্রীরামকৃষ্ণই ভাবরূপে কালী,৩৩ মহাকালী, কালনিয়ন্ত্রণকর্ত্রী 'এই ভাবরূপ ও বাস্তবরূপের মাধুর্যমণ্ডিত সমন্বয় ঘটেছে রামকৃষ্ণকালী-বিগ্রহের মধ্যে। রামকৃষ্ণ-আধারে আধারবাসিনী কালীর আবির্ভাব অধ্যাত্মলীলাবিলাসে এক অভিনব ব্যঞ্জনা। গভীর আনন্দে প্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ জীবন্ত রামকৃষ্ণকালীকে ভক্তিসুধা খাইয়ে...তৃপ্ত করেন, আপন মনে।' ভক্তগণ

৩২ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৩৬-৩৭

৩৩ এর সমর্থনে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমা ভাবচক্ষে

নিজেরা কৃতকৃতার্থ হন, ভবিষ্যতের জন্য উপহার দিয়ে যান অতুলনীয় রামকৃষ্ণ-কালীমূর্তি—অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি। এই অপরূপ মূর্তি প্রত্যক্ষ করে কালীভক্ত গেয়েছেন—

দেখি মা তোর রূপের ছবি, (ওমা) এমন রূপ ত আর দেখিনি।
ভয়ঙ্করা, রুধিরধারা, নয় অসিধরা ত্রিনয়নী॥ (আমার মা)
রণবেশে ডরে ছেলে, সে সাজ কি তাই লুকাইলে,
সন্তানে অভয় দিলে, ওমা বরাভয়-প্রদায়িনী!
কি দোষে ভোলারে ভুলে, (ওমা) রাখনি আজ পদতলে,
শিরকে ফেলে বুঝি শিবে, (আজ) দিলে আমায় চরণ দুখানি॥ ৩৪

দেখেন, মা কালী ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে বলছেন, 'ওর ঐটের জন্য আমারও হয়েছে।' দেখেন মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।১০৬)। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা আর্তনাদ করে উঠেন 'মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো!' (লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬২)। "ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বছর পয়লার দিন কাশীপুরে উপস্থিত হয়ে ঠাকুরকে বলেন, 'আজ পয়লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হ'ল না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন—তাঁকে দর্শন করতেই হবে'।" (কথামৃত ৩।২৬।২)

৩৪ বিজয়নাথ মজুমদার: রামকৃষ্ণলীলা। (তত্ত্বমঞ্জরী, ত্রয়োদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবিলাসের একটি চিহ্নিত দিন। 'সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন', ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ হয়েছেন। আর সকল অবতারেই সেই এক ভগবান। অবতার জগদ্‌গুরু, অবতার আসেন তারণ করতে। অবতার-শরীরে দেব ও মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মিলন। প্রায়ই অবতারপুরুষের শরীরমনের বাঁধ অতিক্রম করে তাঁর অমানুষী দৈবীশক্তির স্ফুরণ ঘটে। আলোচ্য দিনটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দৈবীশক্তি অসাধারণভাবে অপাবৃত করে ভক্তগণকে অকৃপণহস্তে কৃপা করেছিলেন, তাঁর দয়াঘনস্বরূপ প্রকট করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "১লা জানুয়ারী। ইতিপূর্বে রাজ-বর্ষের প্রথম দিবস বলিয়া ইহা আমাদের নিকট আনন্দের দিবস বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের দিন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। ঐ শুভদিনে পতিতপাবন দীনবন্ধু রামকৃষ্ণদেব, সাধন-ভজন-বিহীন, দীনহীন পতিতদিগের প্রতি সদয় হইয়া কল্পতরুরূপে করুণাধারা বর্ষণ করতঃ কলির কলুষরাশি পরিপূর্ণ জীবদিগকে কৃতার্থ করিয়া 'তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। অভয়দাতা দীননাথের এ আশীর্বাদ চিরকাল ফলবতী থাকিবে"।১

স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন, "ঐরূপ উচ্চাবস্থায়…'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত।…তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুই কি চাস?'—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে

১ নরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত '১লা জানুয়ারী', তত্ত্বমঞ্জরী, পৃঃ ২১৬

ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে।"[২]

সেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরুর ন্যায় ভক্তদের অপূর্ণ বাসনা পূরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' নাম সার্থক করে ভক্তজনকে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছিলেন। সেদিন ছিল তাঁর 'পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন', সেদিনকার বিশেষ লীলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লীলাময় ভগবান তাঁর 'লীলারহস্য পরিসমাপ্ত' করেছিলেন। ভক্তপ্রিয় ভগবানের কল্পতরুরূপটি ভক্তজনের বিশেষ প্রিয়। সেইকারণে দিনটির নামকরণ হয়েছে 'কল্পতরুদিবস।'[৩]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী আলোচ্য দিনটি সম্বন্ধে লিখেছেন:

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে॥[৪]

অচিন গাছের মতই অবতারকে জনকয়েক গুণধর ব্যক্তি ভিন্ন অপরে চিনতে জানতে পারে না। কিন্তু তিনি যখন দয়াপরবশ হয়ে তাঁর দয়াঘনস্বরূপটি সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরেন, তখন আর কারোরই দ্বিধা সংশয় থাকে না। আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর আত্মপরিচয় প্রদান করেছিলেন, তাঁর অমানুষী দিব্যশক্তি দেহমনের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে উপচিয়ে পড়েছিল। অবতারের আত্মপ্রকাশলীলা বা হাঁড়িভাঙা রঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এই দিনটির লীলা-ঐশ্বর্য ভক্তগণকে সর্বদা আকৃষ্ট করে।

এই ধরনের বিভুবিলাসে যে চিচ্ছক্তির বিস্ফুরণ ঘটে তার সংস্পর্শে চৈতন্যোদয় হয়, চৈতন্যোদয়ের সঙ্গে স্বরূপানন্দ উপস্থিত হয়। আলোচ্য

---

২ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৭-১৮

৩ ইহা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের অভিমত। (রামচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য।)

৪ অক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৬১৩

দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যস্পর্শ বা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উপস্থিত ভক্তদের হৃদয়ে চৈতন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে পরমানন্দ ঢেলে দিয়েছিলেন। 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'—কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে তিনি বিশ্বজনের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। তিনি পৌরাণিক কল্পতরুর মত ভালমন্দ-নির্বিচারে প্রার্থীর সব প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের মত তিনি শুধুমাত্র অপরের কল্যাণ সম্পাদন করেন। আলোচ্য দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বব্যাপী কল্যাণশক্তি সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন, মানুষ-সত্তায় অনুস্যূত দেবত্বকে উদ্বোধিত করে আশ্রিত-জনকে নিঃশ্রেয়সকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সর্বপ্রকারে অভয় দান করেছিলেন। সেইকারণে রামকৃষ্ণজীবনীর ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ সেদিনকার ঘটনার মধ্যে আবিষ্কার করেন, "ঠাকুরের অভয়প্রকাশ[৫] অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান।"[৬]

দেবত্ব ও মানবত্বের সংমিশ্রণে অবতারের জীবন। অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব মেশানো থাকায় অবতার জীবনের ঘটনা অনেক সময়েই রহস্যাবৃত। আপাত-ব্যাপারের ন্যায় সে-সকল ঘটনার তাৎপর্য সব সময়ে যুক্তির নিক্তিতে তৌল করা যায় না, ঘটনার কার্য-কারণ বুদ্ধির দর্পণে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভবের স্পষ্টতা ও তীব্রতা ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করতে দেয় না। তা ছাড়াও অনুভবকারীর অভিজ্ঞতা

৫ স্বামী সারদানন্দের মতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থীর নিকট শুধুমাত্র নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ঈশ্বরাবতাররূপে উপস্থিত হননি। তিনি বলেন, "...তাঁহাদের (ঈশ্বরাবতারদের) অনুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলিয়া নির্ধারণ করিলে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া মানবকে আশা ভরসা ও বিশেষ-শক্তি-সম্পন্ন করে। তাঁহাদের উচ্চগতি দেখিয়া মানব আপনার উচ্চ-গতিতে বিশ্বাসবান হয় এবং সেও সেই বংশপ্রসূত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলিয়া আত্মনিহিত শক্তিতে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে।" (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, পৃঃ ৬৫৬-৫৭) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ দিনে ভক্তগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করে তাদের কল্যাণমার্গে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন।

৬ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৯৬

ও অনুস্মরণের প্রভা ঘটনাকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। ইংরেজী বছর পয়লাতে ঘটনায় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও সংগৃহীত সাক্ষ্য অনুসরণ করে আমরা অভূতপূর্ব প্রতীত ব্যাপারটির রসাস্বাদনের চেষ্টা করব।

পটভূমিকায় দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গলরোগের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় শ্যামপুকুরে একটি ভাড়াবাড়ীতে বাস করছিলেন। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঘোষণা করেছিলেন, গলরোগ দুরারোগ্য কর্কটরোগ। স্বরভঙ্গের লক্ষণ দেখা দেয়, শরীর অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে দ্বিতীয়বার স্থান-পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে ৯০ নং কাশীপুর রোড ঠিকানায় প্রায় চৌদ্দ বিঘা জমির উপর একটি বাগানবাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিন পূর্বে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর) অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে বাস করতে থাকেন।

"...নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতাবাসের পর ঠাকুরের নিকট উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।"[৭]

নূতন পরিবেশে ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেল। "কাশীপুরে আসিবার কয়েকদিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন।...ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু...ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্যকারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই-তিন দিনেই কাটিয়া যাইল,...উহা (কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া) ব্যবহারে কয়েকদিনেই...দুর্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষকাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল

৭ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮০

বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও—ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"৮

কাশীপুর এসে ঠাকুর চার-পাঁচ দিন পরে একবার বাগানে পায়চারি করেছিলেন, তারপর প্রায় পনেরো দিন উদ্যানবাড়ীর দোতলায় আবদ্ধ হয়েছিলেন।৯ ইতিমধ্যে চিকিৎসার না হলেও চিকিৎসকের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। "কলিকাতার বহুবাজার পল্লীবাসী…রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা শহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন।… মহেন্দ্রলাল সরকার উহার সহিত মিলিত হইয়াই…ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।… রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং… লাইকোপোডিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।"১০

সে সময়ে একদিন১১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ।" এভাবে অন্তরঙ্গ বাছাই হতে থাকে, সেইসঙ্গে নীরবে নিভৃতে তাঁদের বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা সাধন ভজন চলতে থাকে। ঠাকুর বলতেন, "ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক্। এক থাক্ বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর!' আর এক থাক্, তারা অন্তরঙ্গ ; তারা ওকথা বলে না।

৮ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৮৬

৯ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৮ উল্লেখ আছে, "ঠাকুর কিন্তু এখানে (কাশীপুরে) আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ (১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬) শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" আবার লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ খণ্ডে ৩৮৬ ও ৩৯২ পৃষ্ঠায় দুবার উল্লেখ পাই যে, ঠাকুর কাশীপুর বাগানে আসার কয়েকদিন পরে, সম্ভবতঃ ১৫।১৬ই ডিসেম্বর একদিন বাগানে পায়চারী করেন। আমরা সারদানন্দজীর দ্বিতীয় মত যুক্তিগ্রাহ্য বলে গ্রহণ করেছি।

১০ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, ৩৯২-৯৩

১১ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫

তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল ; প্রথম আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে ! তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?"১ অন্তরঙ্গ ভক্তদের এই জানাজানির প্রচেষ্টায়, তাঁদের অন্তরের অনুরাগের অভিব্যক্তিতে কাশীপুরের দিনগুলি সমুজ্জ্বল। 'শ্রীম' ঠাকুরকে বলেন, "পাঁচ বছরের তপস্যা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।" কিন্তু তাঁদের ধ্যান ভজন পাঠ সদালাপ শাস্ত্র-চর্চাদি ছিল গৌণ, তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য প্রাণ-প্রতিম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা। অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রায় বার জন যুবক ঘর সংসার ভুলে নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের সেবাযত্নে মন প্রাণ ঢেলে দেন। তাঁদের সেই সময়কার মনের ছবিটি ফুটে উঠেছে বীর ভক্ত নিরঞ্জনের উক্তিতে। তিনি বলেন, "আগে, (ঠাকুরের প্রতি) ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।"১৩ গৃহী ভক্তগণও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার যাবতীয় অর্থব্যয়ের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবাকাজে সাহায্য করতে থাকেন। পথ্য প্রস্তুত করা ইত্যাদির দায়িত্ব নেন শ্রীমাতাঠাকুরানী। তাঁকে সাহায্য করেন লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীভক্তগণ। এইভাবে ঠাকুরের ব্যাধির চিকিৎসা ও তাঁর সেবাযত্নের সুব্যবস্থা হওয়াতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। চিকিৎসক ও ভক্তগণের মনে আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব-ঘোষিত লক্ষণগুলি, যেমন ঠাকুরের কলকাতায় রাত্রিবাস, যার-তার হাতে আহার করা, অপরকে প্রদত্ত আহারের শেষাংশ-গ্রহণ, শুধুমাত্র পায়েস খেয়ে থাকা, ইত্যাদি লীলাবসানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু অপ্রিয় রূঢ় বাস্তবকে মন সহজে মানতে চায় না। সমাগত দিনমণির অবসান ভুলে মানুষ বিচিত্র বর্ণময়ী দিনমণির অস্তরাগের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। তেমনি অবতারপুরুষের অন্ত্যলীলায় চিৎশক্তির ঐশ্বর্য, আনন্দ-প্রভার বিচ্ছুরণ ভক্তগণকে মুগ্ধ করে রাখে।

কালব্যাধিতে ঠাকুরের সুঠাম দেহের দ্রুত অবক্ষয় চিকিৎসক ও সেবক ভক্তগণের অনেকের চিন্তার কারণ হয়। কিন্তু আনন্দপুরুষ ঠাকুরের সেদিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। "এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি সদা

১২ কথামৃত ৪।১৪।১

১৩ কথামৃত ৪।৩১।১

হাস্তাননে সহ্য করিতেন। একদিনও বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, 'দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।"১৪ জলভারে চঞ্চল মেঘমালার ন্যায় করুণার দায়ে ভারগ্রস্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে ত্রিতাপ, সন্তাপ থেকে শান্তি দেবার জন্য সদা ব্যগ্র। তাঁকে দেখে স্বতঃই মনে হত একমাত্র "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়"১৫ তাঁর জীবনধারণ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার ঠাকুরের এই সময়কার মনোভাবটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, "(ঠাকুরের) এতো অসুখ—কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোন-না-কোন ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।"

অবতারের স্বরূপ অধিকাংশের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে। ঠাকুর নিজেই বলতেন, "তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন কাঙালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।"১৬ কিন্তু কাশীপুর উদ্যানে অবতারপুরুষ যে প্রেমের হাট বসান, তার রসমাধুর্য আস্বাদন করতে কারোরই অসুবিধা হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে প্রেমদান করতে থাকেন। কৃপাস্পর্শে ভক্তদের চৈতন্যবান করতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের বিবরণীতে কথামৃতকার লিখেছেন, "আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বলছেন, 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।' কালীপদর১৭ বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, 'চৈতন্য হও' আর চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।' আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরেও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া

১৪ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪

১৫ মহাবস্তু অবদানম্, Sanskrit College, Calcutta, Vol. II, p. 193

১৬ কথামৃত ৩।১৯।৩

১৭ কালীপদ ঘোষ কাগজ-বিক্রেতা জন ডিকিন্সন কোম্পানীতে কাজ করতেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার ফলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। রামকৃষ্ণ-পরশমণি তাঁর জীবনকে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করেছিল। ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ নবযুগের জগাই-মাধাই বলে পরিচিত ছিলেন।

তাহাদের বক্ষ চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন; একজন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দয়া!' প্রেমের ছড়াছড়ি। সিঁথির গোপালকে[১৮] কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, 'গোপালকে ডেকে আন।" সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর বলছেন, "লোক-শিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।" সমাধি-ভঙ্গের পর বলেন, "দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে।·· এখনও দেখছি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই রকম করে রয়েছে!···"

উর্জিতা প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে চতুর্দিকে প্লাবন। প্রেমদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমবিতরণের জন্য ব্যাকুল। প্রেমবিতরণ যেন তাঁর এক বিষম দায়। তিনি আপনমনে গাইতেন,

> এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়।
> যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়।
> হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
> বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া একি দায়॥[১৯]

তিনি দক্ষিণেশ্বরে কুঠীবাড়ীর উপর থেকে আরতির সময় ব্যাকুলভাবে ডাকতেন, 'ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়।' শুদ্ধ ভক্ত নিয়ে আসার জন্য জগজ্জননীর কাছে বারংবার প্রার্থনা জানাতেন। একদিন যুবক ভক্ত লাটু খতিয়ে দেখেন মাত্র একত্রিশ জন যোগ্য পাত্র জুটেছেন। শুনে প্রেম-দাতা শ্রীরামকৃষ্ণ যেন অনুযোগ করে বলেন, "কৈ, তেমন বেশী কৈ?"[২০] 'প্রেমপাথার' শ্রীরামকৃষ্ণের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ভক্ত গিরিশচন্দ্র। তিনি বলেন, "একদিন পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া দেখি তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, নিতাই আমার হেঁটে হেঁটে ঘরে ঘরে প্রেম দিয়েছিলেন, আমি কি না গাড়ী না হলে চলতে পারি না। আর একসময়ে বলেছিলেন, আমি সাগু খেয়েও পরের উপকার করব।"[২১] মানুষকে প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে আসেন,

১৮ পরবর্তীকালে ইনিই স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে পরিচিত হন।

১৯ পুঁথি, পৃঃ ৩২১

২০ কথামৃত ২.৪।২

২১ Minutes of the 14th meeting of the Ramakrishna Mission Association held on 25.7.1897

তাছাড়া "অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়।" ভগবৎ-প্রেম-আস্বাদনের স্বরূপ প্রকট করেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী।

সেদিন শুক্রবার, ১৮ই পৌষ, কৃষ্ণা একাদশী তিথি। নির্মল আকাশ, শীতের সূর্য প্রীতি বিকিরণ করছে, অনেকদিন পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বেশ কিছুটা সুস্থ ও প্রফুল্ল বোধ করছিলেন। অবতার-গোমুখ হতে যে করুণাগঙ্গা নিয়ত ক্ষরিত হচ্ছিল আজ সকালবেলাতেই তা শতধারায় ঝরতে থাকে। ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাঘন কৃপামূর্তি ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥২২

"পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফী[২৩] পরিত্রাণের জন্য পরমহংসদেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারীর দিন হরিশ পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে যান নীচে। অশ্রুপূর্ণলোচনে উপরোক্ত সেবককে বলেন, 'ভাই রে, আমার আনন্দ যে ধরে না! একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।' সেবকেরও চক্ষে জল আসে। তিনি বলেন, 'ভাই, প্রভুর অপূর্ব মহিমা'।"[২৪]

শুধু যে হরিশ বিস্মিত হয় তা নয়, উপস্থিত ভক্তগণ হরিশের হরিষ দেখে মুগ্ধ হন। "উথলিত কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন।" তিনি কৃপা দান করতে উন্মুখ। তিনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন রামদত্ত প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বাড়ীর নীচে হলঘরে সদালাপ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ঘর থেকে ফিরে এসে উপস্থিত ভক্তগণকে জানালেন, "পরমহংসদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাম যে

২২ পুঁথি, পৃঃ ৬১৩

২৩ ইনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতুল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মানুষ যারা জ্যান্তে মরা যেমন হরিশ। ইনি জাতিতে তিলি, বৃত্তিতে ব্যায়াম-শিক্ষক, বাড়ী কলকাতার গড়পার। আকৃতি লৌহসদৃশ, প্রকৃতি ছিল অতি কোমল।

২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫

আমায় অবতার বলে, একথা তোমরা স্থির কর দেখি। কেশবকে তাঁহার শিষ্যরা অবতার বলিত'।" 'একথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল। কথার সুগূঢ় মর্ম কথায় রহিল॥"

আজ বছর ১লা ছুটির দিন। ঠাকুর দুপুরে আহারের পর সামান্য বিশ্রাম করে উঠেছেন। একে একে বেশ কয়েকজন ভক্ত বাগানবাড়ীতে উপস্থিত। মধ্যাহ্নের পর উপস্থিতের সংখ্যা ত্রিশ ছাড়িয়ে যায়। ভক্তেরা দলে দলে ভাগ হয়ে নীচে হলঘরে বসেছিলেন, উদ্যান-প্রাঙ্গণে শীতের মিঠে রোদ উপভোগ করছিলেন, বা গাছের ছায়ায় বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামৃত আলোচনা করছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের কয়েক জনের নাম লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন: "গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন।" পুঁথিকার এঁদের অতিরিক্ত উপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও রাঁধুনী ব্রাহ্মণ 'গাঙ্গুলি'র উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্বামী অভেদানন্দ,২৫ ভাই ভূপতি ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ২৬, 'হরিশ ভাইয়ের' উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে যাঁরা আজীবন ত্যাগব্রত অবলম্বন করেছিলেন সে-সকল অন্তরঙ্গ ভক্তদের কেউ সেদিনকার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি। আবার ত্যাগী বা গৃহী কোনও স্ত্রীভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায় না। তাছাড়াও দেখা যায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে ঠাকুরের নিকট সুপরিচিত; রবাহূত বা সদ্যপরিচিত কাউকে দেখা যায় না।

তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর রামলালকে ডেকে বললেন, "দেখ্ রামলাল, আজ ভাল আছি বলে মনে হচ্ছে, তা চল্ একটু নীচে বেড়িয়ে আসি।"২৭ ঠাকুরের পরনে ছিল একটি লালপেড়ে ধুতি, একটি সবুজ

২৫ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৪

২৬ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫২

২৭ কমলকৃষ্ণ মিত্র: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ (রামলালদাদার স্মৃতি থেকে সংগৃহীত), পৃঃ ৩৫; লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে (পৃঃ ২৫২) পাই, "তিনি রামলালদাদার সঙ্গে উপর থেকে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন।"

রংয়ের পিরান, লালপাড় বসানো একখানি মোটা চাদর, সবুজ-রংয়ের কানঢাকা টুপি, পায়ে মোজা ও ফুল-লতা আঁকা চটিজুতা, হাতে একটি ছড়ি। রামলাল তাড়াতাড়ি একখানি চাদর গায়ে জড়িয়ে নেন। তিনি এক হাতে গামছা গাড়ু নিয়ে ঠাকুরকে ধরে উপর থেকে নীচতলায় নিয়ে আসেন।২৮ ঠাকুর নীচের হলঘরটি ভাল করে দেখেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন যুবকভক্ত গতরাত্রিতে ঠাকুরের সেবা অথবা সাধনভজনের জন্য রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত থাকায় হলঘরের পাশে ছোট ঘরটিতে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠাকুর হলঘরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুরকির রাস্তা ধরে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। ঠাকুরকে হঠাৎ নীচে নামতে দেখে কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের পিছু নেন। সেবক লাটু এতক্ষণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন,২৬ ভক্তদের অনুসরণ করতে দেখে তিনি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর দক্ষিণপাড় পর্যন্ত এসে ফিরে যান। তিনি অপর এক যুবক ভক্ত শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের বসবাসের ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করেন ও বিছানাপত্র রৌদ্রে দেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বেড়াতে দেখে ভক্তদের আজ বিশেষ আনন্দ। কেউ ছুটে এসে তাঁকে প্রণাম করেন, কেউ বা চুপচাপ তাঁকে অনুসরণ করেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের তখন প্রবল অনুরাগ। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, "মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত। যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নই—হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য—ঈশ্বর আশ্রয়দাতা—এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য। এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিনযামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব,—পরম সাহস—পরমাত্মীয় পাইয়াছি—আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যুভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।"৩০ ঠাকুরও তাঁর ভৈরবভক্ত গিরিশ সম্বন্ধে বলতেন, "গিরিশের

২৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫

২৯ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১১৯-২০

৩০ কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ১৭০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশ বক্তৃতাবলী।

পাঁচসিকে পাঁচ-আনা বিশ্বাস।" গিরিশ ঠাকুরকে ঈশ্বরের৩১ অবতারজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁর মহত্ত্ব বলে বেড়াতেন। রামদত্ত, অতুল প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে গিরিশ পশ্চিমের একটি আমগাছের তলায় বসে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ে আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন। তাঁরা দেখেন,

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার।
বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার॥

*　　*　　*

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥
মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।
নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি॥৩২

৩১ রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্দশ অধিবেশনে গিরিশচন্দ্র ভাষণ দেন, "...আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন। আমি কখনও বন্ধু পাই নাই কিন্তু তিনি আমার পরমবন্ধু, যেহেতু আমার দোষ তিনি গুণে পরিণত করিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা আমায় বেশী ভালবাসিতেন।"

৩২ পুঁথি, পৃঃ ৬১৪। উপস্থিত রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। (সেইরূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সঙ্কীর্তনের সময় দেখা গিয়াছিল)' পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৫।

বসতবাটী ও ফটকের মাঝামাঝি ঠাকুর পৌছলে গিরিশ, রাম প্রভৃতি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। অকস্মাৎ ঠাকুর গিরিশকে বলেন, "তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?" গিরিশের অগাধ বিশ্বাস। তিনি এই আকস্মিক প্রশ্নে বিচলিত হন না। তিনি সসম্ভ্রমে রাস্তার উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে জানু পেতে উপবিষ্ট হয়ে করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি!" গিরিশের উক্তির প্রতি ছত্রে তাঁর অন্তরের সরল বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়। গিরিশের এই অপরূপ স্তব ঠাকুরের দৈবী কল্যাণী শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। দেখা গেল ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। শরীর স্পন্দনহীন, নয়ন স্থির! মুখে দিব্য হাসির ঝলক। বাহ্যশূন্য। আর সে মানুষ নয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই দেখেন, ঠাকুরের রূপমাধুর্য যেন শতগুণে বেড়েছে। মহা উল্লাসে গিরিশচন্দ্র 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি দিয়ে বারবার ঠাকুরের পদরজ গ্রহণ করতে থাকেন।

অক্ষয় মাষ্টার প্রমুখ কয়েকজন 'গাছের উপর···ডালে ডালে বানর বানর' খেলা করছিলেন। ঠাকুরকে বাগানে পায়চারি করতে দেখে দৌড়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হন। অক্ষয় মাষ্টারের হাতে ছিল দুটি জহরচাঁপা ফুল। সমাধিস্থ ঠাকুরকে দেখে ভাবের আবেগে—

"পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশা দেখা গেল। তিনি সহাস্যবদনে উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হয়ে—

"ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায়॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি॥"

প্রেমবিহ্বল ঠাকুর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে দিব্যশক্তিপূত আশীর্বাণী ভক্তদের অন্তরে আলোড়ন তোলে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তারা যেন স্থান কাল ভুলে যায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে কেউ জয়ধ্বনি দেয়, কেউ গাছ থেকে ফুল তুলে ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেয়, কেউ বা

পুষ্পবৃষ্টির মত ফুল উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়, ঠাকুরের পদধূলি নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ঠাকুর আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তারা ঠাকুরের দিব্যদেহ স্পর্শ করবে না যাদের এই সঙ্কল্প ভুলে যান। তাদের বোধ হয় যে, তাদের দুঃখে দরদী কোন দেবতা তাদের কল্যাণের জন্য আশ্রয়দানের জন্য সস্নেহে আহ্বান করছেন। প্রথম ব্যক্তি ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করে দাঁড়াতেই ঠাকুর ভাবাবস্থায় তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে নীচ থেকে উপরের দিকে হাত চালনা করে বলেন, 'চৈতন্য হোক্'। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রণাম করলে তাঁকেও অনুরূপ কৃপা করেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে, চতুর্থ ব্যক্তিকে, একে একে সমাগত সব ব্যক্তিকে তিনি ঐরূপ দিব্যস্পর্শ দান করলেন।৩৩ "আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।"৩৪ সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় হারাণচন্দ্র

৩৩ স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' পৃঃ ৩৩৫, লিখেছেন, "কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্দ্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন।"

৩৪ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১২২।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আরেকটি চিত্র পাই ভগিনী নিবেদিতার লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন,

"...a story was told me by a simple soul, of a certain day during the last few weeks of Sri Ramakrishna's life, when he came out into the garden at Cossipore, and placed hand on the heads of a row of persons, one after another, saying in one case, 'Aj thak' 'To day let be?' in another, 'chaitanya hauk!' 'Be awakened!' and so on. And after this, a different

দাস৩৫ ঠাকুরের পদধূলি পরমভক্তিভরে গ্রহণ করেন। ঠাকুরকে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম স্থাপন করেন। ধন্য হারাণচন্দ্র! দেখে মনে হয়, পুরাকালে যেমন নারায়ণ গয়শিরে পদার্পণ করে পিতৃপুরুষদের মুক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিলেন, সেরকম আজ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধররূপে ভক্তকে কৃপাদান করে কাশীপুরকে মহাতীর্থে পরিণত করলেন। কিছু সময়ের মধ্যে ঠাকুরের ভাবের উপশম হয়। এভাবে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের মাতিয়ে নাচিয়ে কাঁদিয়ে হাসিয়ে নিজে হাসতে হাসতে ভবনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ে অক্ষয় মাষ্টারের উপর। অক্ষয় মাষ্টার লিখেছেন,

gift came to each one thus blessed. In one there awoke an infinite sorrow. To another, everything about him became symbolic, and suggestive ideas. With a third the benediction was realised as over-welling bliss. And one saw a great light, which never thereafter left him but accompanied him always everywhere, so that never could he pass a temple, or a wayside shrine without seeming to see there, seated in the midst of this effulgence,—smiling or sorrowful as he at the moment might deserve—a Form that he knew and talked of as "the spirit that dwells in the images."

—The Complete works of Sister Nivedita, Vol. I

৩৫ হারাণচন্দ্র বেলেঘাটায় বাস করতেন। তিনি কলকাতায় ফিনলে মিওর কোম্পানীর অফিসে কাজ করতেন। স্বামী সারদানন্দ এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটির প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপাদান সম্বন্ধে লিখেছেন, "ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি।" হারাণচন্দ্র প্রতিবৎসর এই দিনে মহাকৃপার স্মরণোৎসব করতেন।

পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে।
দাঁড়ায়ে আছিনু মুই অনেক তফাতে ॥৩৬
দূরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিয়া বক্ষের উপরে ॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্রবাক্য তাই রাখিনু গোপনে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥৩৭

অক্ষয় মাষ্টার এই অপ্রত্যাশিত ও দুর্লভ স্পর্শের আবেগ যেন সহ্য করিতে পারেন না। কৃষ্ণকায় কদাকার অক্ষয় সেনের (যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ আদর করে ডাকতেন শাঁকচুন্নী) দেহ বেঁকে চুরে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন।৩৮

৩৬ 'কথামৃতে' (৩।১৩।৪) জানা যায়, দেবেন মজুমদারের বাড়ীতে অক্ষয় মাষ্টার ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পদসেবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে প্রচলিত ছিল যে ঠাকুর তাঁর শ্রীঅঙ্গ অক্ষয় মাষ্টারকে স্পর্শের অধিকার দিতেন না। তার জন্য অক্ষয় মাষ্টারের খেদের শেষ ছিল না, তিনি তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা' (পৃঃ ৩৩-৩৪) পুস্তকে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার করতেন, এমন যদি অন্য কোন লোকের সঙ্গে হ'তো, তা হ'লে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেত না।...আমার বাপকে আমি যেমন ভয় করতাম, ঠাকুরকেও তেমনি ভয় করতাম।" আলোচ্য দিনে ভক্তরা যখন ঠাকুরের পদধূলি নিতে ব্যস্ত, অক্ষয় মাষ্টার সে-সময়ে ভয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৭ পুঁথি, পৃঃ ৬১৫

৩৮ অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন, "রামকৃষ্ণদেব এখন আমাকে যা দেখিয়েছেন, যা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখতে পেয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, তিনিই সেই ভগবান, ভগবানের অবতার, দুনিয়ার মালিক, সর্বশক্তিমান সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই কালী, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—মনবুদ্ধির অতীত আবার মনবুদ্ধির গোচর।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহিমা, পৃঃ ১৮)

ইতিমধ্যে কৃপাধন্য রামচন্দ্রদত্ত নবগোপাল ঘোষকে গিয়ে বলেন, "মশায়, আপনি কি করছেন—ঠাকুর যে আজ কল্পতরু হয়েছেন। যান, যান, শীঘ্র যান। যদি কিছু চাইবার থাকে তো এই বেলা চেয়ে নিন।" নবগোপাল দ্রুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলেন, "প্রভু, আমার কি হবে?" ঠাকুর একটু নীরব থেকে বলেন, "একটু ধ্যান জপ করতে পারবে?" নবগোপাল উত্তর দেন, "আমি ছা-পোষা গেরস্ত লোক; সংসারের অনেকের প্রতিপালনের জন্য আমার নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আমার সে অবসর কোথায়?" ঠাকুর একটু চুপ করে আবার বলেন, "তা একটু একটু জপ করতে পারবে না?" উত্তর—"তারই বা অবসর কোথায়?" "আচ্ছা, আমার নাম একটু একটু করতে পারবে তো?" উত্তর—"তা খুব পারব।" ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে বলেন, "তা হলেই হবে—তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" তারপর উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ মজুমদার। "উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন। লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন।" তারপর কৃপালাভ করেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "আমি ভাই ঠাকুরের পিছনে দাঁড়িয়ে ভাবছি যে, সকলের ত একরকম হ'ল, আমার কি গাড়ু গামছা বয়া সার হ'ল? একথা যেমন মনে হওয়া তিনি অমনি পিছন ফিরে বললেন, 'কিরে রামলাল, এত ভাবছিস কেন? আয় আয়।' এই বলে আমায় সামনে দাঁড় করালেন, গায়ের চাদর খুলে দিলেন। বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন—'দেখ্ দিকিনি এইবার'।" রামলাল বলেন, "আহা, সে যে কি রূপ, কি আলো জ্যোতি! সে আর কি বলব।"[৩৯] তিনি স্বামী সারদানন্দকে আরও বলেন, "ইতিপূর্বে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না; অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর ইষ্টমূর্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।"[৪০] তারপর কৃপালাভ

৩৯ শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গপ্রসঙ্গ (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৩৫

৪০ লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২৬-২৭

করেন গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুলকৃষ্ণ ও কিশোরী রায়।৪১ ইতিমধ্যে ভাই ভূপতি ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে সমাধি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করে আশীর্বাদ করেন, "তোর সমাধি হবে।"৪২ তারপর উপস্থিত হন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত উপেন্দ্রনাথ নীরবে প্রার্থনা জানান অর্থসাচ্ছল্যের জন্য। ঠাকুর তাঁকে কৃপা করে বলেন, "তোর অর্থ হবে।"৪৩

ঠাকুরের দিব্যশক্তিস্পর্শে কয়েকজন কৃতকৃতার্থ হবার পর বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানান, "মশায়, আমায় কৃপা করুন।" ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠ ইষ্টদর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের কাছে কয়েকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকবার ঠাকুর তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হোক্। তারপর তোর সব করে দিব।" এখন ঠাকুর প্রসন্নভাবে তাঁকে বলেন, "তোর তো সব হয়ে গেছে।" বৈকুণ্ঠ প্রার্থনা জানান, "আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয় হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যাতে অল্পবিস্তর বুঝতে পারি তা করে দিন।" "আচ্ছা" বলে ঠাকুর ক্ষণেকের জন্য বৈকুণ্ঠের হৃদয় স্পর্শ করেন ও বলেন,

৪১ কৃষ্ণনগরের লোক, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের বন্ধু। দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখাতে নরেন্দ্রনাথ তাকে ডাকতেন আবদুল! বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন, "একে একে রামলালদাদা. অতুলচন্দ্র, কিশোর, অক্ষয়-মাষ্টার প্রভৃতি অনেকের হৃদে 'জাগ জাগ' বলিয়া হস্তপ্রদান করিলে ···তাহাদের চিত্ত তদ্রূপ হইয়া সর্বদেবময় তনু প্রভুতে স্ব স্ব ইষ্টরূপ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল।" লীলামৃত, পৃঃ ১৯৯

৪২ স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৩

৪৩ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা লিখেছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। "সে (উপেন্দ্রনাথ) যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তখন একদিন ঘরভরা ভক্তদের মধ্যে ঠাকুর অঙ্গুলি-নির্দেশে উপেনকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ছেলেটি আমার কাছে কিছু অর্থ কামনা করে আসে যায়।" (স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৮২) শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পূর্ণ হয়েছিল। তিনি উত্তরকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্রষ্টা ও মালিকরূপে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন ও তাঁর সম্পদের সদ্ব্যবহার করেন।

"মা, জাগ জাগ।" "অমনই সে তাহার অন্তর-বাহিরে, পুত্তলিবৎ ভক্ত-মণ্ডলীমধ্যে, উদ্যানের পাদপপত্রে ও গগনে সর্বময় শ্রীরামকৃষ্ণরূপ দেখিয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। পাণ্ডুরোগে আঁখিতে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রাভ দেখায়, তাঁহার ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। ক্ষণিক আবেগে এক আধ ঘণ্টা বা একদিন নহে, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয় এইরূপ দর্শনে সে যেন উন্মাদের মত হইয়াছিল।"৪৪ বৈকুণ্ঠ প্রবল আনন্দে অধীর হয়ে উঠেন। সে সময়ে শরৎ লাটু প্রভৃতিকে ছাদে দেখতে পেয়ে তিনি 'কে কোথায় আছিস্ এই বেলা চলে আয়' বলে চীৎকার করে ডাকতে থাকেন। ঠাকুর তাঁকে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করেন। ইতিপূর্বে আনন্দে উন্মত্ত গিরিশ ও রাম চীৎকার করে ভক্তদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কে কোথায় বাদ পড়ে গেল, সেই খোঁজে গিরিশ রান্নাঘরে যান, দেখেন পাচক ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলি রুটি বেলতে বসেছে। গিরিশ তাকে টেনে নিয়ে ঠাকুরের সামনে উপস্থিত করলেন, দয়াময় ঠাকুর তার প্রতি কৃপা করেন।৪৫

"... কয়েকজনের পরিত্রাণ হইলে, হরমোহন মিত্রকে৪৬ সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তিনি হরমোহনকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'তোমার আজ থাক্।' (ইতিপূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পরমহংসদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছিল; কিন্তু সেবারেও 'এখন থাক,' বলিয়াছিলেন।")৪৭ মহানন্দের দিনে কৃপালাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি বিমর্ষ হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁকে ও আজকের দিনে কৃপা-বঞ্চিত অপর এক ব্যক্তিকে স্পর্শ করে কৃপা করেছিলেন। উত্তরকালে হরমোহন জনৈক ভক্তকে বলে-ছিলেন যে, ঠাকুরের দিব্যস্পর্শের ফলে তাঁর অনেক অনুভূতি লাভ হয়েছিল, তিনি ভ্রূযুগল-মধ্যে অনেক দেবদেবীর দর্শনলাভ করেছিলেন।

৪৪ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পৃঃ ১৯৯

৪৫ পুঁথি, ৬১৫

৪৬ হরমোহন সিমলাপল্লীতে তাঁর মাতুল রামগোপাল বসুর নিকট মানুষ হন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীম তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে নির্দেশ করেছেন।

৪৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৬

ভক্তদের উল্লাস ও আনন্দোচ্ছ্বাস দেখে মনে হল, 'বসেছে ক্ষ্যাপার হাট-বাজার', ক্ষ্যাপার হাটে বিনে-মাসুলে প্রেম বিকায় রামকৃষ্ণ রায়। "চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষবিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ!"[৪৮] ত্যাগী যুবক ভক্তেরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছতেই[৪৯] ঠাকুরের দিব্য ভাবাবেশ অন্তর্হিত হল, সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হল। ভক্তগণ তখনও বিস্মিত স্তব্ধ বিমূঢ়। যা ঘটে গেল তখনও তাব অনুবৃত্তি প্রত্যেকের নিজ নিজ অভিজ্ঞতায় জাজ্বল্যমান। উপস্থিত ব্যক্তিদের এই অবস্থায় ফেলে

রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান॥

নিজের ঘরে ফিরে ঠাকুর সেবক রামলালকে বলেন, 'শালাদের (সকল ভক্তদের) পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল নিয়ে আয় গায়ে মাখি।" রামলাল 'ব্রহ্মবারি' গঙ্গাজল আনলে ঠাকুর তা গ্রহণ করে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেন, তখন দেহের জ্বালার নিবারণ হয়। যুবক নিরঞ্জন সিঁড়ির দরজায় পাহারায় বসেন, ভক্তদের ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

৪৮ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃঃ ১২২

৪৯ যুবক ভক্তদের মধ্যে লাটু ও শরৎ ঠাকুরের ঘর গোছগাছ করছিলেন। লাটু ভক্তদের চীৎকার শুনেও নীচে নামেননি। পরবর্তীকালে জনৈক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি সেদিন উপর থেকে নেমে এলেন না কেন? শুনেছি সেদিন তিনি কল্পতরু হয়েছিলেন—যে যা চাইছিলো তাকে তাই আশীর্বাদ করেছিলেন।' লাটু মহারাজ উত্তর দেন, "তিনি তো আশীর্বাদ দিয়ে আমাদের ভরপুর করে দিয়েছেন। আবার কি চাইবো তাঁর কাছে?" (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫২) শরৎচন্দ্রও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কিছু প্রার্থনা না জানাবার কারণ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "পাবার ইচ্ছা তো মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন।" (ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩১১)

রামকৃষ্ণ-লীলার জটিলা-কুটিলা প্রতাপচন্দ্র হাজরা কিছুদিনের জন্য কাশীপুর উদ্যানবাড়ীতে বাস করছিলেন। ঠাকুর যখন তাঁর বরাভয়-কল্যাণমূর্তি প্রকট করেন সে সময়ে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। কৃপাবিতরণের হাটবাজার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঠাকুর নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। সে সময় হাজরা উদ্যানবাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দমেলার বিস্তারিত খবর শুনেন। অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁর খুব মনস্তাপ হয়। নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিতালি; নরেন্দ্র হাজরাকে সঙ্গে করে ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন এবং তাঁকে কৃপা করার জন্য ঠাকুরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। 'উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে। সময়সাপেক্ষ কাজে শেষেতে পাইবে॥"

সন্ধ্যার পূর্বে ভক্ত চুনীলাল বসু উপস্থিত হন। চুনীবাবু ঠাকুরের কৃপা-বিতরণের অপূর্ব কাহিনী শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ চুনীলালকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বলেন যে, হয়ত ঠাকুরের শরীর আর বেশীদিন থাকবে না। চুনীলালের প্রার্থনীয় কিছু থাকলে যেন এখনই নিবেদন করেন। দরজায় পাহারাদার নিরঞ্জনকে অতিক্রম করা অসম্ভব জেনে চুনীলাল সুযোগের অপেক্ষা করেন। এক সময়ে নিরঞ্জন কোন কাজে সরে যেতেই নরেন্দ্র ইঙ্গিত করেন, চুনীলাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। অযাচিত-কৃপাসিন্ধু ঠাকুর সপ্রেমে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি চাও?" চুনীলাল মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। ঠাকুর তখন নিজের দেহ দেখিয়ে বলেন, "এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।" তিনি ঘরের বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথকে সব জানালে নরেন্দ্র সোৎসাহে বলেন, "তবে আর আপনার ভয় কি?"[৫০]

আনন্দের হাট থেকে আনন্দ-সওদা হৃদয়ঝুলিতে পুরে গৃহী ভক্তগণ ফিরে যান। তখনও কেউ ভাবের আবেগে অধীর, কেউ আনন্দের আতিশয্যে বেসামাল, কেউ বা ঠাকুরের কৃপা-অনুধ্যানে বিভোর। এইভাবে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার কৃপাপ্রকটলীলার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু তাঁর কৃপাবিচ্ছুরন অব্যাহত থাকে। কৃপাবর্ষণে কখনও ক্ষীণ ধারা, কখনও বা প্রবল বেগ। পরের দিন ঘটনায় দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে বসে কুণ্ডলিনীর জাগরণ অনুভব করেছেন। ঠিক দুদিন পরেই ঠাকুর তাঁকে

---

৫০ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪১১

সমাধি থেকেও উচু অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা দিচ্ছেন। কৃপার মলয়-পবন অব্যাহত ধারায় বইতে থাকে।

অধ্যাত্মজগতের পরশমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে যাঁদের স্পর্শ করেছেন বা মনের কোণে ঠাঁই দিয়েছেন, উত্তরকালে তাঁদের প্রত্যেকে রূপান্তরিত হয়েছেন খাঁটি সোনায়। কৃপাবলে তাঁদের ধর্মজীবন প্রদীপ্ত হয়েছে, অধ্যাত্মশক্তির বিকাশে জীবনপথ প্রস্ফুটিত হয়ে নিজের ও বিশ্বজনের হিতসাধন করেছে। এই কৃপা কি বস্তু? কৃপার স্বরূপ বুঝতে সমর্থ একমাত্র কৃপাধন্য ব্যক্তি। কৃপাধন্য ব্যক্তিই কৃপাসাগরে ডুব দিয়ে মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।

সেদিনকার কৃপাবিতরণ-উৎসবে অন্যতম কৃতার্থ ব্যক্তি কৃপা সম্বন্ধে লিখেছেন,

> কৃপায় আনন্দ কি বা হৃদয়ে না ধরে॥
> কৃপা নহে কাড়ি পাতি নহে রাজ্যধন।
> কিংবা নহে মনোহর কামিনী কাঞ্চন॥
> সুস্বাদু ভোজন নয় নয় গাঁজা সুরা।
> নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা॥
> তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
> তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে॥
> কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার।
> ধন্য সে আধার যাহে কৃপার সঞ্চার॥[৫১]

আলোচ্য দিনটিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অকাতরে কৃপাবিতরণ করে-ছিলেন, যেন কল্পতরুর রূপ ধরেছিলেন! সেদিন তিনি তাঁর নিজের কৃপা-স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন, তাঁর অবতারত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি প্রেমভাণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে প্রেমের হাট গুটিয়ে ফেলার সূচনা করেছিলেন, তাঁর প্রকটলীলা সাঙ্গ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি শরণাগত ভক্তদের অভয়াশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁদের হৃদয়ে বল ভরসা উৎসাহ উদ্দীপ্ত করেছিলেন। সর্বোপরি কৃপাময় অবতারপুরুষই একমাত্র সর্বভূতের সুহৃদ্‌রূপে মানুষের কল্যাণের জন্য দেহধারণ করে থাকেন—তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়।

৫১ পুঁথি, পৃঃ ৬১৪

নরেন্দ্রকে লোকশিক্ষার চাপরাস দান

জগন্মাতার দিব্যদর্শন ও নিত্যসঙ্গলাভ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের আদিব্যাপ্তি, জগন্মাতার প্রেরণাতেই তাঁর সাধনভূমিতে বারো বছরের স্থিতি ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শিখর হতে শিখরান্তরে বিচিত্র উৎক্রমণ এবং জগন্মাতার আদেশেই দিব্যভাবারূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনের বিবিধ ও বিচিত্র উদ্যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'এর (নিজের) ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করেছেন।"

মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনযজ্ঞের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে দিব্যভাবারূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী সারদাদেবীর মধ্যে জগন্মাতার কল্যাণময়ী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন, ধর্মশক্তি-সঞ্চালনে সক্ষম একটি প্রবল শক্তিস্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন। সারদামণিকে তিনি বলেছিলেন, "আমি কি করেছি! তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে।"

১২৮০ সাল হতে বারো বছরের বেশী কাল সর্বধর্মস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন করে ধর্মসংস্থাপনের একনিষ্ঠ প্রয়াস। এই কালের তাঁর সকলপ্রকার আয়াস প্রয়াসের কেন্দ্রবিন্দুতে যে লোকসংগ্রহ তার প্রয়োজন সম্পর্কে শঙ্করাচার্য লেখেন, "স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া।" লোকসংগ্রহ ছিল তাঁর একটা মহৎ দায়স্বরূপ, তিনি আপনভাবে গাইতেন, "এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়! যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?" এই দায় ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার লক্ষণমাত্র। তাঁরই কৃপাধন্য স্বামী শিবানন্দজী লিখেছিলেন, "ঠাকুরের কৃপার কাছে গণ্ডি-ফণ্ডি, বেড়া-টেড়া সব ভেঙ্গে যায়। তাঁর কৃপাবারির বেগ অতিপ্রবল—নীচের ধারাও উপরে ঠেলে ওঠে। এখন যে pumping system চলেছে, তা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করেছে।"[১] এই কৃপাবারির বেগেই শ্রীরামকৃষ্ণ রাজধানী কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মের ও সাংস্কৃতিক নেতাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন, কাজ করেছিলেন। তখন গোষ্ঠীহিসাবে ব্রাহ্মসমাজের বিপুল প্রতাপ। ব্রাহ্মনেতাদের

১ 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্রাবলী' উদ্বোধন, পৃঃ ১১২

অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হলেও, তাঁরা সেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির প্রকৃত তাৎপর্য ধারণা করতে পারেন নি, ল্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে তাঁর ধর্মচিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। জগদম্বার উপর সদানির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝেন যে, তাঁর প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের যথার্থ-গ্রহণে সমর্থ ব্যক্তিদের আগমনের জন্য তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হবে। দীর্ঘ-প্রতীক্ষা তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রাণের ভিতর এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তেন। লোকভয় বা লজ্জা কাটিয়ে তিনি সন্ধ্যার পর কুঠিবাড়ীর ছাদের উপর থেকে কেঁদে কেঁদে ডাকতেন, "তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে।" কৃপাবারির বেগেই অবতার পুরুষের এই কাতরতা। এই ডাকে সাড়া দিয়ে একে একে সবাই আসতে থাকেন। জগন্মাতার চিহ্নিত ব্যক্তিদের চিনতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এঁদের নিয়ে গড়ে তোলেন একভাবমুখী অন্তরঙ্গদল, আশপাশেই জমায়েত হন বহিরঙ্গের অঙ্গগণ। সমাগত ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার কর হে ঈশ্বর। আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ওকথা বলে না। তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হ'ল ; প্রথম আমি কে ? তারপর তারা কে ?—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি ?"২ এঁরা অবতারের অন্তরঙ্গ, 'কলমির দল', অবতারের নিত্যসঙ্গী। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "যোগদৃষ্টিসহায়ে পূর্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজসকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারীভেদে শ্রেণীপূর্বক তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব মতপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।… অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অদ্ভুত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসঙ্ঘে স্বভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।"৩

'নিজ অভিনব উদারমত-প্রচারের কেন্দ্র' ও 'উদার-ধর্মসঙ্ঘের' পরিচালনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বেছে নিয়েছিলেন কয়েকজন আধিকারিক

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১৪।

৩। স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৬-৭

পুরুষকে এবং তাঁদের নেতা হিসাবে নিয়েছিলেন একজন অসাধারণ যুবককে। দৃঢ়িষ্ট বলিষ্ঠ মেধাবী এক ভগবৎপরায়ণ যুবক। কলকাতার সিমলার দত্তদের বাড়ীর ছেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শনেই চিনতে পারেন জগন্মাতার নির্দিষ্ট তাঁর জন্য কুটোবাঁধা কর্মীকে। তিনি লক্ষ্য করেন, যুবকের নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার চুল বা বেশভূষার কোন পারিপাট্য নেই। বাইরের কোন কিছুতেই যেন তাঁর আঁট নেই। চোখ দেখে মনে হয়, তাঁর মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা টেনে রেখেছে। এ যে বড় সত্ত্বগুণের আধার! তথ্যাদি মিলিয়ে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, 'বাঃ সব মিলে যাচ্ছে, এ ধ্যানসিদ্ধ—জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।' তিনি প্রকাশ্যে বলেন, "দেখ, দেবী সরস্বতীর জ্ঞানালোকে নরেন কেমন জল জ্বল করছে"! নিজের দিব্য-দর্শনের ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন, "নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানী! সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন।" দক্ষিণেশ্বর-প্রাঙ্গণে প্রথম-সাক্ষাতের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে নরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে বলেছিলেন, "জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ"। নিশ্চিন্ত হবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের উপর লৌকিক ও অলৌকিক বিবিধ পরীক্ষার প্রয়োগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে তৃতীয় সাক্ষাৎকারের দিনে ভাবস্থ নরেন্দ্রনাথকে চেতনার গভীরে আরূঢ় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাঁর সম্বন্ধে নিজের ধারণা ও দর্শনাদি যাচাই করে নেন। তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথই জগন্মাতার নির্দেশিত ব্যক্তি, জগৎকল্যাণে বিশেষ ভূমিকা-পালনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ মেটে না। নরেন্দ্র চোখের আড়াল হলেই তাঁর হৃদয়টা গামছা নিংড়াবার মত মোচড় দিতে থাকে। নরেন্দ্র-বিরহে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। তিনি নরেন্দ্রের প্রশংসায় সর্বদা পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন, 'পদ্মের মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল', 'ডোবা, পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি, যেমন হালদার পুকুর।' 'নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু বড় রুই—আর সব নানারকম মাছ—পোনা কাঠি বাটা এই সব', 'খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে', 'নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর'। তিনি আরও বলতেন, 'আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নেই; বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।' তখনকার ভারতবর্ষে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ

ধর্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের তুলনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তির বিকাশ ঘটেছে সেরকম আঠারোটা শক্তি খেলছে নরেন্দ্রের মধ্যে। শোনে উপস্থিত সকলে ; বিশ্বাস করে না অনেকেই, আর নরেন্দ্র স্বয়ং প্রতিবাদ করেন। গীতাতত্ত্বে 'ঈশদৃষ্টি-বিধানায়' ঈশ্বরের স্ববিভূতির বর্ণন। তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নরেন্দ্রের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করতে থাকেন। তিনি ভক্তেদর বলেন, "কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন— সেইরূপ ওর (নরেন্দ্রর) জন্যই তো সব গো।"[৪] নরেন্দ্রকে গড়ে-পিটে লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ তৈরী করার জন্যই যেন রামকৃষ্ণলীলাবিলাসের বিপুল আয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা করেন ও তিনিই অবতার। সেই সচ্চিদানন্দই বহুরূপে জীব হয়েছেন এবং তিনি মানুষরূপে লীলা করছেন…যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে"। সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একটা প্রণালী অর্থাৎ নলের ভিতর দিয়ে আসছে। রামকৃষ্ণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তির প্রকাশ ঘটেছে— অতুলনীয় তার বৈভব, ইতিহাসের মাপকাঠিতে অদ্বিতীয় তার সম্ভাবনা। লোকহিতের জন্য তিনি লীলাবিলাসের প্রাকৃত তনু ধারণ করেছিলেন। স্বমহিমায় মহিমান্বিত হলেও জগন্মাতার জমিদারীতে শাসন ও শান্তি-বিধানের জন্যই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। লোকহিতের ভাবনা সর্বক্ষণ তাঁর সর্বহৃদয় জুড়ে। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন, "আমি সাগু খেয়েও পরের উপকার করব।"[৫] 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' লোকসংগ্রহ-সংগঠন করেন তিনি। সে-উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির জন্য গড়ে তোলেন ইস্পাত-চরিত্রে গড়া ত্যাগী যুবকদল। দলের নেতারূপে গড়ে তোলেন নরেন্দ্রনাথকে। নরেন্দ্র-নাথকে গড়তেই যেন তিনি অধিক অভিনিবেশ করেন বিবিধ বিচিত্র উপায় অবলম্বন করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনি এক অদ্ভুত রকমের উক্তি। তিনি বলেন, "আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-

---

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৫।৩২৫।

৫ ভক্ত গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিকথা হতে।

দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুনী, আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর একধারে টক্‌টকে লালসুড়কির কাঁড়ির মতো জ্যোতিঃ—তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললাম, 'ও নরেন্দ্র'। একটু চোখ চাইলে—বুঝলাম ওই একরূপে শিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, 'মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর, তা না হ'লে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে'।" শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন খাঁটি সোনা দিয়ে ব্যবহারযোগ্য গয়না গড়া যায় না, দরকার সামান্য খাদ। লোকশিক্ষকের বিচিত্র গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন সত্ত্বাধিক্যের সঙ্গে রজের মিশ্রণ, মুক্তির মধ্যে মায়ালেশের আবরণ। সেকারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণের দুর্বোধ্য উপযুক্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন। প্রধানতঃ নরেন্দ্রকে অবলম্বন করেই তিনি ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-প্রচারযন্ত্রের প্রসারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বাইবেলের ভাষায় বলেছেন, He was the rock upon which the structure was to be built. বিবেকানন্দকে মধ্যমণি করেই রামকৃষ্ণভাবাদর্শের প্রসার।

শুদ্ধসত্ত্ব আধারের কয়েকজন শিক্ষিত যুবক রামকৃষ্ণ-মধুতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। প্রথম সক্ষাৎ হতেই নরেন্দ্রনাথ যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে ও স্বাতন্ত্র্যবোধের মননালোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে, তাঁর বাণী ও আচরণকে যাচাই করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোপুরি বুঝতে পারেন না, বুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও রসগ্রহণ যেন করতে পারেন না, কিন্তু প্রথমক্ষণ হতেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন রামকৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণ। তীব্র, গভীর ও ব্যাপক সে আকর্ষণ। কখনও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে উন্মাদবৎ বোধ হলেও তিনি বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মত পবিত্র ত্যাগী ঈশ্বরসমর্পিত জীবন জগতে দুর্লভ। সংসারে দোকানদারির পটভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন, "একা তিনিই (শ্রীরামকৃষ্ণ) ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্যসকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর সামগ্রিক ধারণা প্রকাশ করেছিলেন একটি শব্দে LOVE ; তাঁকে বলেছিলেন 'প্রেমপাথার'। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট নবাগত শরৎ ও শশীকে বলেছিলেন গানের মাধ্যমে, 'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়। প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' তিনি বুঝিয়ে বলেন, "সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায়

যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহা বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুতশক্তি।"
সত্যিই অদ্ভুত বিচিত্র শক্তিতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে পরিব্যাপ্ত করেছিলেন, তাঁর ভাবজগৎকে গ্রাস করেছিলেন। নরেন্দ্র খুলে বলেন তাঁর গোপন অভিজ্ঞতা, "রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতর যেটা আছে, সেইটাকে; পরে কত কথা, কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"[৬]

নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট বোধ করলেও তাঁর সব মত পথকে মেনে নিতে পারেন না। পাশ্চাত্য-শিক্ষার সংস্কার, সাধারণ যুক্তি বিচারের অভিমান বাধা সৃষ্টি করে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে যাচাই করতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে উৎসাহিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলতেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে', নরেন্দ্র উত্তর করতেন, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বলব না'। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হন। তিনি বিচার ও মননশীলতার পথ ধরে নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে চলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষানুভূতির মাপকাঠিতে সবকিছু গ্রহণ করতে উপদেশ দিতেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে বলতেন, "আমি বলছি বলেই কিছু মেনে নিবি না, নিজে সব যাচাই করে নিবি। মানলে বা না মানলেই তো আর বস্তুলাভ হবে না, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতি করলে তবে হবে"।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন বিচার-তর্কের দৌড় সীমিত। 'নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া'। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন, "বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়; শুধু মুখে বল্‌লে হবে না, এই আমি দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্যলাভ করা চাই।...চৈতন্যলাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।... দেখছি বিচার করে একরকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে একরকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন – সে এক। তিনি যদি...তাঁর মানুষলীলা দেখিয়ে দেন—তাহলে আর বিচার করতে হয় না।" শ্রীরামকৃষ্ণ করুণাপূর্বক নিজেকে ধরা দেন, আত্মপ্রকাশ করেন, অভয় দান করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন, "এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই; তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সেদিন দেখলাম,

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৫।১৬৪-৬৫

আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, 'আমিই যুগে যুগে অবতার।' দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব; তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।"৭ জগন্মাতার জমিদারীতে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, ত্রিতাপপীড়িত মানুষের মধ্যে লোককল্যাণ সংসাধনের জন্য, মানুষকে মানহুঁস করার জন্য ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। মানুষের বেশে মানুষের মাঝে তাঁর বিচিত্র লীলাবিলাস। 'সনাতনধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া' সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁর সাধন এবং সাধ্যলাভের বিলাস।

তাত্ত্বিক বিচারে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিরূপ, রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের একটি চিন্ময় বিগ্রহ বৈ তো নয়। ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রের গা ঘেঁসে বসে নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পরপর দেখিয়ে বলেন, "দেখছি কি —এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলছি,—কিছুই তফাত বুঝতে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, এটাই রয়েছে!—বুঝতে পাচ্ছ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?"৮ অনুভবের বিষয় কথায় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন না। তাঁর আচার ব্যবহারে প্রকটিত হয় সেই অভেদত্বানুভূতি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তামাকের কলকে হাতে ধরেন, সে-হাতেই তিনি নরেন্দ্রকে তামাক খেতে বাধ্য করেন, আবার নিজেও সে-হাতেই তামাক খান। সঙ্কুচিত সন্ত্রস্ত নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, "তোর তো ভারী হীন-বুদ্ধি,—তুই আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।" পরিবেশ ও কালভেদে একই সত্তার যেন দ্বৈতপ্রকাশ। আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে ভক্তদের বলেন, "আমি নরেনকে আমার আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি।"৯ শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনালোকে নরেন্দ্র ও তিনি অভিন্ন, নরেন্দ্র তাঁর স্বরূপ সত্তা, নরেন্দ্র তাঁরই অস্তিত্বের একটি প্রমাণ মাত্র।

ব্যবহারিকজ্ঞানে নরেন্দ্রনাথ জানেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস। শ্রীরামকৃষ্ণ 'জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর,' নরেন্দ্র 'দাস তব জনমে জনমে'। শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তবীর্য ঈশ্বর, তাঁর ইচ্ছামাত্রে ধূলিকণা হতে লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ

---

৭ কথামৃত ৫। পরি ১০

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। পৃঃ ৫।২৪৮

৯ কথামৃত ৫।১৬।২

সৃষ্টি হতে পারে। নরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে। সমর্পিত নরেন্দ্রনাথ হতে শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যাশ্চর্য কুশলী শিল্পী। জীবন-শিল্পসৃষ্টিতে প্রকটিত হয়েছিল তাঁর প্রকৃত মুন্সিয়ানা। তাঁর কলাকৌশলে মুগ্ধ বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "এই যে পাগলাধামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাত দিয়ে ভাঙত, পিট্‌ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতনভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখি না।" বিচিত্র সুন্দর তাঁর সৃষ্টিকৃতির তালিকা। তিনি মেষপালক রাখ্‌তুরাম হতে গড়েছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ অদ্ভুতানন্দ, মাতাল নট গিরিশ হতে সৃষ্টি করেছিলেন ভৈরবভক্ত গিরিশচন্দ্র দত্তবাড়ীর ছেলে বিলে হতে সৃষ্টি করেছিলেন যুগনায়ক বিবেকানন্দ, রসিক মেথর হতে জীবন্মুক্ত হরিভক্ত. কৃষ্ণপিয়াসী মৃড়ানী হতে তেজীয়সী গৌরদাসী।

নরেন্দ্রনাথ হতে বিবেকানন্দের বিবর্তন জীবনশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মহান্ কীর্তি। শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসুন্দর সৃষ্টি বিবেকানন্দ। কোবিদ্ ক্রান্তদর্শী কবি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ কাব্য জ্ঞানপ্রেমে সুসমন্বিত-বিন্যাস বিবেকানন্দ-সাধনা। ভক্তের দৃষ্টিতে বিশ্বনাথপুত্র হতে বিবেকানন্দ সৃষ্টিও অবতার-পুরুষের লীলাখেলা। বিবেকানন্দ তাঁর লীলাবিলাসের একটি ঐশ্বর্যমাত্র। প্রত্যেক সৃজনকর্মের ন্যায় বিবেকানন্দ-সৃষ্টিতে বেদনার ব্যঞ্জনা থাকলেও সামগ্রিকভাবে এক আনন্দঘন দ্যোতনাই বিবেকানন্দসৃষ্টির মুহূর্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে রেখেছিল।

শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দুহাতের মুঠোর মধ্যে ধরে বিবেকানন্দ-সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ হতে বিবেকানন্দ-বিবর্তনে অন্যান্য বিষয়ের চাইতে আধ্যাত্মিক পরিবর্তনই বোধকরি বেশী চাঞ্চল্যকর। সাধনভজন ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে সুষমছন্দে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে বলেন, "নরেন্দ্রকে দেখছ না?—সব মনটি ওর আমারই উপর আসছে।" ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্র রামকৃষ্ণময় হয়ে ওঠেন—রামকৃষ্ণামৃতে তিনি একেবারে 'ড়াইল্যুট' হয়ে যান। যে নরেন্দ্রনাথ প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলে অগ্রাহ্য করতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে মা-কালীকে সত্য বলে গ্রহণ করেন, জগন্মাতার কৃপালাভ করে তিনি ধন্য

হন। নরেন্দ্র শেষপর্যন্ত মা-কালীকে মেনেছে জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আহ্লাদে আটখানা হন। উৎফুল্ল শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?" পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করেছিলেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর কাছে (মা-কালীর) আমাকে উৎসর্গ করে দিলেন। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রকাজে তিনি আমাকে চালিত করেন।...তিনি আমাকে নিয়ে যান যা-ইচ্ছে-তাই করান।"১০

গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী বড়লোকের ঘরে পুত্র নরেন্দ্রকে বিয়ে দেবার জন্য মতলব আঁটেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাহাকার করে ওঠেন। তিনি মা-কালীর পা ধরে কেঁদে প্রার্থনা করেন, "মা ওসব ঘুরিয়ে দেখা, নরেন্দ্র যেন ডুবে না।" পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গেলে সাংসারিক বিপর্যয় নরেন্দ্রনাথকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। অভাব-অনটনের মধ্যে চাকুরীর সন্ধানে ব্যর্থভাবে ঘুরে বেড়ান নরেন্দ্রনাথ। একদিন উপবাস পরিশ্রমে ক্লান্ত নরেন্দ্রনাথ একটি বাড়ীর রকে ঘুমিয়ে পড়েন। মনের পুঞ্জীভূত সন্দেহ সহসা দূর হয়। 'শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য' ইত্যাদি বিষয়ের স্থির মীমাংসা উপলব্ধি করেন তিনি। মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ হয়। সংসার-বৈরাগ্য গভীরতর হয়ে ওঠে, ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়ে ওঠে। তাঁর প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকপাঠ ও বিচার-মননের সাহায্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে জীবব্রহ্মৈক্য ভাবনা সিঞ্চন করতে থাকেন। পাশ্চাত্যদর্শনের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা যে গণ্ডী সৃষ্টি করেছিল তিনি তা অতিক্রম করেন; ক্রমেই তাঁর ধ্যান-ধারণা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণলীলার আসর জমজম করছিল। ১৮৮৫ সালের চৈত্র-বৈশাখ। প্রসন্ন সুনীল আকাশে প্রশান্তির দীপ্তি। অকস্মাৎ আকাশের এক কোণে দেখা দেয় কালবৈশাখীর দুর্যোগমেঘ। বজ্রবিদ্যুতের গর্জনে সকলে সচকিত হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণলীলার আসরের প্রধান গায়েনের কণ্ঠরোগ ধরা পড়েছে, প্রাণঘাতী রোহিণী রোগ। রোগের উপসর্গগুলি যতই প্রকট হতে থাকে, ভক্তগণ ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। যাঁর এই অসাধ্য ব্যাধি তিনিও সাময়িকভাবে ভক্তগণের দুশ্চিন্তায় সায় দেন,

১০ শঙ্করীপ্রসাদ বসু : নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৩৩৪

কিন্তু তিনি থাকেন সদানন্দময়, আনন্দগম্ভীর। সংসারী মানুষের সঙ্গে হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে তিনি হলেন নীলকণ্ঠ, এদিকে সংসারী মানুষকে সংসারের জ্বালা হতে আরাম দেওয়ার জন্য তিনি হলেন ভবরোগবৈদ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য তাঁকে শ্যামপুকুরে আনা হয়, এবং পরে কাশীপুরের এক বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হাফিজ্‌ফেজ, বৈদ্য, ইত্যাদি চিকিৎসা, ঝাড়ফুক-তাবিজ-মানৎ-হত্যা ইত্যাদি বিশ্বাসবিধির সকল প্রচেষ্টার বিফলতার মধ্য দিয়ে দিন দ্রুত গড়িয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণের সুঠাম দেহ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে বিছানায় মিশে যায়। কিন্নরকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর প্রায় স্তব্ধ। লীলাঙ্গনে রোশনচৌকিতে বাজতে থাকে পুরবীরাগিণী।

অবতারপুরুষের ব্যাধি শুনে হুজুগে লোক সরে পরে, গৃহীভক্তেরা সেবা-শুশ্রূষার সংগঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সেই অবসরে লীলানাথ তাঁর কর্মীদল বাছাই করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সংগঠিত করে তোলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী তাঁর সাধনক্রম দেখিয়ে দেন। কাশীপুর বাগানে সাধকদের জীবন সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেন, "প্রাণে প্রাণে মাথামাখি ভাব পরস্পরে। প্রত্যেকেই ঠাঁই ঠাঁই তপধ্যান করে"॥ এই সাধকদলের অগ্রণী নরেন্দ্রনাথ। বাড়ীতে গিয়ে আইন পরীক্ষার জন্য তৈরী হবেন স্থির করেছিলেন। তাঁর বুক আটুপাটু করতে থাকে। সব ছুঁড়ে ফেলে রাস্তা দিয়ে ছুট দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। সেদিন ছিল ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮৬।[১১] ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তাঁকে হন্যে কুকুরের মতো করে তুলেছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে নিবেদন করেন, "আমার ইচ্ছা, অমনি তিনচারদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকব। কখনও কখনও একবার খেতে উঠবো"। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাঁর নয়নের মণি নরেন্দ্র-নাথের লক্ষ্য আরও উঁচু হবে, মহান্ হবে। তিনি বলেন, "তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। এ অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে"। আবার একদিন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন নির্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য। নরেন্দ্রের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তিনি শুকদেবের মত পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগতঃ সমাধিতে ডুবে থাকবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তেজিতকণ্ঠে তিরস্কার করে বলেন, "ছি ছি! তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই

১১ কথামৃত ৩।২৩।২

একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ার হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। এতো অতি তুচ্ছ হীনকথা! নারে, অত ছোট নজর করিস না।" নবালোক বুদ্ধিরজগতে নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করে। ক্রমে পরিষ্কার হয় তাঁর বিশ্বাস; নিশ্চিত ধারণা হয়, জগদ্ধিতায় তাঁর জীবন ও সাধন। যে নরেন্দ্র একদিন আত্মমুক্তির জন্য উদ্বেল হয়েছিলেন, তিনিই বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, যতদিন দেশের একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে ততদিন তিনি মুক্তি চান না।

আধ্যাত্মিক সাধনভজনে কাশীপুরের দিনগুলি জমজমাট। নরেন্দ্রনাথ সর্বস্ব পণ করে সাধনে মেতে উঠেন। সাধনকুটীরের দেয়ালে লেখা "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্..." সাধকদের দৃঢ়সঙ্কল্পকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। ত্যাগ বৈরাগ্যের হোমাগ্নিতে ক্ষুদ্র আমিত্বের পত্রপল্লব ছাই হয়ে যায়। অজ্ঞান-প্রহেলিকার ঘনকুয়াসা পাতলা হতে থাকে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অর্জিত দুর্লভ (অণিমাদি) বিভূতিসকল নরেন্দ্রনাথকে দান করতে উদ্যত হন, নরেন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আগে ঈশ্বরলাভ হোক, পরে ঐগুলি গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাবে।" শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হন। দক্ষিণেশ্বরের বেলতলায়, কাশীপুর বাগানে ধুনির পাশে, বোধগয়াতে বোধিদ্রুমতলে নরেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান ও অনুধ্যান চলতে থাকে। ধ্যান করতে করতে নরেন্দ্রনাথ ললাটের অভ্যন্তরে দেখতে পান একটা ত্রিকোণাকার জ্যোতি। ঠাকুর বলেন, ব্রহ্মজ্যোতি। জ্বলন্ত ধুনির পাশে নরেন্দ্র দেখতে পান বহু দেবদেবী। বোধগয়াতে উপলব্ধি করেন বুদ্ধের উপস্থিতি, তাঁর অগাধ প্রেমপ্রীতি।

এদিকে তীর্থযাত্রা শেষ ক'রে ফিরেছিলেন বুড়োগোপাল। ৮ই জানুয়ারী রাত্রিবেলা তিনি কাশীপুর বাগানবাড়ীতে একটি ভাণ্ডারা দেন। গঙ্গাসাগর-যাত্রী সাধুদের গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা দিবেন সঙ্কল্প করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকে বলেন, 'আমার এই যুবক সেবকেরা হাজারি সাধু, প্রত্যেকে হাজার সাধুর সমান। এদের মতো সাধু কোথায় পাবে তুমি?' বুড়োগোপাল ঠাকুর রামকৃষ্ণের হাত দিয়ে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগীন, লাটু, তারককে গেরুয়াবস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা দান করেন এবং নিজে গ্রহণ করেন। সেদিন হতে কাশীপুরের তাপসেরা বাগানবাড়ীতে গৈরিকবস্ত্রই ব্যবহার করতে থাকেন।

ইতিপূর্বেই নরেন্দ্রনাথ 'রামমন্ত্রে' দীক্ষিত হয়েছিলেন। কয়েকদিন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে রামমন্ত্রের সাধন। ১৩ই জানুয়ারী গভীররাত্রে নরেন্দ্রনাথ ভাবের ঘোরে 'রাম' নাম তারস্বরে উচ্চারণ করে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বসতবাটীর চতুর্দিকে বাই বাই করে ঘুরেছিলেন। সকলে তাঁকে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যান রামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। এই সময়ে একদিন রামচন্দ্রের তপস্বীবেশ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ধন্য মনে করেন।

তখনকার কাশীপুর বাগানবাড়ীতে প্রতিটি দিন ঘটনার বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বুধবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। সকালবেলা। নরেন্দ্রনাথ রামাইত সাধুদের বেশে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে নিরঞ্জন ও গোপাল। ভিতরে বাইরে গৈরিকের দীপ্তি। 'ত্যাগীর বাদশাহ' নরেন্দ্রনাথকে গৈরিকবসনে দেখে ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল। সুগায়ক নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর হতে উৎসারিত হয় বৈরাগ্যরাঙা ভাবস্রোত। নরেন্দ্রনাথ গান করেন,

'প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥'

সুরের মূর্ছনায় ভাবের দ্যোতনায় উপস্থিত সকলে মুগ্ধ। শ্রোতাদের অনেকের চক্ষে ভাবাশ্রু। প্রেমাব্ধিগম্ভীর শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে প্রেমাশ্রুবিন্দু। মধুময় সেই স্বর্গীয় দৃশ্য।

শুক্রবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৬। মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। দেখেন, প্রাঙ্গণে গাছতলায় একটি ছোট আসর বসেছে। নরেন্দ্রনাথ ও নিরঞ্জন। দুজনেই গৈরিকভূষিত। কাছেই বসে আছেন ভক্ত কালীপদ ঘোষ, পুরানো ব্রাহ্মভক্ত মণি মল্লিক ও তাঁর ভাই। নরেন্দ্রনাথ মধুর কণ্ঠে গান ধরেন,

"সুরধুনীতীরে হরি বলে কেরে। বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।..."

এরপরে নরেন্দ্রের অনুরোধে মাষ্টারমশাই নরেন্দ্রের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে গান ধরেন,

"যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে, নদীয়ায় তারা দুভাই এসেছে রে।..."

নরেন্দ্রের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেন, "এই ছাখ নরেন আগে কিছু মানত না, কিন্তু এখন 'রাধে রাধে' বলে কাঁদে ও কীর্তনে নৃত্য করে।" এসময়কার একদিনের ঘটনা, লিখেছেন

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, "...তাঁহাকে (নরেন্দ্রকে) প্রেমধনে ধনী করিবার বাসনায় (ঠাকুর) শয্যাপরি অঙ্গুলি দিয়ে যেমন লিখিলেন, 'শ্রীমতী রাধে, নরেন্দ্রকে দয়া কর'। এমনিই যেন কোন মহাশক্তির প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং 'কোথায় ওমা প্রেমময়ী রাধে' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিবসত্রয় ভজনের পর শুষ্ক দার্শনিক সরস হইয়া কহেন, প্রভুর কৃপায় আজ এক নূতন আলোক পাইলাম।"

নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর বোধশক্তি। একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন। 'সর্বজীবে দয়া' বলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। পরে অর্ধবাহ্যদশায় ফিরে তিনি বলতে থাকেন, 'জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে নরেন্দ্রনাথ পান অনাস্বাদিত আনন্দ ও নূতন আলোক। পরবর্তী-কালে এই সূত্র ধরে তিনি বনের বেদান্তকে ঘরে এনেছিলেন, আব্রহ্মচণ্ডালকে এই মহৎ-বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলায় প্রধান ঐশ্বর্য অনৈশ্বর্য। এই অনৈশ্বর্যের মাধুর্যে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর জীবন স্নিগ্ধ লালিত্যপূর্ণ। ভক্তদলের প্রধান নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাদীক্ষাও চলতে থাকে অনৈশ্বর্যের মধ্য দিয়ে। নরেন্দ্রনাথকে যোগ্য লোকশিক্ষকরূপে গড়ে তোলার জন্য তিনি ব্যগ্র হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্যসত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়।... লোকশিক্ষা দেবে তার 'চাপরাস' চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক! কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। হিতে বিপরীত। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।"[১২] লোকশিক্ষকের ভূমিকার দায়িত্ব সম্বন্ধে শ্রোতাদের সচেতন করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, "প্রকৃত প্রচার কি রকম জান? লোককে না ভজিয়ে আপনি ভজলে যথেষ্ট প্রচার হয়। যে আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করে, সে যথার্থ প্রচার করে। যে আপনি মুক্ত, শত শত লোক কোথা হতে আপনি আপনি এসে তার কাছে

---

১২ কথামৃত ১।২।৮

শিক্ষা লয়। ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিসেবিত পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর সংগৃহীত পুষ্পকোরকগুলি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হতে উদ্যোগী হয়। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির করেন, একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে জগন্মাতা-নির্বাচিত লোকশিক্ষককে সকলের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁকে লোকশিক্ষার চাপরাস নিজে হাতেই লিখে দিবেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের যন্ত্রণা চরমে উঠেছে। গলার ভিতরের ক্ষত বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, রক্তপুঁজ ঝরছে। গলায় বাঁধা হয়েছে গাঁদাপাতার পুল্‌টিস্। দেহযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে লোকোত্তরপুরুষ লোকসংগ্রহের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর লোককল্যাণের কর্মসূচী অব্যাহত থাকে, অথবা বেড়েই চলে। তিনি বলতেন, "আমি কোনো জায়গায় আবদ্ধ নই। সব গেছে, কেবল এক দয়া আছে।...যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করেও একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি তাও সার্থক বোধ করি।" সন্ধ্যাবেলা তিনি এক টুকরো কাগজ চেয়ে নেন। তাতে নিবিষ্ট মনে লেখেন, "জয় রাধে। প্রেমময়ী! নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দিবে, জয় রাধে।" প্রকৃতপক্ষে তিনি লিখেছিলেন,

"জয় রাধে পৃমমোহি নরেন সিক্ষে দিবে
জখন ঘুরেবাহিরে
হাঁক দিবে
জয় রাধে ॥"

লীলাবিলাসের নিজস্ব সংবাদদাতা "শ্রীম" অনুপস্থিত ছিলেন। লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে তিনি গিয়েছিলেন কামারপুকুর দর্শনে। নবযুগের তীর্থ কামারপুকুর। তীর্থধামের আনন্দমধু সংগ্রহ করে শ্রীম কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ফিরেছিলেন সেদিনই রাত্রি প্রায় এগারটায়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর তীর্থ দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ নিবেদন করেন। প্রশ্নাদি করে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

'শ্রীম" বাগানবাড়ীর নীচতলায় দানাদের ঘরে এসে শোনেন লীলা-পতির বিচিত্র কীর্তি। স্বচক্ষে দেখেন তাঁর হাতে-লেখা হুকুমনামা। বিস্মিত পুলকিত শ্রীম তাঁর ডায়েরীতে তার হুবহু নকল করে রাখেন। তিনি

মন্তব্য লেখেন "প's হাতের লেখা ও ছবি (কাগজে)" "I take it without leave as something too valuable to be lost." তাঁর ডায়েরীর পাতার পুরানো ও নূতন ক্রমসংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৫ ও ১১৫।

উপরন্তু স্বভাবশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ হুকুমনামা লিখে তারই নীচে এঁকেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। ভাবব্যঞ্জনাময় একটি রেখাচিত্র। বামদিকে আবক্ষ একটি নৃমূর্তি। টানা চোখ; পুরু ভ্রূ। মাথার গড়ন সাধারণ মানুষের মাথার চাইতে বড়। দৃষ্টি সম্মুখে স্থির। তার পিছনে মাথা উঁচিয়ে সাগ্রহে চলেছে একটি শিখী। যেন নরেন্দ্রনাথের পিছনে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নবঘোষিত লোকশিক্ষকের পিছনে জগৎপতি।

সংবাদদাতা 'শ্রীম' আরও জানতে পারেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের চাপরাস পেয়ে তেজীয়ান নরেন্দ্র বিদ্রোহ করেছিলেন, "আমি ওসব পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ মুচকি হেসে বলেছিলেন, "তোর হাড় করবে"। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের দুটো উক্তি। তিনি নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, "মা তোকে তাঁর কার্য করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন"। "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায় ?"

নরেন্দ্রনাথের জন্য লোকশিক্ষার 'চাপরাস' লিখে দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ক্ষান্ত হন না। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে লোকশিক্ষার শক্তি ও সামর্থ বাড়াবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি হতে শুরু ক'রে লোকব্যবহার পর্যন্ত তিনি সকল বিষয়েই শিক্ষা দেন। এদিকে নরেন্দ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য আটুপাটু ভাব বেড়েই চলেছিল। সেদিন শনিবার, ২০শে মার্চ, দোলযাত্রা। ভক্তির ফাগ কাশীপুর উদ্যানবাটীকে করে তুলেছে মধুবৃন্দাবন। সেদিনই একসময়ে লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুই যেজন্য কাঁদছিস, তোকে তাই দেবো। কিন্তু তুই আমার জন্য খাট। তোর জন্য আমি এতদিন দুঃখ করলুম, তুই এদের জন্য একটু দুঃখ কর। আমি ষোলো আনা খেটেছি ; তুই এক আনা খাট—তোকে গদি করে দেবো।"[১৩]

নির্বাচিত নরেন্দ্রকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে হবে। তারজন্য

---

১৩ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫২

শ্রীরামকৃষ্ণের কতই না আকুতি। শ্রীরামকৃষ্ণের সখের শিল্পচর্চার মধ্যেও ঘটেছে তার বিচ্ছুরণ। ৯ই এপ্রিল, শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকেছেন একটি চিত্রপট। একখণ্ড কাগজে আঁকা রেখাচিত্র। বিকাল পাঁচটা নাগাদ শশীঠাকুর কাগজটি এনে উপহার দেন দানাদের ঘরে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও "শ্রীম"কে। মনে রাখতে হবে এর পূর্বদিনেই নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও তারক বুদ্ধগয়া হতে ফিরেছেন। তাঁরা বিস্ফারিত নয়নে দেখেন, কাগজের একপিঠে লেখা রয়েছে, "নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও"। তারই নীচে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকেছেন একটি বাঘ ও একটি ঘোড়া। কাগজের উল্টো-পিঠে এঁকেছেন একটি নারীর মাথা, তার মাথায় বড় একটি খোঁপা। শিল্পীর খেয়ালিপনা, ও শিল্পনিপুণতা দর্শকদের মুগ্ধ করে, নরেন্দ্রের জন্য তাঁর আকুতি সকলকে বিস্মিত করে।

নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের তীব্রতা বেড়েই চলে, তাঁর বৈরাগ্যবিধুর মনের ব্যাকুলতা সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি চিরবাঞ্ছিত নির্বিকল্প-সমাধিতে আরূঢ় হন। নরেন্দ্রনাথের সাধন-ভজনের ইতিহাস সার্ভে করে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল ...এবং উন্মত্তের মত নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপা লাভ করিলেন, আহার নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময়ে দিবারাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন...কেমন করিয়া শ্রীগুরু-প্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিনচারি মাসেই নির্বিকল্পসমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিয়া ছিলেন—ঐসকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।" সম্ভবতঃ এপ্রিল মাসের শেষাংশের ঘটনা। এই নির্বিকল্প-সমাধির সুখস্মৃতি চয়ন করে স্বামীজী পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "সেদিন দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিয়েছিলুম, আর কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরে-ছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মের' ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্র—জল, জল, আর কিছুই নেই। ভাব আর

১৪ বাণী ও রচনা, ৯।পৃঃ ৯৯

ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।"১৪ দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট খবর পৌছায়। তিনি নির্বিকার চিত্তে মন্তব্য করেন, 'বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।" সেবক কালীপ্রসাদের জবানীতে জানা যায়, সমাধি-ব্যুত্থিত নরেন্দ্রনাথ দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়ে আবদার ধরেন, "আপনি আমাকে সেই আনন্দসাগরে যাতে সর্বদা থাকতে পারি দয়া করে তাই করে দিন"। ঈষৎ হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "এখন না, পরে হবে।" ব্যগ্র নরেন্দ্রনাথ জিদ্ ধরেন, বলেন, "আমার আর কিছুই ভাল লাগে না, সর্বদাই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় থাকতে ইচ্ছা হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "সে ঘরের চাবি আমার হাতে। তুই এখন আমার কাজ কর, পরে সময় হলে আমি চাবি খুলে দেব। নইলে তুই তোর স্বরূপ জানতে পারলে এই শরীরটা থু করে ফেলে দিবি।" নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে নীচে চলে যান।১৫

নির্বিকল্প-সমাধিসুখের আস্বাদ পাইয়ে দিয়ে লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের লোকশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাকী সকল বিষয়ের শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ করে তোলেন। সেবক শরৎ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন, "নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠনপূর্বক তাঁহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক ভক্ত সকলের ভারার্পণ করা এবং তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এইস্থানে করিয়াছিলেন"। নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পূর্ণ সুন্দর করে তোলেন নিজের হাতে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী।

'কালঃ কলয়তামস্মি', বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাকালের তরঙ্গভঙ্গে রামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের কেন্দ্রবিন্দু রামকৃষ্ণাবয়ব লুপ্ত হতে উদ্যত। তিন চার দিন মাত্র বাকী। এক শুভমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তাঁর সম্মুখে বসিয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নরেন্দ্রনাথ অনুভব করেন, ঠাকুরের দেহ হতে সূক্ষ্ম তেজোরশ্মি তড়িৎকম্পনের মতো তাঁর শরীরের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাববিহ্বল নরেন্দ্র-নাথ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। চেতনা লাভ করে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে জল, বেদনাশ্রু। তিনি নরেন্দ্রকে বলেন, "আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে

---

১৫ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা পৃঃ ১০৬

ফিরে যাবি।" শুনে, তাৎপর্য অবধারণ করে নরেন্দ্রনাথ ভাবে উদ্বেলিত হন, বালকের মত কাঁদতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধির পূর্বে একরাত্রে নরেন্দ্রনাথকে বলেন, "দেখ নরেন, তোর হাতে এঁদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি"। নরেন্দ্রনাথ মাথা পেতে নেন এই গুরুদায়িত্ব।

এত দেখে-শুনেও নরেন্দ্রের মনের আকাশে অকস্মাৎ আর্বিভূত হয় এক-টুকরো সংশয়মেঘ। রামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের শেষাঙ্কের একটি দৃশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালের পরীক্ষার্থী। নরেন্দ্রের সন্দেহ-লেশ নিঃশেষে দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচন করে বলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হ'ল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়"। অনুতাপ-জর্জ্জরিত চোখের জলে নরেন্দ্রের সন্দেহের ধূলিবালি সাফ্ হয়ে যায়।

লীলাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ নরলীলা সম্বরণ করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অনুভূতির রাজ্য হতে অন্তর্হিত হয় রামকৃষ্ণবিগ্রহ। গুরুপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইয়েরা। লক্ষ্য করে দেখেন তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার বিভিন্ন দিকের অল্পবিস্তর প্রকাশ। মনে পড়ে উপনিষদের বাণী, "একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ"। সর্বভূতান্তরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন বিচিত্র প্রকাশ তাঁর সন্তানগণের মধ্যে।

গুরুনির্দিষ্ট পথ ধ'রে নরেন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করেন বিবেকানন্দরূপে। লোকশিক্ষকরূপে আবির্ভূ'ত স্বামী বিবেকানন্দ দেশে বিদেশে সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগদ্ধিতায়, লোকহিতায় প্রচার করলেন। তিনি সঙ্গী-সাথীদের সাদর আহ্বান জানিয়ে বললেন, "শোন্ শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের জন্য এসেছিলেন, আর জগতের জন্য প্রাণটা দিয়ে গেলেন। আমিও প্রাণটা দেবো, তোমাদেরও সকলকে দিতে হবে।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে চাপরাস দিয়েছিলেন সে-দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিরূপ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রাণসখা শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন,

'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী॥'১৬

রামকৃষ্ণবাণীর অমূর্তরূপ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গের সর্বগ্রাসী প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যান জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষকে। বিবেকানন্দ-জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন ক'রে গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দজী বলেছিলেন, "Thus he fulfilled to the very letter the prediction of his blessed Master : 'That when his mission would be finished he would realize his divine nature and would give up his body."১৭ বিবেকানন্দবিগ্রহ পঞ্চভূতে মিশে গেছে, বিমূর্ত বিবেকানন্দ স্বস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান।

রামকৃষ্ণ-ভাবতরঙ্গের চেতনালোকে বিশ্বের দিক্-দিগন্তরে জ্বলে উঠেছে শতসহস্র জীবনদীপ, কিন্তু দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিঃশেষে দূর করার জন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ জ্বলন্ত জীবনদীপ—সেই দীপসকলকে জ্বালাবার জন্য লোকশিক্ষক বিবেকানন্দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি নিজমুখে অঙ্গীকার করেছেন, "But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God.". 'চাপরাস'-প্রাপ্ত লোকশিক্ষক বিবেকানন্দের লোকহিতায় কর্ম চলেছে, চলবে।

১৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড। ২৭২-৩

১৭ Complete Works of Swami Abhedananda, Centenary Publication, Vol. V., p. 591

মহাসমাধির পরের তিনদিন

মানুষের মাঝে ভগবানের লীলাবিলাস শুধুমাত্র ভক্তিমধু-আস্বাদন ও বিতরণের জন্য নয়। এখানে মানুষ শুধুমাত্র তাঁর খেলার দোসর নয়, মানুষের মাঝে ভগবানের অবতরণ ত্রিতাপপীড়িত মানুষকে সাহায্য করার জন্য। তিনি ব্যথিত মানুষের পাশে সুহৃদের মত এসে দাঁড়ান। তিনি হতাশ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি অকল্যাণের আক্রমণ প্রতিহত করে কল্যাণের শক্তিকে সুদৃঢ় করেন। তিনি সামাজিক মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য যুগোপযোগী ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। অবতার তারণ করেন, অবতার যুগসমুদ্ধর্তা।

বর্তমান সমস্যাময় যুগের দিশারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর বিচিত্র নরলীলা সাঙ্গ করেছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। তাঁর লীলাবিলাসের প্রতিটি ক্ষণ লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত। তিনি তাঁর দেহ তিলে তিলে বিসর্জন দিয়েছিলেন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়। তাঁর দেহ নৈসর্গিক নিয়মে ক্যান্সার-রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাঁর সুঠাম দেহ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর লোকহিতকর-কর্মের বিরাম ছিল না। দুর্বল মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। দুর্বল মানুষের ব্যথায় ব্যথী তিনি করুণার্দ্রস্বরে বলেছিলেন: শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকদের চৈতন্য হতো···তা রাখবে না।

তাঁর ভাগবতী তনু অপ্রকট হয়। হাহাকার করে ওঠে তাঁর কৃপাকাঙ্ক্ষী ও কৃপাধন্য মানুষেরা। তাদের অন্তরের বেদনা ঝরে পড়ে অশ্রু হয়ে, আকাশ বাতাসও যেন সমবেদনায় কেঁদে ওঠে। ভক্তগণ কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করে—

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
(আমি) ভবে একা, দাওহে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়॥

তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ কাশীপুরের শ্মশানঘাটে ভস্মীভূত হয়, অপঞ্চীকৃত হয়। ভক্তগণ তাঁর পূতাস্থি ও চিতাভস্ম সযত্নে একটি কলসীতে সংগ্রহ করেন। তাঁরা 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি দিতে দিতে কলসী নিয়ে আসেন কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে।

প্রত্যক্ষদর্শী অদ্ভুতানন্দজী তাঁর স্মৃতিকথাতে বলেছেন : 'তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) অস্থি আর ভস্ম একটি কলসীতে পুরে শশীভাই মাথায় করে বাগানে এনেছিলো। যে বিছানায় তিনি শুতেন সেইখানে কলসীটি রেখে দেওয়া হোলো।'১

অপর প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন পরবর্তী ঘটনা : "সেই রাত্রে আমরা সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে অস্থি রাখিয়া তাঁহার পবিত্র জীবনী আলোচনা করিতে লাগিলাম এবং ধ্যান-জপে মনোনিবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনজনিত দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিলাম। নরেন্দ্রনাথ পুরোভাগে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী বিচিত্র কৃপার কথা বলিয়া আমাদের কখনও কখনও সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা তখন সকলেই নিজেদের অসহায় বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম। তাহার পর কি করিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।" আমার জীবনকথা পৃঃ ১২২

তখন সেবকদের বেদনাবিধুর মন শ্রান্ত, এবং দেহ পরিশ্রমে ক্লান্ত। তবুও ক্রমে মনের আবেগ শান্ত হয়ে আসে। প্রশান্ত মনের দর্পণে ভেসে ওঠে অনিন্দ্য শ্রীরামকৃষ্ণমুখপদ্ম। তাঁর হৃদয়নিঙ্‌ড়ানো ভালোবাসার মধুর স্মৃতিতে ক্ষুব্ধ হয় মনের সাময়িক প্রশান্তি। স্মৃতিপট উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাঁর প্রাণমাতানো দিব্যবাণীর ঝলকে। রাত্রি অতিবাহিত হয়।

পরের দিন। মঙ্গলবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

অনেকেরই বোধ হয় মনে পড়ে নরেন্দ্রনাথের একটি উক্তি। তিনি যথার্থই বলেছিলেন : "All this will appear like a dream in our lives, only its memory will remain with us." (এই সমস্তই আমাদিগের জীবনে যেন স্বপ্নের মতো মনে হইবে এবং ইহার স্মৃতি অন্ততঃ আমাদের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। স্বামী অভেদানন্দ : আমার জীবনকথা পৃঃ ৭৯

---

১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার ও অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন :

কলের পুতুল সম মুখে নাই স্বর।
লইয়া দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর॥
সে সুখের বাগান নাহিক আজি আর।
আঁধারের চেয়ে অতি নিবিড় আঁধার॥
পাষাণে বাঁধিয়া বুক সন্ন্যাসী গণে।
শুদ্ধাচারে কলশীটি থুইল যতনে॥ (পৃঃ ৬২১)

গৃহী ভক্তদের মনও বেদনায় ভারাক্রান্ত। সময়ে সময়ে ঝরে পড়ে বেদনার অশ্রুবিন্দু। হতাশার কুয়াসা ঘিরে ধরে চারিদিক থেকে। সমাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশে মাঝে মাঝে ঝলক্ দেয় স্মৃতির বিজলি। স্মৃতি যেন কালজয়ী।

গৃহী ভক্তদের কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন মুরব্বি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে মধু রায়ের গলিতে বাড়ী। উপস্থিত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও রামচন্দ্র দত্ত আলোচনা করেন। প্রশ্ন উঠেছে: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে ভোগ দেওয়া হবে কি না?' মহেন্দ্রনাথ ওরফে মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, তাঁকে represent করার কাহারও সাধ্য নাই—Christian দেশে (তিনি থাকলে তাদের সঙ্গে কিছুটা মিলতো।

এই দিনটির বিবরণীর প্রথমেই মাষ্টারমশাই লিখেছেন: **Acts of the Apostle, He is in them.**

এই ভাবটি পুঁথিকার ছন্দোবদ্ধ পদে প্রকাশ করেছেন:

ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের থানা।
ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা॥
এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাঁই।
ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গোঁসাই॥

ভাবরূপে ভক্তের হৃদয়মধ্যে খেলা।
ভক্তের করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেলা॥ (পৃঃ ৬৩১)

মাষ্টারমশাই ও দেবেনবাবু সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। কথা বল্‌তে বল্‌তে পথ চলেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হতে বেরিয়েছে বৃন্দাবন বসু লেন। ১১নং বৃন্দাবন বসু লেনে শিবচন্দ্র গুহর কালীমন্দির। ১২৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সেই কালীমন্দিরে উপস্থিত হয়ে মাষ্টারমশাই মনের খেদ প্রকাশ করেন।

ক্রমে তাঁরা পৌছান বলরাম বসুর ভবনে। সেখানে ভক্ত গিরিশচন্দ্র উপস্থিত হয়েছেন। দরদী ব্যক্তিদের দেখে বোধকরি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিমেঘ চঞ্চল হয়ে উঠে। গিরিশচন্দ্র স্মৃতি-বর্ষণ করে সেই ভার লাঘব করেন।

তিনি বলতে থাকেন: এখন বুঝছি তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কত কষ্ট হয়েছিল।

'এই বাসনা যেন তাঁর disciple বলে কেউ ঘৃণা না করে।'২

'আমার ওখানের (জন্য) আর কোন interest নাই—তবে মাঠাকুরাণীর জন্য'—

'তাঁকে এক দেবতা জানতুম—আর কাউকেই জানি নাই–জানবো না।'৩

বলরামবাবু বলেন: 'ওরা কি করেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে ঘর নিলেই হ'তো—দেখনা শেষে শূন্যে দেহত্যাগ।'৪

মাষ্টারমশায় সেখান হতে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে যান। জগন্নাথমন্দিরে যান।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায় মাষ্টারমশাই গঙ্গাস্নান করে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। নীরব নিস্তব্ধ কাশীপুর-বাগান। এখানকার ঘরদোর, রাস্তাঘাট, গাছপালা সবকিছু তাঁর মধুরস্মৃতিতে বিমণ্ডিত। কত শত মধুর ও বেদনা-বিধুর স্মৃতি শরতের ছিন্ন মেঘের মত ভক্তজনের মনের নীল আকাশে ভাস্‌তে থাকে। দোতলার প্রসিদ্ধ হলঘর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত শয্যার উপরে রাখা হয়েছে ভস্ম ও পূতাস্থি পূর্ণ তাম্রকলস। স্থাপন করা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতি।৫ ডায়েরীতে মাষ্টারমশাই এই ঘরটিকে লিখেছেন 'সমাধি-ঘর'।

২ কৃপাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ও অপর কয়েকজনকে আশ্রয় দিলে কোন কোন উন্নাসিক ব্যক্তি কটূক্তি করে। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন না। গিরিশচন্দ্রকে জড়িয়ে পাছে কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন নিন্দা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে গিরিশচন্দ্রের উক্তির মধ্যে।

৩ ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে এখানে যা বলেছেন, তার অনেককিছুই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছিল।

৪ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাড়ীর দোতলার হলঘরে মহাসমাধি লাভ করেছিলেন। সে সম্বন্ধে বলেছেন বলরাম।

৫ শ্রীপ্রভুর ভোগ-রাগ পূজা-সহকার ॥
আজি হতে আরম্ভ করিল নিয়মিত।
শয্যায় শ্রীমূর্তি এক করিয়া স্থাপিত ॥ (পুঁথি, পৃঃ ৬৩১)

ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে অদ্ভুতানন্দজী পরবর্তীকালে বলেছিলেন: "পরের দিন গোলাপ মা এসে খবর দিলো—মাকে উনি (ঠাকুর) দেখা দিয়ে হাতের বালা খুলতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন—'আমি কি কোথাও গেছি গো? এই ত রয়েছি; শুধু এঘর থেকে ওঘরে এসেছি।' গোলাপ-মার কথা শুনে যারা সব দুঃখ করছিলো তাদের সন্দেহ মিটে গেলো। তারা তখন সকলে মিলে বললে—'সেবা যেমন চলছিলো তেমনি চলবে।' সেদিনে ত নিরঞ্জনভাই, শশীভাই, বুড়োগোপাল দাদা আর তারকদাদা সেইখানে রইলো। হাম্‌নে আর যোগীনভাই মায়ের কথামত ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় গেলুম। দুপুরে সেদিন ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হোয়েছিলো। সবাই মিলে তাঁর ঘরে কীর্তন কোরেছিলো।" (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩)

হলঘরে বসে বসে শ্রীম সেবক শশীর কাছে শোনেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভারতী। শশী প্রথমেই বলেন যে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন: তুই ছেলেদের রাজা (তুই অমন কাজ করবি কেন?)।

সে'দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কেমন আছিস?

একের পর এক স্মৃতি এসে ভীড় করতে থাকে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শশীকে বলেছিলেন: ওরে বালিস-মাদুর রাখ, তা না হলে watch করতে (দেখতে) আসবে কেন?

আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে বলেছিলেন: তুই কি আর আমার সেবা করবি নি? (তুই জ্ঞান জ্ঞান করিস) আমায় কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দে।

শশী বলেন অপর একটি কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন মুড়ির মধ্যে সামান্য কারণ ছিটিয়ে বলেন: নরেন্দ্র, রাখাল—এই তোদের শেষ হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সেবক হরিশকে বলেছিলেন: দশটা বেলা এখনও নাস্ নি···শ্যামা পাগল হলো, এখানকার নিন্দা হবে।

রোগাক্রান্ত ঠাকুরের সেবার জন্য হরিশ কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এসে বাস করছিলেন। কয়েকদিন পরে বাড়ীতে ফিরে গেলে তাঁর মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছিল। তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন।

সেবক শশীর কাহিনী শেষ হতে না হতেই সেবক হরিশ তাঁর স্মৃতির দুয়ার উন্মোচন করেন। তিনি জগন্নাথধামে গিয়েছিলেন, সেখানকার তাঁর এক অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমায় জানিয়ে ছিলেন শ্রীক্ষেত্রে—বুক চিরে নাড়িভুড়ি দেখিয়েছিলেন।৬

ঠাকুরের মহাসমাধির দিনে হরিশ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলছেন: লক্ষ্মী আমি (চল্‌লাম) তুই রইলি।

মাষ্টারমশাই তাঁকে মনে করিয়ে দেন কয়েকটি মূল্যবান পুরানো স্মৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন হরিশের জ্ঞানীর ভাব। তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাটি চাপা সোনার মত জ্ঞান চাপা থাকে।৭

এবার সেবক তারকনাথ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় উপলব্ধ একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার কাহিনী। তিনি বলেন: (দেখ্‌লাম) কালী অনন্ত স্রোত—তখন শোক নাই, 'দুঃখ নাই,'

মাষ্টারমশাই তারকনাথকে মনে করিয়ে দেন তাঁর একটি ব্যক্তিগত মধুর স্মৃতি। দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে তারকনাথের মুখ ধরে চুম্বন করেছিলেন।৮

---

৬ হরিশ জগন্নাথদর্শনের জন্য পুরী গিয়েছিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রের ধারে ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সেইসময়ে তিনি দেখতে পান যে টোটার গোপীনাথ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলছেন: আমি একরূপে পরমহংস হয়ে আছি। (মাষ্টারমশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ১০৩) কথিত আছে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাগবতী তনু টোটার গোপীনাথ-বিগ্রহে অন্তর্লীন হয়েছিল। সেবক হরিশ এখানে নৃসিংহাবতারের কথা বলছেন।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মধ্যে দেখ্‌তে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: 'হরিশকে বললুম, আর কিছু নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে সেই মাটি ফেলে দেওয়া।' (কথামৃত ৩।১০।২)

৮ "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘর হইতে বহির্গত হইয়া চাতালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন।...ঠাকুর তারককে চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।" (কথামৃত ৪।৫।১)

নরেন্দ্রনাথ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি মাষ্টারমশাইকে জানান, তিনি ঘুমাচ্ছিলেন না, স্মৃতি মন্থন ক'রে চলেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের শায়িত অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে পড়ে মাস কয়েক পূর্বেকার একটি ঘটনা। এই ঘটনা সম্বন্ধে অভেদানন্দজী লিখেছেন: "একদিন কাশীপুরের বাগানবাটীর নীচের হলঘরে চিৎ হইয়া শুইয়া ধ্যান করিতেছিলেন এবং দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অখণ্ডব্রহ্মে মন স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—এমন সময়ে তাঁহার মন ব্রহ্মে একাগ্র হইয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিয়া নিরোধ-সমাধিতে মগ্ন হইয়া রহিল। তখন বাহ্য-জগত ও দেহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে মন ডুবিয়া গেল। এই অবস্থায় অল্পক্ষণ থাকিয়া মন নীচে নামিয়া আসে।'[৯] শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁদের কেউ কেউ অনুবৃত্তি করেন সেই কাহিনী-সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা। কালীপ্রসাদ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সমাধিস্থ অবস্থায় মনে হচ্ছিল মৃতদেহের মত।[১০] পরে যখন দেখা গেল প্রাণ ধুক্ ধুক্ করছে তখন সেবকদের একজন দোতলায় গিয়ে ঠাকুরকে সংবাদ দিয়ে এসেছিলেন।

অমৃতলাল বসু উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে শোনা তাঁর বাল্যলীলার কাহিনী বলেন। বালক গদাধর সুন্দর ছবি আঁকতেন, দেবদেবীর মূর্তি গড়্‌তেন, আবার সেই মূর্তি ছয় আনা দরে বিক্রয় হয়েছিল।[১১] শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনী সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন।

অমৃতলাল বলেন: প্রথম দেখার সময় (তিনি হৃদয়কে বলেছিলেন—আরে সেই না? সম্ভবতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শম্ভু মল্লিকের বাড়ীতে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলেন।

রাখাল মন্তব্য করেন: কেশববাবুকে দেখে (ঠাকুরের) পাঁচ বছরের বালকের (ভাব হয়।)

---

৯ স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।

১০ তুলনীয় বর্ণনা লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাওয়া যায়। "নিরঞ্জন ভাই তাই না দেখে ঠাকুরকে এসে বললেন, 'লোরেনবাবু মারা গেছেন। তাঁর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে"। (পৃঃ ২৫০)

১১ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে এই কাহিনী বলেছিলেন কয়েকজনকে।

যোগীন বলেন : তিনি বলেছিলেন 'অমৃত আপনার লোক ?'

অমৃতলাল : কবে বলেছেন ?

যোগীন : দক্ষিণেশ্বরে।

অতঃপর সেবক যোগীন তার পাঁজী দেখার কাহিনী বলেন সবাইকে। ১৫ই আগষ্ট, ৩১শে শ্রাবণ সকাল আটটা নাগাদ ঠাকুর সেবক যোগীনকে বলেছিলেন পঞ্জিকা থেকে ২৫শে শ্রাবণ হ'তে প্রতিদিনের তিথিনক্ষত্রাদি পড়ে শোনাতে। যোগীন পড়তে থাকেন। ঠাকুর ৩১শে শ্রাবণের তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি শুনেই ইঙ্গিতে বলেন পঞ্জিকা রেখে দিতে। পরে দেখা গেল ঐ দিনটিকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মহাসমাধিযোগে তাঁর দেহরক্ষার জন্য।

মাষ্টারমশাই লিখেছেন, 'সেদিন রাত্রে সঙ্কীর্তন হয়েছিল।' স্বামী অদ্ভুতানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন : 'রাতে সুজীর পায়েস কোরে তাঁকে নিবেদন করা হোলো। ফিন্ রামনাম শুনানো হোলো। তারপর সব যে যার বাড়ী চলে গেলো। হামনে, গোপালদাদা আর তারকদাদা সেইখানে রয়ে গেলুম' (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬৩)।

বুধবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

কাশীপুর-বাগানবাড়ীতে ঠাকুরের ঘরে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সাম্‌নে বসে সকলে কীর্তন করেন। রামলাল দাদা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার গান করেন। বালক কৃষ্ণের ননীচুরি বিষয়ক গানটি গাইতে গাইতে তাঁর হৃদয় উদ্বেলহয়ে ওঠে। চোখ ফেটে অবাধ অশ্রুর ঢল নামে।

পরবর্তী এক দৃশ্যে দেখা গেল তারকনাথ মাষ্টারমশাইকে বলছেন : দুনিয়ার দুঃখ কি একবার দেখা যাক্।

অপর এক দৃশ্যে কালীপ্রসাদ মাষ্টারমশায়ের কাছে টাকা চান। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে শুনে গয়ার নিকটে বরাবর-পাহাড়ে এক সিদ্ধ হঠযোগীকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মন টেঁকে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি এক ব্যক্তির কাছ হতে (সম্ভবতঃ উমেশবাবু) পাঁচ টাকা ধার ক'রে ট্রেনে চেপেছিলেন এবং বালী-ষ্টেশনে পৌঁছে গঙ্গা পার হয়ে কাশীপুরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ধারের টাকা শোধের জন্য তিনি এখন মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকে পাঁচ টাকা গ্রহণ করেন।

একটি দৃশ্যে দেখা গেল, বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেবক শশীর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র। উদ্দেশ্য পুত্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিহনে শশীর অবস্থা 'আমার জীবন-ধন বিহনে আঁধার হেরি এ ভুবন।' শশী বিনীতভাবে পিতাকে উত্তর দেন: দেখুন এখন মাথার ঠিক নাই—কেমন ক'রে করে বলি—।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ উপস্থিত হয়েছেন সিঁথির ব্রাহ্মণ। সেখানে উপস্থিত আছেন সুরেশবাবু (সুরেশচন্দ্র মিত্র)। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রসিদ্ধ উপমা—মন হচ্ছে ধুবির কাপড়ের মত। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হবে। এই উপমাটি প্রচলিত উপমা—মন দর্পণের অপেক্ষা অধিক হৃদয়-গ্রাহী। এবিষয়ে বুঝিয়ে বলেন সুরেশচন্দ্র। ইতিমধ্যে নৃত্যগোপাল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সমর্থন করে বলেন: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই (ঠাকুর) রোমকৃষ্ণ হবেন।

নৃত্যগোপালের মন সামান্যতেই উদ্দীপ্ত হয়। গান শুনতে শুনতে তিনি ভাবস্থ হয়ে পড়েন।

যদিও স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতিকথাতে পাই 'তিন-চার দিন' পরের ঘটনা, কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করে মনে হয় ঘটনাটি ঘটেছিল ঐ দিনেই। অদ্ভুতানন্দজীর জবানীতে ঘটনার বিবরণ এইরূপ: 'তিন-চারদিন পরে মা হামাকে, গোলাপ-মাকে আর লক্ষ্মীদিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সন্ধ্যের আগেই তিনি কাশীপুর-বাগানে ফিরে এলেন। ··শুনেছি সেদিন বিকালের দিকে রামবাবু বাগানে এসেছিলেন। দুপুরে শশীভাই, নিরঞ্জনভাই, লোরেনভাই, রাখালভাই ও বাবুরামভাই এসেছিলো। রামবাবু নাকি আশ্রম তুলে দিতে চেয়েছেন, আর সকলকে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে যেতে বলেছেন। একথা শুনে নিরঞ্জনভায়ের আর শশীভায়ের ভারী দুঃখু হয়েছিলো। তাদের ইচ্ছা, যেমন চলছে ঠাকুরের সেবা তেমনি রোজ রোজ চলুক।' (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৬২-৪)

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথাতে পাই: 'আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন, 'কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যান আছে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে।'···শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিত্র গঙ্গার তীরে না হইয়া যোগোদ্যানে কিভাবে হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে

লাগিলাম।...তিনি (রামবাবু) শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাঁহার যোগোদ্যানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার স্থির-সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অধিক হইল।...আমরা সকলে স্থির করিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশী অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ঐ কৌটা বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুণাক্ষরে সেই কথা কোন রকমে জানিতে না পারেন। পরে রামবাবু আসিলে বাকী অস্থি কলসীসহ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। আমাদের সিদ্ধান্ত মতো তাহাই করা হইল।...তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল: 'ত্মাখো, আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কলসী হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তারপর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।' (আমার জীবনকথা, পৃ: ১২২-৪)

এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য স্বামী শিবানন্দের স্মৃতিকথা। তিনি বলেছিলেন: "স্বামীজী ঘড়াটি হতে সমুদয় বড় একটি কাপড়ে ঢালেন। একটি ক্ষুদ্র অস্থি-খণ্ড গুঁড়াইয়া স্বয়ং উদরস্থ করেন ও বলেন, 'ত্মাখ্ ওদেশে (তিব্বতে) বড় বড় লামাদের অস্থিকণা এরকম খেয়ে থাকে। আয় তোরাও একটু খা! ঐরূপে ঐ পূতদেহের অস্থিকণিকা উদরস্থ হওয়া মাত্র দেখা গেল শ্রীশ্রীস্বামীজীর ঘোর মাতালের মত নেশা উপস্থিত হইল। তিনি নিজেও ঐরূপে গ্রহণ করায় একটা মত্ততা সেদিন অনুভব করিয়াছিলেন।" (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, ১৩৭৪, পৃ: ৩৬)

অপরপক্ষে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "'দেহাবসানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর অগ্নিতে সমর্পিত হইয়াছিল এবং ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ সঞ্চয় করিয়া একটি তাম্রকলসে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্ত-সকলে মিলিত হইয়া প্রথমে পরামর্শ করিয়া স্থির হইয়াছিল যে, পূত ভাগীরথীতীরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া উক্ত কলস তথায় যথানিয়মে সমাহিত করা হইবে। কিন্তু ঐরূপ করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন দেখিয়া ও অন্য নানাকারণে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের অনেকে কিছুদিন পূর্বে পূর্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রিত, অধুনা পরলোকগত ভক্ত

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ 'যোগোদ্যান' নামে প্রসিদ্ধ ভূমিখণ্ডে উক্ত কলস সমাহিত করিবার কথা নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহাদিগের এরূপ মত পরিবর্তন ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা পূর্বোক্ত তাম্রকলস হইতে অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বাহির করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা রক্ষাপূর্বক তাহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের ভবনে নিত্যপূজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।"১২

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নরেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ দোতলার হলঘরে গান গাইতে সুরু করেন। প্রথমেই গান করেন গভীর স্মৃতি-বিমণ্ডিত ১৩ গান—

মা ত্বং হি তারা তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥

তারপর তিনি একে একে গান করেন—

(১) শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥ ইত্যাদি

(২) শিব শঙ্কর বম্ বম্ ভোলা, কৈলাসপতি মহারাজ রাজা। ইত্যাদি

(৩) মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু-সকলে॥ ইত্যাদি

(৪) কেনরে মন ভাবিস এত, দীনহীন কাঙালের মত।
আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী ক্ষেমঙ্করী॥ ইত্যাদি

(৫) আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ ইত্যাদি

(৬) ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী॥ ইত্যাদি

(৭) শ্যামা সুধাকর ইত্যাদি

(৮) দয়াময় দয়াময় - ইত্যাদি

কল্পনা করা যেতে পারে গানের পর গানের লহরী একদিকে যেমন

১২ স্বামী সারদানন্দ: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাবশেষ অস্থি-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩২২

১৩ যে'দিন নরেন্দ্রনাথ মা-কালীকে মেনেছিলেন সেদিন সারারাত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সদ্য শিখিয়ে দেওয়া 'মা ত্বং হি তারা' গানটি গেয়েছিলেন। (লীলপ্রসঙ্গ, ৫।২৪৬-৭)

মাধুর্যময় পরিবেশ রচনা করেছিল, তেমনি প্রতিটি গানের সঙ্গে জড়িত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি শ্রোতাদের শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যের আনন্দানুভবে আবিষ্ট ক'রে তুলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগোপাল বলেন তাঁর দর্শনের (সম্ভবতঃ স্বপ্ন-দর্শন) দুটো কাহিনী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির রাত্রে তিনি দেখেছিলেন ঠাকুরের ঘরের দুয়ারের কাছে একটি বিড়াল। আবার একরাত্রে তিনি দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর (মা কালীর ?) বরাভয় মূর্তি সব একই।

রামলালদাদা কিছুদিন পূর্বে বাড়ী গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ঠাকুরকে সব বিবরণ শুনিয়েছিলেন। রামলালদাদা স্মৃতি চয়ন ক'রে বলেন ঠাকুরের কয়েকটি উক্তি। ঠাকুর রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'বাড়ীতে আর কিছুদিন থাকলি নি কেন?'

'করবীর গাছ বাড়ীর ভিতরে দিলি কেন?'

মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী থেকে আরও জানা যায় যে, গতদিনের মত এই দিনেও দুপুরে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হয়, সন্ধ্যাতে শীতল দেওয়া হয়।

পরদিন বৃহস্পতিবার, ১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। একত্রে মিলিত হয়েছেন সুরেশচন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র আবেগের সঙ্গে বলতে থাকেন: 'টাকা কি জিনিষ—এবার দেখবো।'[১৪]

'সমাধি-জমির production দ্বারা যাতে চলে (দেখতে হবে।)'

'(এর জন্য) এক লাখ টাকা, কি পঞ্চাশ হাজার টাকা ওঠাতে হবে।'

তিনি নৃত্যগোপালকে লক্ষ্য ক'রে বলেন: 'চিতা সমাধির জন্য অস্থি আলাদা লওয়া হবে না।'

তিনি আবার বলতে থাকেন: 'পরমহংসের নিকট যাওয়া (নিজেকে) ধার্মিক জানাবার জন্য নয়।'

---

১৪ কয়েকদিন পরে ২৫শে অগাষ্ট গিরিশচন্দ্রকে খেদোক্তি করতে শোনা গিয়েছিল: 'হিঁদু হব—মদ আদপে ছোঁব না—টাকা করবো, কেননা টাকার জন্য তাঁকে দেখতে পারি নাই। ইচ্ছা ছিল একটি ডাক্তার সর্বদা কাছে রাখবার—তা পারলুম না।'
এই রচনার অন্যতম আকর পূজ্যপাদ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী।

২৩শে আগস্ট, ১৮৮৬

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। সেদিনের ঘটনা কালের রঙ্গমঞ্চে ক্রমেই মহত্তর ও বৃহত্তররূপে প্রতিভাত হচ্ছে। ঘটনার ব্যঞ্জনা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তদানীন্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী। বাংলা সন ১২৯০-এর ৮ই ভাদ্র, সোমবার।

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণবিগ্রহে নরলীলা সাঙ্গ ক'রে জগৎমঞ্চ হতে অন্তর্হিত হয়েছেন মাত্র কয়েকদিন পূর্বে, ভক্তদের হৃদয় হাহাকার করতে থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যসঙ্গের স্মৃতি হৃদয়কে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। কোন কোন সুধীভক্ত যদিও অনুভব করেন, 'প্রয়োজনমত কালবিগ্রহের রূপে। বিরাটমূরতি এবে গোটা বিশ্বব্যাপে ॥', অধিকাংশ ভক্ত চান তাঁকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে, আপনজনের মতো তাঁর সঙ্গে সহবাস করতে, নিকট বন্ধুর মতো সুখে-দুঃখে সহমর্মী হতে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 'চিন্ময়'-তনুর পূতাস্থি সংরক্ষিত হয়েছিল একখানি তামার কলসের মধ্যে। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত শয্যার উপর সংস্থাপিত হয়েছিল পূতাস্থির আধার। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-প্রতীকরূপে পূতাস্থির নিত্যপূজা-ভোগরাগাদি চলেছিল।১

এভাবে অতিবাহিত হয় কয়েকটি দিন। ইতিমধ্যে কাশীপুরের বাগান-বাড়ী ছেড়ে দেবার প্রস্তাব ওঠে। মুরুব্বি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এগিয়ে এসে ত্যাগী যুবকভক্তদের জানান গৃহী-ভক্তগণের সিদ্ধান্ত। স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথাতে পাই, "রামবাবু আমাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন,

১ "সেবক ভক্তগণও শয্যার উপর শ্রীগুরুদেবের চিত্রপট স্থাপনপূর্বক সেইদিন হইতেই বিধিমত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নিত্যপূজা আরম্ভ করিলেন," শশিভূষণ ঘোষ কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব।' পৃঃ ৪৬১

কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যান আছে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি-মন্দির পবিত্র গঙ্গারতীরে না হইয়া কাঁকুড়গাছিতে যোগোদ্যানে কিভাবে হইবে তাহা আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমাদের চিন্তার কথা রামবাবুকেও জানাইলাম। রামবাবু কিন্তু কোন কথাই শুনিলেন না। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থি তাঁহার যোগোদ্যানেই সমাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রি বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।"২

মনোমোহন মিত্র তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন: 'দেহাবসানের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সেবকগণকে বলিয়াছিলেন—জাহ্নবীতীরে যেন তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয়। ভক্তগণ তাঁহার চিতা-অবশিষ্ট অস্থি একটি তাম্র-পাত্রে পূর্ণ করিয়া কাশীপুরের বাগানে রাখিয়াছিল। সপ্তাহকাল উত্তীর্ণ হইতে চলিল তখনও গঙ্গাতীরে স্থান সংগ্রহ করা ভক্তগণের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উহা যোগোদ্যানে সমাহিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে ভক্তগণের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একপক্ষ জাহ্নবীতীরেই উহা সমাহিত করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মতে যদিও কাহারও আপত্তি ছিল না, তথাপি সেইরূপ স্থান সেই স্বল্পকালের মধ্যে সংগ্রহ করিতে না পারায় এবং রামচন্দ্র তাঁহার কাঁকুড়গাছিস্থ যোগোদ্যানকে উক্ত কার্যের জন্য উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, পরিশেষে সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন।'৩

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামচন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথার একটি অংশ। গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাস্থি সমাহিত করা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "'সে আমি, হরমোহন, আর কথক, তিনজনে খুঁজে খুঁজে নাকালের একশেষ। এদিকে বালী, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, মায় বাঁশবেড়ে অবধি, আর ওদিকে মণিরামপুর অবধি খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও জায়গা পাওয়া গেল না। মহিম চক্রবর্তী কাঠা দশেক জায়গা দিতে চেয়েছিলেন, তিনিও শেষে সরে পড়লেন।"৪

২ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২২-৩

৩ "ভক্ত মনোমোহন", পৃঃ ১৬০

৪ "তত্ত্বমঞ্জরী" ২০ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃঃ ১৫৮

ইতিমধ্যে বলরাম বসুর পিতা যিনি বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস করতেন তিনি ব্যবস্থা দেন। তিনি বলেন, "সমাধি না দিয়া যদি শুধু অস্থি কোন পাত্রে রক্ষিত হইয়া পূজাদি করা যায় তাহা হইলে কোন দোষ নাই। তবে একটি মহোৎসব করিয়া ঐরূপ ভাবে রাখা যাইতে পারে। বলরামবাবুর ঐ সকল কথা ভক্তমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপিত করায় মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। নিত্যগোপালবাবু বলিলেন, তর্কের উপর তর্ক আছে। তখন অগত্যা স্থির হইল যে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে উহা সমাহিত করা হইবে।" (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৫)

এই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটি চিঠির অংশবিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন: "পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার (সুরেন্দ্র ও বলরামের) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অস্থি সমাহিত করা হয়।...এবং সুরেশবাবু (সুরেন্দ্র) তজ্জন্য ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন।"[৫] ঘটনাপরম্পরা দেখে মনে হয়, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের দানের ইচ্ছা ত্যাগী ভক্তদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পূতাস্থি সমাহিত করার সিদ্ধান্তের পরে। এই সময়কার ঘটনাসংঘাতের উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করবে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ভাষণাংশ। তিনি বলেছিলেন: "Among others, he (Sri Ramakrishna) left a few young boys who had renounced the world, and were ready to carry on his work. Attempts were made to crush them. But they stood firm, having the inspiration of that great life before them...At first they met with great antagonism, but they persevered..."[৬]

রামবাবু তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে চলে যান, ত্যাগী ভক্তেরা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, হতাশায় তাঁদের মন সমাচ্ছন্ন হয়। রাত্রিবেলা। কাশীপুরের বাগানে বসেছিলেন ত্যাগী সন্তানদের অনেকেই। রামবাবুর সিদ্ধান্তে তাঁরা বিভ্রান্ত বোধ করেন। যুবক নিরঞ্জন বলে ওঠেন—'আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থি

---

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠখণ্ড, পৃঃ ৩২৯

৬ The Complete Works of Swami Vivekananda (Mayavati Memorial Edn) Vol, V, p. 186.

কিছুতেই রামবাবুকে দেব না!' শশীও বলেন—'কলসী দেব না।' উপস্থিত সকলেই সমর্থন করেন, শশী.ও নিরঞ্জনের নেতৃত্বে অর্ধেকেরও উপর ভস্মাবশেষ ও অস্থিনিচয় বের ক'রে একটি কৌটায় রাখা হ'ল এবং কৌটাটি ভক্ত বলরাম-বাবুর বাড়ীতে নিত্যপূজার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।'[৭] পূতাস্থি কৌটায় তুলে রাখার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ছাখো. আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থান। এসো আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই ও পবিত্র হই।' সর্বপ্রথম নরেন্দ্রনাথ, তারপর তাঁকে অনুসরণ করে অন্য ত্যাগী ভক্তেরা সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করে গ্রহণ করলেন।[৮] রামকৃষ্ণ ভাবাগ্নি যেন তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

এই সময়কার ঘটনার সারাংশ পাওয়া যায় অক্ষয়কুমার সেনের বর্ণিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে। 'কর্তৃত্বাভিমানী' রামচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখেছেন :

"প্রভুর বিরহে মাত্র দিনত্রয় খেদ।
পরে গৃহী সন্ন্যাসীতে লাগিল বিচ্ছেদ॥
... ...
গৃহীদের মধ্যে একা কার্যকারী রাম।
... ...
সব কর্মে অগ্রসর কর্তৃত্বাভিমানে।
অন্য যত সহকারী রামের পেছনে॥
রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি।
কোথায় এতেক টাকা-কড়ি পাব আমি॥
বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে দুই দলে।
চারি পাঁচ দিবস ক্রমশঃ গেল চলে॥
শ্রীপ্রভুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি।
কিন্তু এই কর্মে বেশী রামের বিকুলি॥
সন্ন্যাসী বালকবর্গে বুঝায়ে বিহিত।
কাঁকুড়গাছিতে মত কৈল স্থিরীকৃত॥[৯]

৭ 'উদ্বোধন', ১৭ বর্ষ, পৃঃ ৪৪০
৮ 'আমার জীবনকথা', পৃঃ ১২৩
৯ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি', পৃঃ ৬৩২

কাঁকুড়গাছিতে ছিল রামচন্দ্রের বাগান, তার নিকটেই ছিল সুরেন্দ্রনাথের বাগান। শ্রীঠাকুরের নির্দেশে 'একশ খুন হলেও কেউ জানতে পারে না' এমন একটি জায়গা খুঁজতে খুঁজতে রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছির এই বাগানটি বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর এই বাগানে গিয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর। বাগানে পদার্পণ করেই তিনি বলেছিলেন, 'আহা বাগানটি তো বেশ। এইরকম বাগানে যেন আছি, একদিন দেখেছিলাম।' বাগানের মধ্যে একটি পুকুর। পুকুরের জল পান ক'রে তিনি বলেছিলেন, 'পুকুরের জলটি ত বেশ মিষ্টি।' শ্রীঠাকুর রামচন্দ্রকে বলেছিলেন বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করতে। উপরন্তু তিনি বাগানটির নাম দিয়েছিলেন যোগোদ্যান।[১০] বাগানের ভিতর একটি তুলসীকানন দেখে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়।'[১১] তিনি পুকুরের দক্ষিণের দিকের ঘরটিতে বসেছিলেন এবং রামচন্দ্র-নিবেদিত বেদানা, কমলালেবু ও কিছু মিষ্টি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করতে করতে গ্রহণ করেছিলেন।

রামচন্দ্র বাগানের 'তুলসী-কানন-অংশ' শ্রীঠাকুরের পূতাস্থির সমাধির জন্য দান করতে অগ্রসর হন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় মতবিরোধ ক্ষান্ত হয়, সকলের মন সাময়িকভাবে হলেও শান্ত হয়। নিকটবর্তী জন্মাষ্টমীর তিথি পূতাস্থি সমাধির জন্য স্থির হয়।

পরবর্তী তথ্যের জন্য আমরা মনোমোহন মিত্রের স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করব। তিনি লিখেছেন '৭ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর পূর্বরাত্রে কাশীপুরে রক্ষিত তাম্রকলসটির নিত্যনিয়মিত পূজা সুসম্পন্ন হইলে ভক্তচূড়ামণি শশী ও বাবুরাম উহা বাগবাজারে বলরামবাবুর গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহযোগিতায় উহা রামচন্দ্রের গৃহে আনীত হইয়াছিল।' অক্ষয়কুমার সেনের লেখা হতে জানতে পারি 'সমাধি-দিনের ঠিক পূর্বেকার রেতে। (রাম) কলসি লইল তবে আপনার হাতে।'[১২]

পরের দিন জন্মাষ্টমী, ১২৯৩ সাল ৮ই ভাদ্র, (সোমবার), সকালবেলা ভক্তগণ পূতাস্থি পূর্ণ কলসীটি চন্দনে চর্চিত করেন ও ফুলের মালা দিয়ে

---

১০ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬৪ ৬

১১ কথামৃত ৫।১৩।১

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি, পৃঃ ৬৩২

সাজান। তারপর ভক্তগণ একে একে এসে প্রণাম করেন। ভক্তদের প্রণাম শেষ করতে বেলা আটটা বেজে গেল।১৩

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট সংখ্যায় The Indian Mirror পত্রিকা লিখেন: "A *sankitan* procession in commemoration of this solemn event, started from Simla at 8·30 A.M. yesterday." আর ১২৯৩ সালের ১২ই ভাদ্র সংখ্যায় 'সুলভ সমাচার' ও 'কুলদাহ' লিখেছেন, 'গত সোমবার প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সঙ্কীর্তন সহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের অস্থিপূর্ণ তাম্রকলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন. দলে অনুমান পঞ্চাশ জন[১৪] ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল করতাল সিঙ্গা-সহ বিডন ষ্ট্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সঙ্কীর্তনের দল, তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নবরচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন, পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন! ফুলের মালায় কলসীটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানীযোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুইদিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্বপশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত-মস্তকে গমন করিতেছিলেন।"[১৫]

সিমুলিয়া ষ্ট্রীট হতে যাত্রা করে ভক্তের দল 'জয় রাম...' ধ্বনিতে তাদের হৃদয়ের বেদনা, আবেগ ও আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথকে

---

১৩ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬১

১৪ এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বরে The Indian Mirror পত্রিকার ঘোষণা: "The other day his ashes were buried in the garden house of one of his disciples, on which occasion hundreds of educated persons were present. A procession of several graduates and undergruadates of the University was formed when the ashes were conveyed to the garden house."

১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস: 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', পৃঃ ৫০-৫১

পুরোভাগে রেখে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ এগিয়ে চলেন। সেবক শশিভূষণ অস্থি-কলসটি সযত্নে মস্তকে ধারণ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন। কীর্তনের দল গাইতে থাকে গিরিশচন্দ্র রচিত চৈতন্যলীলার একখানি গান—

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
(আমি) ভবে একা দাওহে দেখা প্রাণসখা রাখ পায় ॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলে উদাসী কুল ত্যাজে অকূলে ভাসি
কোথা হৃদাবিহারী আছ হরি পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় ॥১৬

দলটি ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীর কাছে পৌছালে অমৃতলাল বসু ও ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতা কয়েকজন যোগদান করেন। দলটির প্রথমভাগে রইলেন বৈষ্ণবচূড়ামণি বলাইচাঁদ গোস্বামী আর শেষের দিকে রইলেন ষ্টার থিয়েটারের দল। সঙ্কীর্তন ও জয়ধ্বনির গম্ভীর মধুর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে এগিয়ে চলে দলটি।

৮০নং কাঁকুড়গাছিতে ছিল রামচন্দ্রের উদ্যান। বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছিল। পাতা-ফুল দিয়ে বাগানটিকে সাজান হয়েছিল। ইট দিয়ে বাঁধান হয়েছিল সমাধি-গহ্বর। বৈষ্ণব-প্রথামত অস্থিপূজা শেষ ক'রে অস্থি-কলস গহ্বরে স্থাপন করা হয়। কলসীর উপর মাটি ফেলতে থাকলে সেবক শশী আর্তনাদ করে ওঠেন, "ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে ;" তাঁর কথায় অনেকেরই চোখে জল এসে যায়। সবাই প্রাণে মনে ক্ষণেকের জন্য হলেও অনুভব করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সদা-বিরাজমান। তিনি জীবন্ত সচেতন বিগ্রহ। তিনি তাঁদের সাথে রয়েছেন।

রামচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শেষদিনের আজ্ঞা ছিল 'হাঁড়ি-হাঁড়ি ডাল-ভাত'।১৭ তদনুযায়ী হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হ'ল। খিচুড়ী-ভোগ উপস্থিত ভক্তদের বিতরণ করে দেওয়া হ'ল। পাশে

১৬ একদিন গিরিশচন্দ্র রামচন্দ্রকে আবেগভরে বলেছিলেন : "এই চৈতন্যলীলাই আমার সব। এই থেকে আমি গুরুকৃপা লাভ করলুম। সব কথা মনে পড়ছে—ঠাকুরকে যেদিন মাথায় করে এনে এখানে বসালুম সেদিনও সেই চৈতন্যলীলা, 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়' ?" (তত্ত্বমঞ্জরী ২০ বর্ষ, পৃঃ ১৫৭)

১৭ রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৫৫

সুরেন্দ্রনাথের বাগানে[১৮] কাঙ্গাল ও গরীবদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়ান হ'ল। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি উৎসব প্রাঙ্গণকে আনন্দমুখর ক'রে রেখেছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় নিত্যগোপাল বসু সমাধিস্থানে সন্ধ্যারতি করেন ও সায়ংকালীন ভোগ দেন। সেদিন ভোগ দেওয়া হয়েছিল কলা মুড়কী ও বাতাসা।[১৯] সেদিন রাত্রে ত্যাগী সন্তানেরা সকলেই যোগোদ্যানে থেকে যান।[২০] এভাবে সম্পূর্ণ হয় কাঁকুড়গাছিতে পূতাস্থি সমাধি-উৎসব।

বলাবাহুল্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিরক্ষার এই দীন সামান্য আয়োজনে তাঁর ত্যাগী সন্তানেরাই যে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তাই নয়, জনসাধারণের মধ্য হতেও অতৃপ্তি অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ তারিখের The Indian Mirror পত্রিকায় রাজেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদককে লিখেছিলেন: 'Permit me to appeal, through the medium of your widely-circulated journal, to the large scale of disciples and admirers of the late Ramkrishna Paramhansa to set on foot a public subscription for perpetuating his memory... when we are ready to open our purse-strings to raise monuments to those who distinguished themselves in war and politics, would it not be an act of base ingratitude not to honour in some suitable way the memory of that spiritual captain who has valiantly made war on our behalf not against any earthly King or Kaiser—not against any temporal grievances but against the eternal enemies of mankind against death and hell ?'[২১]

ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎ লীলাময় ভগবানের লীলাক্ষেত্র। ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটে ঘটনাবৈচিত্র্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা

---

১৮ শ্রীঠাকুর এই বাগানে দুবার গিয়েছিলেন। একবার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর। আরেকবার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন —সেদিন সেখানে মহোৎসব হয়েছিল।

১৯ ভক্ত মনোমোহন, পৃঃ ১৬২

২০ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১২৪

২১ 'Vedanta for East and West', Vol. 129, p. 2-3

বই একটি পাতাও নড়বার যো নাই।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কি তার তাৎপর্য না বুঝে মানুষ ছটফট করে সময় সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাবার পর ক্রমে ক্রমে তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কালস্রোতে ভাসমান স্মৃতি-নৌকা ঘটনার নূতন নূতন ভাবব্যঞ্জনা সম্ভার নিয়ে ঘাটে ঘাটে এসে নোঙর ফেলে এবং সেই ভাববৈচিত্র্যের সম্পদ দেখে মুগ্ধ হন ভক্তগণ। রামকৃষ্ণলীলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট। ঘটনার ভাবতরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে ক্রমশঃ দিনে দিনে আবিষ্ট ভক্তগণকে আকৃষ্ট করছে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের প্রতি, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত নূতন যুগের প্রতি। সেকারণেই দিনটি বিশেষ স্মরণযোগ্য।

রামকৃষ্ণ মঠে প্রথম কালীপূজা

"বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন।...ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা।... শশী নিত্যপূজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। নরেন্দ্র বলিলেন, সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদ পুরাণ ও তন্ত্রমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে, কখনও গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল।"[১]

এবার নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করেন মঠে কালীপূজা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না,—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ ভেদ।"[২]

"তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।"

তন্ত্রে কালী লীলাময়ী মহাশক্তি। তিনিই সাংখ্যের প্রকৃতি ও উপনিষদের অব্যাকৃত বা অব্যক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণের গিন্নি বা গিন্নির ন্যাতা-কাতার হাঁড়ি। কালের কর্ত্রী কালীর অফুরন্ত লীলাব্যঞ্জনা বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত। বিশ্বজননী লীলাময়ী কালীই লোককল্যাণার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ

১ কথামৃত ৩, পরিশিষ্ট ১

২ কথামৃত ১।২।৪

ধারণ করে অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার সমাপনান্তে শ্রীমা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সসংবেদ্য অনুভব,—শ্রীরামকৃষ্ণ মাকালী বৈ ত ন'ন। স্বামী বিবেকানন্দও ভগিনী নিবেদিতার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ অবলম্বন করে মাকালীই জগৎকল্যাণে ব্যাপৃত। ব্যক্তিবিশেষের অনুভূতির মধ্যেই এই তত্ত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই দেখি, শ্যামপুকুরে ৺শ্যামাপূজার সন্ধ্যায় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ সমবেতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে আবির্ভূত রামকৃষ্ণকালীর পূজা করেছিলেন।

নরেন্দ্র একসময়ে মাকালীকে মানতেন না, মূর্তিপূজাকে কটাক্ষ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে নরেন্দ্র চিন্ময়ী মাকালীর কৃপালাভ করেছিলেন। নরেন্দ্র মাকালীকে হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুশীতে ডগমগ হয়ে ভক্তদের বলেছিলেন: "নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?" মাকালীকে শুধু মানা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নরেন্দ্রকে মাকালীর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন।৩

শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে জগন্মাতার লীলা অপ্রকট হলে রামকৃষ্ণ-সন্তানেরা এসে মিলিত হন বরাহনগরের একটি পোড়ো বাড়ীতে—ত্যাগী সন্তানদের সমবেত চর্যায় গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণ মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির কয়েকদিন পরে তাঁর ভক্ত ও 'রসদ্দার' সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এক দিব্যদর্শনের মাধ্যমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পান। তিনি অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছুটে যান নরেন্দ্রনাথের নিকটে, নরেন্দ্র বরাহনগরে ভুবন দত্তের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়ীটি সস্তায় ভাড়া নেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীসন্তানদের একত্র করে রামকৃষ্ণ মঠ গড়ে তোলেন। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার প্রবর্তনার এই সুপ্রচলিত অলৌকিক কাহিনী ছাড়াও ভিন্ন একটি লৌকিক কারণ নির্দেশ করেছেন শশীভূষণ ঘোষ। তিনি লিখেছেন, "কিছুদিন পূর্বে সুরেশচন্দ্র তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীকালীমাতার একখানি তৈলচিত্র নিজগৃহে স্থাপন করিবার জন্য মনোমত করিয়া চিত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমূর্তি উগ্রভাবে চিত্রিত দেখিয়া বাটীর কর্তৃপক্ষ

---

৩ শঙ্করীপ্রসাদ বসু: নিবেদিতা লোকমাতা: 'অধ্যাত্মরাজ্যের গোপন দলিল': স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "And Ramakrishna Paramhamsa made me over to Her." Sister Nivedita: The Master as I saw him, p. 214: "Ramakrishna Paramhamsa dedicated me to Her (Kali)."

তাহা গৃহে রাখিতে নিষেধ করেন। সুরেশচন্দ্র সেই চিত্রপট কাশীপুরের বাগানে শ্রীগুরুদেবের কক্ষে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনস্বরূপ সেই চিত্রপট এখন কোথায় লইয়া যাইবেন?...সুতরাং তিনি চিত্রপট রক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁর মনে হইল, কেবল বাটী ভাড়া করিলে চলিবে না। তাঁহার চিত্রপটের রক্ষকস্বরূপ লোকের আবশ্যক। দুই তিন ভক্তের (লাটু প্রভৃতির) থাকিবার স্থান নাই। তাঁহারা এই কার্যের ভার লইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিশেষতঃ সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার পূজাকার্য যাহা ইতঃপূর্বে (কাশীপুর বাগান-বাটীতে) আরম্ভ হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবে না। বরাহনগরে গঙ্গার সন্নিকটে জমিদার মুন্সীবাবুদের পুরাতন ভগ্নবাটী ১০ টাকা ভাড়া স্থির করিয়া শ্রীসুরেশ-চন্দ্র শ্রীগুরুদেবের শয্যাদি সমস্ত দ্রব্য ও শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্রপট জনৈক ভক্তের দ্বারা ভাড়া বাটীতে স্থানান্তরিত করিলেন। এইরূপে নিঃশব্দে, নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল।" লেখক আরও মন্তব্য করেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আদ্যাশক্তির লীলাভূমি। বাল্যকালে মঙ্গল-চণ্ডিকা বিশালাক্ষীদেবীর দর্শনপথে তাঁহার মানসচক্ষে যে মহাশক্তি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সর্ববিধসাধনে সিদ্ধ করেন, এখন চিত্রপটে বিরাজিতা সেই সর্বশক্তিস্বরূপিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একত্রে মিলন।"[৪] উপযুক্ত পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘও ইতিহাসের বিচারে কালীশক্তির লীলাভূমি বৈ ত নয়।

"(বরাহনগরের মঠ) বাটিটী অতি প্রাচীন, টাকীর জমিদার মুন্সিবাবুদের। একটি ঘরে ভবনাথবাবুদের আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার লাইব্রেরী ছিল এবং সময় সময় সভার অধিবেশনও সেই ঘরে হইত। বাকী পাঁচ ছয়টি ঘরে আমাদের মঠ হইল।"[৫] "(মঠবাড়ীর) পেছনের দিকে শাকসবজির বাগান, সজনে গাছ, একটি বেলগাছ ও কয়েকটি নারিকেল ও আমের গাছ ছিল। একটি পুষ্করিণীও ছিল।...একটি উড়ে মালী ছিল, তাকে কেলো বলে ডাকতো।...নীচের তলাটার ভিতর বাড়ীর দিকে বহুকালের আবর্জনায় ও

৪ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, পৃঃ ৪৬২-৩

৫ মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত 'বিবেকানন্দ-চরিত' গ্রন্থে ১৩২৬ সনের ১০ই কার্তিক তাং লেখা স্বামী শিবানন্দজীর ভূমিকা।

জঙ্গলে এমন ভরে গেছলো যে, তা শেয়ালের ও সাপের বাসা হয়েছিল। কেউ ভয়ে সেদিকে যেত না।...উপরতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকে কালী তপস্বীর ঘর, পরে ছোট ধাপ দিয়ে উঠে ও নেমে ভিতরের দিকে পূজার যোগাড়ের ঘর (যার মধ্যে মেঝেতে একটি ১ হাত × ১ হাত পরিমিত চৌকো মাটির হোমকুণ্ড ছিল), তার ভিতর দিয়ে ঠাকুরঘরে যেতে হত। দালান ঘর দিয়ে সোজা গিয়ে সামনে রান্নাঘর, বাম হাতে লম্বা হলঘর (যাকে দানাদের ঘর বলা হত), তারপর পাশে খাবার ও মুখ-হাত-পা ধোবার ঘর, তারপর একটু অন্ধকার গলি পার হয়ে পাইখানা, নীচে সিঁড়ি নেমে বাগানের ভিতর দিয়ে পুকুরে যাবার পথ।...ঠাকুরঘরে মাঝখানে ঠাকুরের বিছানা—ভূমির উপর মাদুর, গদি, বালিশ, চাদর দিয়ে করা ছিল ও ঠাকুরের ফটো ছিল। বিছানার পাদদেশে ঠাকুরের অস্থির তাম্রকৌটা ও পাদুকা চৌকিতে রাখা ছিল।"৬

সাত মাসের উপর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশই মঠে যোগদান করেছেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে কালীপ্রসাদ, শরৎ ও বাবুরাম পুরীধামে যান এবং প্রায় ছমাস সেখানে সাধনভজন করেন।৭ ৭ই মে নিরঞ্জন তাঁর গর্ভধারিণী জননীকে দেখতে যান। ইতিমধ্যেই গঙ্গাধর পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। হরি ও তুলসী মাঝে মাঝে মঠে আসেন। হরিপ্রসন্ন তখনও মঠে যোগ দেন নি। ইতিমধ্যে ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশ বিরজাহোম করে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।৮

মঠের অবিসংবাদিত নেতা নরেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মঠে কালীপূজা করবেন। মঠের অন্যতম অন্তেবাসী তাপস লাটু বলেন: "একদিন নরেনভাই এসে বললে—কালীপূজা করবো। অমনি সুরেন্দরবাবু কালীপূজার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন।"৯ আমাদের স্মরণ রাখা দরকার, নরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই শ্রীগুরুর নির্দেশে বহুবিধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বহু-আকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প-ভূমির উত্তুঙ্গ-

---

৬ স্বামী বিরজানন্দ বর্ণিত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ: অতীতের স্মৃতি, পৃ: ৩৫-৭

৭ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃ: ১৪৭

৮ আলোচ্যকালে মঠবাসীদের সন্ন্যাস নাম ব্যবহারের প্রচলন হয়নি। সেকারণে এখানে তাঁদের পূর্বাশ্রমের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৯ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃ: ২৮৬

শিখরে আরোহণ করেছিলেন এবং জগন্মাতানির্দিষ্ট লোকসংগ্রহের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধির চাবিকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। আবার এদিকে দেখি নরেন্দ্রনাথ ৭ই মে (১৮৮৭) তারিখে মাষ্টার মশাইকে বলছেন: "কত দেখলুম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে! কত কালীরূপ; আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শান্তি হচ্ছে না।"১০ আবার তিনি মাষ্টার মশাইকে কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন: "সাধনটাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। ...আমাদের তিনি সাধন করতে বলেছেন।"১১

নরেন্দ্রনাথ মহামায়ার প্রসন্নতালাভের জন্য কালীপূজার আয়োজন করেন। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" কথামৃতকার লিখেছেন, "পরদিন মঙ্গলবার, ১০ই মে (১৮৮৭)। আজ মহামায়ার বার। নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা আজ বিশেষরূপে মার পূজা করিতেছেন। ঠাকুরঘরের সম্মুখে ত্রিকোণ যন্ত্র প্রস্তুত হইল, হোম হইবে। পরে বলি হইবে। তন্ত্রমতে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে।"১২

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে মহামায়ার বিশেষ পূজার প্রস্তুতি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে গেলে তার পটভূমিকা জানা দরকার। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ মাষ্টার মশাই শনিবার দিন (৭ই মে) অপরাহ্ণে বরাহনগর মঠে এসেছেন, দিন পাঁচেক থাকবেন[১৩] ও দেখবেন 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন।' কয়েকদিন বাস করে মাষ্টার মশাই দেখেন 'সকলেই রহিয়াছেন; সেই অযোধ্যা, কেবল রাম নাই।' তিনি আরও দেখেন, 'ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-

১০ কথামৃত ২, পরি ১

১১ কথামৃত ৩, পার-২

১২ কথামৃত ১, পরি-১

১৩ মাষ্টার মশায় এই কয়েকদিনের আংশিক বিবরণী তিনটি পরিচ্ছেদে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার অষ্টমবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩১১ সাল)। তার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ, বরাহনগর মঠের প্রাথমিক পরিচিতি 'কথামৃত' তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ কথামৃত প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে 'বরাহনগর' শীর্ষক নিবন্ধে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম স্তবকমাত্র 'মঠের ভাইদের সাধনা' নিবন্ধে কথামৃতের প্রথম ভাগের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঠাকুর বেশী দিন চলিয়া যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে।'

রবিবারে গৃহস্থভক্তেরা কেউ কেউ মঠ দর্শন করতে আসতেন। সে সময়ে মঠে যোগবাশিষ্ঠের পাঠ ও আলোচনা খুব চলেছিল। বৈরাগ্যের প্রেরণায় সারদাপ্রসন্ন হেঁটে বৃন্দাবন রওয়ানা হয়েছিলেন, কিন্তু কোন্নগর থেকে ফিরে আসেন। ঈশ্বরদর্শনের জন্য মঠবাসীরা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল, সকলেরই প্রাণে আঁটুপাটু ভাব। সর্বোপরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ভালবাসা স্মরণ করে সকলেই অশ্রু বিসর্জন করেন আর বলেন: "আমরা তাঁর কি করেছি যে এত ভালবাসা। কেন তিনি আমাদের দেহ মন আত্মার মঙ্গলের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন?..." মাষ্টার মশাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন ত্যাগী গুরুভাইদের সৎপ্রসঙ্গ। নরেন্দ্র বলেন: "তিনি (ঠাকুর) বলতেন বিশ্বাসই সার। তিনি ত কাছেই রয়েছেন! বিশ্বাস করলেই হয়! ...যতক্ষণ কামনা, বাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস।"

সোমবার সকালে মঠের বাগানের গাছতলায় বসে নরেন্দ্র তাঁর প্রাণ-মাতানো কণ্ঠস্বরে শঙ্করাচার্যরচিত 'শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্' আবৃত্তি করেন, "ছাড় মোহ, ছাড়রে কুমন্ত্রণা" গান গেয়ে শোনান, 'কৌপীনপঞ্চকম্', 'নির্বাণষট্কম্' ও 'বাসুদেবাষ্টকম্' সুর করে আবৃত্তি করেন। সব কিছুর মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রের অন্তঃকরণের তীব্র-বৈরাগ্যের উত্তাপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আহারের পর নরেন্দ্র তারক ও হরিশকে নিয়ে কলকাতায় যান। নরেন্দ্রের বাড়ীর মোকদ্দমা এখনও মেটেনি। আহারের পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করছেন, এদিকে বুড়োগোপাল তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে একটি গানের খাতা থেকে নকল করছেন। মাষ্টার মশাই তাঁর কাছে গিয়ে বসেন। কথা-প্রসঙ্গে বুড়োগোপাল বলেন তাঁর এক গুহ্য অভিজ্ঞতার কাহিনী।

বুড়োগোপাল: "এটা কাউকে বলিনি—কল্যাণেশ্বর গেছি—শিবরাত্রির উপোস করে শিবপূজো করতে গেছি—হঠাৎ দেখি লিঙ্গ ঠেলে উঠ্‌লো—তাঁর পাশে শিব ও বৃষবাহন ও শক্তি। জীবন্ত চৈতন্যময়!"১৪ মুগ্ধবিস্ময়ে মাষ্টার মশাই শোনেন এই দিব্যকাহিনী।

১৪ শ্রীযুত মাষ্টার মশাইর ডায়েরী, পৃঃ ১৮৩

বিকালে রবীন্দ্র[১৫] উন্মত্তের মত মঠে উপস্থিত হন। শুধু পা, ধুতি আধখানা পরা, উন্মাদের ন্যায় তাঁর চোখের চাহনি। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর অনেক সদ্‌গুণ। ইদানীং এক বারাঙ্গনার মোহে পড়ে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন। বেশ্যাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে আজ তিনি মঠে এসে উঠেছেন। যুবক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, সুতরাং মঠবাসীরা তাঁকে আশ্রয় দেন। রাত্রে নরেন্দ্র মঠে ফিরে রবীন্দ্রের কাহিনী শোনেন। দানাদের ঘরে বসে নরেন্দ্র "ছাড় মোহ, ছাড়রে কুমন্ত্রণা" ইত্যাদি ও "পীলে রে অবধূত হো মতবারা" ইত্যাদি গান দুটি গেয়ে যেন রবীন্দ্রের শুভবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণ নরেন্দ্র পাঠ করে শোনান। শশী মন্তব্য করেন: "আমি বলি কেউ কারুকে প্রেম দিতে পারে না।" নরেন্দ্র বলেন: "আমায় পরমহংস মশাই প্রেম দিয়েছেন।"

পরদিন মঙ্গলবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া, ২৮শে বৈশাখ, ১২৯৪ সাল। ইংরাজী ১০ই মে। মঠের ভাইরা কালীপূজা করবেন। কালীপূজার প্রস্তাবে সকলেই বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন। নরেন্দ্র বলিদানের প্রস্তাব করেছেন, মঠের কোন কোন অন্তেবাসী সায় দিতে পারেন না। কারুর কারুর মনে খটকা বাধে। বিশেষ করে সেই সময়ে দয়াবতার বুদ্ধদেব ও প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চর্চাতে মঠবাসীরা মেতে উঠেছিলেন। মঠের তাপসদের মতবিভিন্নতার ছবি এঁকেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। "সম্ভবতঃ ১৮৮৭ সালে বরাহনগর মঠের প্রথম কালীপূজা বা অপর কিছু হইয়াছিল। তাহাতে পাঁঠাবলি দেবার কথা হয়। তাহাতে রাখাল মহারাজ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মত ছিল না। জনকয়েকের সেইরূপই মত—বলি হইবে না; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা, বলি দেওয়া হইবে। তিনি জোর করিয়া বলিলেন, "আরে একটা পাঁঠা কি, যদি মানুষ বলি দিলে ভগবান পাওয়া যায় তাই করতে আমি রাজী আছি।"[১৬] বলাবাহুল্য, স্থির হয় পাঁঠা বলি দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দ বলিমাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

---

১৫ মাষ্টার মশাইর ডায়েরীতে নামটি পাই 'জ্যোতিন' বা 'যোত্তিন'। সম্ভবতঃ যুবক দুটি নামেই পরিচিত ছিলেন।

১৬ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১১২

"সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্বীর্য, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন!...বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অনুকল্পমাত্র। হৃদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। সর্বত্যাগে অমরত্বলাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্যালাভ, ধনজন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলিমাহাত্ম্য নিত্যপ্রত্যক্ষ।"১৭ এখানে মঠবাসিগণের তনু-মন-প্রাণ ভগবৎ-চরণে উৎসর্গীকৃত। সেই কারণে ত্যাগের অনুকল্প পশুবলির মাধ্যমে তাঁদের শক্তিপূজা হয় সার্থক।

মঙ্গলবার সকালবেলা। নির্মল আকাশ। মাষ্টার মশাই গঙ্গাস্নানে যান। রবীন্দ্র মঠবাড়ীর ছাদে বেড়ান। এদিকে নরেন্দ্র ভাবাবেগের সঙ্গে স্তব করেন,

'ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ-নেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।'১৮

তারপর নরেন্দ্র গান ধরেন: 'পীলে রে অবধূত হো মতবারা, প্যালা প্রেম হরিরসকা রে।' ইত্যাদি।

নরেন্দ্র বুড়োগোপালকে পাঠিয়েছিলেন বলিদানের উপযুক্ত একটি ছাগল বা ভেড়া জোগাড়ের জন্য। গোপাল কিছুক্ষণ পরে এসে জানান যে উপযুক্ত ছাগল বা ভেড়া জোগাড় করা গেল না। শশী পূজার আয়োজন করতে ব্যস্ত ছিলেন, নরেন্দ্র শশীকে ডেকে বলেন: তুই একবার যা না।

শশী: ছাগল সঙ্গে করে আনা—আরেকজন কারুকে সঙ্গে দাও তো ভাল হয়।

নরেন্দ্র: তুই নিজে একবার যা না।

শশীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরেন্দ্র তাকে যেতে বারণ করেন। নরেন্দ্র

১৭ শক্তিপূজা, উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৫৭
১৮ নির্বাণষট্‌কম্

সুমিষ্টস্বরে গীতাপাঠ করতে থাকেন। শশী নিজেই পূজার বিভিন্ন আয়োজন শেষ করে পূজা করতে বসেন।[১৯]

বেশ কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র গীতাপাঠ সমাপ্ত করে বেরিয়ে যান বলির পশু জোগাড়ের জন্য। সেসময়ে মাষ্টার মশাই যান ৺চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলার মন্দিরে। মন্দিরে প্রণামাদি সেরে তিনি নিকটেই মহিমা চক্রবর্তীর বাড়ীতে যান। মহিমা পাণ্ডিত্যাভিমানী। নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। মাষ্টারমশায়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রাদ্ধাদি কর্মে পশুবলির বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করেন।

মাষ্টার মশাই মঠে এসে দেখেন রবীন্দ্র গঙ্গাস্নান করে ভিজে কাপড় নিয়েই ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে এসেছেন। নরেন্দ্র মাষ্টার মশাইকে বলেন: এই নেয়ে এসেছে, এবার সন্ন্যাস দিলে বেশ হয়।

মাষ্টার মশাই: জোর করে দেও না।

সারদাপ্রসন্ন একখানা গেরুয়া কাপড় এনে দেন। নরেন্দ্র (মাষ্টার মশায়ের প্রতি): "এইবার ত্যাগীর কাপড় পরতে হবে।" মাষ্টার মশাই (সহাস্যে): "কি ত্যাগ?" নরেন্দ্র: "কামকাঞ্চনত্যাগ।" রবীন্দ্র গেরুয়া বসনখানি পরে কালীতপস্বীর ঘরে ধ্যান করতে বসেন। ঠাকুরঘরে শশী নিত্যপূজার পর মহামায়ার বিশেষ পূজা করছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে শোনা যায় ধ্যানের মন্ত্র:

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনৃমুণ্ডযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাম্।
বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতি বিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্॥

মঠের ভাইয়েরা কেউ ধ্যান করছেন, কেউ স্তবপাঠ করছেন, কেউ তন্ত্রধারকের কাজ করছেন। দিব্যভাবে ঠাকুরঘর গম্‌গম্ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমূর্তির ভাব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: "হস্তে খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, পদতলে শিব, এসকলের ভাব এই—জীব কালীর শরণাগত হইলে প্রথমেই খড়্গদ্বারা রিপুদিগকে খণ্ডন করেন। রিপু সকল খণ্ড খণ্ড হইলে তাহারা কোথায়

১৯ লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাই: "হররখৎ শশী ভায়ের চিন্তা ছিলো ঠাকুরের সেবা কেমনভাবে চলবে, কি কি দেওয়া হবে, আর কখন কোনটা দেওয়া হবে। তাঁর পূজার সব কাজ সে নিজে হাতে করতো।…হামাদের বলতো—তোদের কোন ভাবনা নেই, তোরা সাধনভজন নিয়ে পড়ে থাক। এঁর (ঠাকুরের) দৌলতে সব জুটে যাবে।" (পৃঃ ২৮২-৩)

যাইবে, তাহাদিগকে স্বয়ং গলদেশে এবং হস্তে রাখিয়া দেন অর্থাৎ তাঁহাতেই থাকে।, দক্ষিণ হস্তে জীবকে বলিতেছেন, এস বাবা হরিনামে বিহ্বল হইয়া নৃত্য কর। পদতলে শিব কেন? জীব অষ্টপাশ ছেদন করিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। শিব হইয়া শবত্ব অর্থাৎ যখন ষোল আনা মন সেই ব্রহ্মে লীন হয়, তখন আর মন বিষয়ে না থাকা প্রযুক্ত সংজ্ঞাশূন্য সমাধি প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে ব্রহ্মময়ী হৃদয়ে আসিয়া উদয় হন।…"[২০] আর স্বামীজী বলতেন: "কালীমূর্তিই ভগবানের perfect manifestation।"[২১] সৃষ্টি স্থিতি লয় সব কিছুরই যে কর্তা তিনি—এই ভাবটি কালীমূর্তিতে পরিস্ফুট। লীলাময় ব্রহ্মই কালী।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের ঘরে মাটির হোমকুণ্ডতে ত্রিকোণযন্ত্র প্রস্তুত করেন। তন্ত্ররাজ-তন্ত্রমতে "বিন্দু শিবাত্মক।…বিন্দুই উচ্ছুন হয়ে ত্রিকোণাকার প্রাপ্ত হয়।…বিন্দু পরাশক্তি।…ত্রিকোণ ত্রিবীজস্বরূপ। ত্রিবীজ অর্থ ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্ত্রের বাগ্‌ভব, কামরাজ এবং শক্তি এই ত্রিখণ্ডাত্মক বীজ বা কূট।… এই ত্রিকোণের তিন কোণে আছেন তিন দেবী। কামেশ্বরী অগ্রকোণে, বজ্রেশ্বরী দক্ষিণকোণে এবং ভগমালিনী বামকোণে। এই তিনজনই চক্রের আবরণদেবতা—এদের বলা হয় অতিরহস্যযোগিনী।'[২২]

বলিদানের পর ত্রিকোণযন্ত্রের উপর হোম হবে। হোমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বেদ্য সব কিছুই হবি, ইন্দ্রিয়সমূহ স্রুক্। জীবে অবস্থিত পরমশিবই অগ্নি এবং জীব এখানে হোতা। হোমের অপরোক্ষফল সাধকের পারমার্থিক স্বরূপলাভ, নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকার।

পূজক শশীর পূজা শেষ হলে সারদা লক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসেন উৎসর্গের জন্য। পশুর গলায় রক্তমাল্য। নরেন্দ্রনাথ ভূতাপসারণ করে অর্ঘজলে পশুর প্রোক্ষণ করেন, মন্ত্র বলেন, 'উদ্‌বুধ্যস্ব পশো ত্বং হি নাপরস্ত্বং শিবোঽসি হি। শিবোৎকৃত্যমিদং পিণ্ডমতস্ত্বং শিবতাং ব্রজ।' (হে পশু, উদ্বুদ্ধ হও, তুমি শিব, অপর কেউ নও। তোমার এই পিণ্ড শিবের

---

২০ সেদিন তারিখ ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীঃ। স্থান দক্ষিণেশ্বর। শ্রোতা—মনোমোহন রাম সুরেন্দ্র নরেন্দ্র ও নৃত্যগোপাল। (তত্ত্ব-মঞ্জরী, নবম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৃঃ ২৫৯)

২১ শিবানন্দবাণী, প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ১৪৭

২২ উপেন্দ্রকুমার দাস: শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ৮৯৪-৫

দ্বারা ছেদনীয়, এমনি ছিন্ন হয়ে তুমি শিবত্ব লাভ কর।) অমৃতীকরণের পর সিঁদুর গন্ধ পুষ্প দিয়ে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ছাগায় পশবে নমঃ' মন্ত্রে পশুর পূজা করেন। বাম হাতে যজ্ঞপশুকে ধরে মূলমন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রায় সাতবার প্রোক্ষণ করেন, পশুর দক্ষিণ কানে বলেন পশুগায়ত্রী, "পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর "(বীজ) কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায় নমঃ" মন্ত্রে খড়্গপূজা করেন, স্তবপাঠ করে প্রণাম করেন। যজ্ঞের পশুকে নীচে নিয়ে যাওয়া হয়। রবীন্দ্রের নরম মন। বৈষ্ণববংশে জন্ম, বাড়ীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। রবীন্দ্র আর্তনাদ করে ওঠেন: "এখানেই ওর দম আটকে যাবে—একটু দড়িটা ঢিলে করে দাও।" ছাগশিশুর 'ব্যাঁ ব্যাঁ' ডাক শুনে অভিভূত মাষ্টার মশাই জোরে ঘণ্টা বাজাতে সুরু করেন, যাতে ছাগশিশুর ডাক শুনতে না হয়। রাখালেরও মন খারাপ, তাই অন্য সকলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে তিনি মাষ্টারমশাইকে অনুযোগ করে বলেন: "আপনি কেন বারণ করলেন না?"

এদিকে অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অন্যতম তাপস তারক বলিদানের সময় তাপসদের মধ্যে যে দিব্যভাবের সঞ্চার হয়েছিল তা স্মরণ করে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট বলেছিলেন: "যজ্ঞে যে পশু ব্যবহার হয় তাতে আর পশুত্ব থাকে না। বরাহনগরে আমরা বলি দিয়ে পূজো করি। পশুর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন দেবতা ভাবনার পর আর তাকে পশু বলে বোধ হয় না—সত্যি বলছি ঠিক যেন দেবতা বলে বোধ হয়েছিল।"[২৩]

পশ্চিমের বাগানে বেলতলাতে[২৪] যূপদণ্ড স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, সারদা, তারক, হরিশ বুড়োগোপাল, মাষ্টার মশাই, রবীন্দ্র প্রভৃতি। কাঁসর ঘণ্টা বাজতে থাকে। একজন তাপস আবার খোল বাজাতে থাকেন।[২৫] ছেদক 'জয় মা' উচ্চারণ করে

২৩ শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, উদ্বোধন, পৃঃ ১৪০

২৪ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ খ্রীঃ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই বেলতলাতেই চার প্রহরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "বাবুরাম তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়া খোল বাহির করিয়া আনিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বলি হইয়া গেল, সব চুকেমুকে গেল। তার কয়েকদিন পরে সকলে বাবুরাম মহারাজকে ঠাট্টা শুরু করিল—'শ্যালা বৈরিগীর বিটকিলিমি, খোল বাজিয়ে বলি কর'।" (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের

বলিদান[২৬] করেন ও সমাংসরুধির দেবীকে নিবেদন করেন। হরিশের মনে খুব আনন্দ হয়, তিনি আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন।

বলিদানের পর শশী পূজার বাকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ব্যস্ত হন। সারদা-প্রসন্ন ধ্যান ঘরে গিয়ে গুরু-গীতা পাঠ করতে থাকেন। ঠাকুরঘরে গিয়ে বসেন তারক ও হরিশ। মাষ্টার মশাই তাঁদের নিকটেই বসেন। বলিদানে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তিনি ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে পারেননি।[২৭]

মাষ্টার মশাই নীচুগলায় তারককে জিজ্ঞাসা করেন: "এতে (বলিদানে) কি হয়?"

তারক: "কেন, কি হবে?"

মাষ্টার মশাই: "জ্ঞান না ভক্তি?"

তারক: "যারা নিষ্কাম কর্ম করে তারা কোন ফলই চায় না।"

মাষ্টার মশাই: "জ্ঞান ভক্তিও না?"

তারক: "না।"

মাষ্টার মশাই: "মাথায় সিঁদুর এসব দিয়ে··· ।"

হরিশ: "অমন হাতে প্রাণ গেল ওর মহাভাগ্য।"

মাষ্টার মশাই (হরিশকে): "তবুও বেলতলায় শিবের সম্মুখে বলিদান!"

হরিশ মাষ্টার মশাইকে চাপা গলায় বলেন: "এদিকের দরজাটা বন্ধ করুন।"

হরিশ যেন ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। মাষ্টার মশাই দরজা বন্ধ করলে হরিশ বলেন: "একথা কারুকেবলিনি—দেখলাম কালীঘর—দেখলাম মা কালী

ঘটনাবলী, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১১২) তাপস বাবুরাম অনুপস্থিত ছিলেন। মনে হয় অপর কেউ খোল বাজিয়েছিল।

২৬ স্বামী শিবানন্দজী বলেছিলেন: "আর একবার মঠেই স্বামীজী বলি হোম করেন—বলেন, 'ওসব লোভের খাওয়া টাওয়া হবে না'।" (শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, পৃঃ ১৪০)

২৭ শ্রীম বলেন: "যখন ছেলেবেলায় মার সঙ্গে কালীঘাটে যেতাম, সেখানকার পাঁঠাবলি দেখে মনে হত বড় হলে বলি তুলে দেব। পরে যতই বয়স হতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিরোধ করবার কারও সামর্থ্য নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ও হচ্ছে।" (স্বামী জগন্নাথানন্দ: শ্রীম কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন, জীবনী-অংশে উদ্ধৃত)

সরে দাঁড়ালেন না, তাঁর পা শিবের বুকে। আবার দেখি শিবই কালী হয়েছেন। 'যিনি শিব তিনিই কালী' এটা অনুমানের কথা নয়, প্রত্যক্ষ দেখলাম।" সেই সঙ্গে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনোপলব্ধির বিষয় উল্লেখ করেন।

মাষ্টার মশাই চুপ করে থাকেন। তাঁর স্মৃতিতে উদিত হয় পিঁপড়ে মারার ঘটনা, মা বাবাকে ত্যাগ করা সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি। তাঁর মনে পড়ে, ঠাকুর বলতেন যে, মোকদ্দমা জেতা, পাঁঠাবলি দেওয়া এসব তমোভক্তির লক্ষণ।২৮

একটু পরে মাষ্টার মশাই নীচে নেমে দেখেন কোমলহৃদয় রবীন্দ্র সিঁড়ির ধারে নির্জনে কাঁদছেন। মাষ্টার মশাই রবীন্দ্রকে নিয়ে নীচের ঘরে বসে কথা বলেন। বলিদানের জন্য রবীন্দ্রের প্রাণে আঘাত লেগেছে। মাষ্টার মশাই বলেন: "বলি একটি সাধনের অঙ্গ। শাক্তেরা বলিদান করেন। তবে সকলের ভাল লাগে না। কিন্তু তন্ত্রে আছে, দোষ নাই।"

রবীন্দ্রের মনে বিষম দ্বন্দ্ব। একদিকে শুভ সংস্কাররাশি, অন্যদিকে বারাঙ্গনার প্রতি আকর্ষণ। মাঝে মাঝে তাঁর শুভেচ্ছার উদয় হয়, আকাঙ্ক্ষা হয় নর্মদাতীরে বা অন্যত্র গিয়ে নির্জনবাস করেন। মাষ্টার মশাই তাঁকে অনুরোধ করেন মঠে বাস করে সাধুসঙ্গ করার জন্য। সরলপ্রাণ রবীন্দ্র খেদ করে বলেন: "আর সাধুসঙ্গ! ধ্যান করতে যাই, সেই মুখ মনে পড়ে! ঈশ্বরের নাম করতে যাই, সেই নাম করতে ইচ্ছা হয়।" মাষ্টার মশায়ের মনে পড়ে ঠাকুরের কথা, যখন ডাকাত পড়ে তখন পুলিসে কিছু করতে পারে না। ডাকাতি হয়ে গেলে পুলিসে এসে গ্রেপ্তার করে। মাষ্টার মশায়ের সব অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্র বারাঙ্গনার কাছে ফিরে যাবার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠেন, আবার বলেন: "আমি যেখানে যাই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি—আপনি বিশ্বাস করুন—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে মিথ্যা কথা কখনই কইবো না; পরোপকার করবো সাধ্যমতে; কাপড়চোপড়, আসবাব, বাবুয়ানা এ সব তাতে কখনও লিপ্ত থাকবো না।"

২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত; সে "দেখে মা পাঁঠা খায়, আর বলিদান দেয়।" (কথামৃত ২।১০।৪)। আবার তিনি বলেছেন: 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে। বিধিবাদীয় বলিতে দোষ নাই।" (কথামৃত ৫।৪।২)

রবীন্দ্র কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে মাষ্টার মশাই বলেন: "পরমহংসমশায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, তাঁর একটু গল্প বলুন।"

রবীন্দ্র: "প্রথম দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাই। তাঁকে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আপনি দূতী হতে পারেন? (অর্থাৎ ঘটকালি করে ঈশ্বরকে জুটিয়ে দিতে পারেন?) তিনি ঝাউতলা হতে এসে বললেন, 'তুই কি বলছিলি, দূতী হতে পার না কি?' তারপর লাটুকে বললেন, 'এর কি ভাব জানিস? বৃন্দে কৃষ্ণকে নিতে এসেছে—শ্রীমতীর কাছে নিয়ে যাবে। শ্রীমতীকে জুটিয়ে দেবে।'২৯ লাটুকে এই কথা বলতে বলতে পরমহংসদেবের ভাবসমাধি হয়ে গেল—একেবারে নিস্পন্দ দেহ—সমাধিস্থ।

"তারপরে বললেন, 'তোর দেরী হবে। তোর ভোগ আছে। ডাকাত যখন পড়ে, তখন পুলিস কিছু করতে পারে না। তারপর গ্রেপ্তার'।"

মাষ্টার মশায়: "তারপর?"

রবীন্দ্র: "তারপর সন্ধ্যার সময় পঞ্চবটীতে আমার জিভে তাঁর মুখামৃত আঙ্গুলে করে দিলেন ও জিভেতে কি লিখে দিলেন।"

মাষ্টার মশায়: "তারপর?"

রবীন্দ্র: "তারপর আমায় বললেন, 'তোর ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস আছে?' আমি বললাম, 'আছে'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দেবতা ভাল লাগে'?" রবীন্দ্র বলেন যে, দেবতার মধ্যে তাঁর প্রিয়তম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আর 'রাধা' নামটি তিনি ভালবাসেন। ঠাকুর তাঁকে ঐ নাম জপ করতে বলেন।

স্মৃতির কুঠরি উন্মোচন করে রবীন্দ্র আরও বলেন যে, তিনি 'বৃষকেতু' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ঠাকুর তাঁকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি সেবার ঠাকুরের কাছে তিনদিন বাস করেছিলেন। রবীন্দ্র লক্ষ্য করেন যে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব হয়। 'কেন এরূপ হয়', রবীন্দ্র

২৯ 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার পাদটীকাতে মাষ্টার মশাই লিখেছেন: "To understand the allegory it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the evangelist, and Krishna, of course the Deity. The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the song of Solomon is by the Christian priest."

—Grierson's Vidyapati.

জানতে চাইলে ঠাকুর বলেছিলেন : "কেন হয় জানিস ? আমি দেখতে পাই ঈশ্বরই এই জীবজগৎ হয়েছেন। তিনিই সব। যেন জগতের মা নাচছেন দেখতে পাই।"

এই কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মাষ্টার মশাই বিস্মিত হয়ে স্মরণ করেন ঠাকুরের উক্তি, অন্তর শুদ্ধ না হলে ভগবানের নামে বা চিন্তায় রোমাঞ্চ হয় না। মুগ্ধ মাষ্টার মশাই রবীন্দ্রকে বলেন : "তোমার মত শুদ্ধ দেখিনি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তোমাকে অত ভালবেসেছেন, আর হরিনামে তোমার রোমাঞ্চ হয়। তুমি আমার মাথায় বসবার উপযুক্ত।"

রবীন্দ্র জিভ কাটেন ও বলেন : "অমন কথা বলবেন না। আমি পাষণ্ড —এখনই হয়তো সেখানে যাব।"

"এঁরা (ত্যাগী তাপসেরা) তাঁর ভক্ত, আর এঁদের কৌমার বৈরাগ্য, এঁদের মত শুদ্ধাত্মা আর কোথায় পাবেন ?...এঁরা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী। আর তিনি এঁদের এত ভালবেসেছেন" ইত্যাদি বলে মাষ্টার মশাই রবীন্দ্রকে আবার অনুরোধ করেন কয়েকদিন মঠে বাস করার জন্য। রবীন্দ্র বলেন : "হাঁ, এঁরা মহাপুরুষ। আমি এঁদের প্রণাম করি।"

অনেকক্ষণ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে হোমানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর-ঘর হতে মাষ্টার মশাই ও রবীন্দ্রকে কয়েকবার ডাকা হয়েছে। সেসব ভুলে গিয়ে মাষ্টার মশাই সাগ্রহে রবীন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। এবার তাঁরা ঠাকুরঘরে গিয়ে বসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোম সমাপ্ত হয়। তারক উপস্থিত সকলের কপালে হোমতিলক দেন। নরেন্দ্র বেদ ও তন্ত্র পড়াশোনা করেছেন। তিনি মঠের ভাইদের হোমের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে বলেন।

বুড়োগোপাল মন্তব্য করেন : "দেবতারা কেবল হোমেই তুষ্ট।"

রবীন্দ্র : "আর কিছুতে না ? যদি কেউ পরোপকার করে, তাতে কি তাঁরা তুষ্ট হন না ?"

বুড়োগোপাল : "তাঁরা উপকার, অপকার কিছু চান না।"

ভোগারাত্রিকের পর সকলে একত্রে আনন্দ করে প্রসাদ ধারণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই, রবীন্দ্র ও হরিশ পশ্চিমের বাগানে মালীর বেঞ্চের উপর বসে কথাবার্তা বলেন।

হরিশ স্মৃতি উদ্ঘাটন করে বলেন : "পঞ্চবটীতে তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম একবার আমায় সেই ঈশ্বরের রূপ দেখান।"...

মাষ্টার মশাই : 'তিনি কি বললেন ?"

হরিশ : "তিনি নিজের সেই মানুষমূর্তি দেখিয়ে বললেন, 'এই ত্থাখ।' কাটাবার জন্য আমায় ঐ কথা বললেন, কিন্তু ক্রমে আমার শরীর যেন কাঠের মত হয়ে গেল। আমায় একজন কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, 'একে চিনির পানা খাওয়া।' লাটুকে বললেন, 'একে নাইয়ে নিয়ে আয়।' আমার তখন হুঁশ হয়েছ আর লজ্জা হয়েছে। আমি আপনি নাইতে গেলাম।"৩০ কিছুক্ষণ পরে হরিশ গান ধরেন :

"বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে,
বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে,
গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম শিক্ষা দিলে,
ভবার্ণবে নিজে হলে কাণ্ডারী" ইত্যাদি।

সে-সময়ে তিনজনেই বোধ করি শ্রীগুরুর ভাবনায় মশগুল। তারপর রবীন্দ্র আপনাআপনি গান ধরেন :

"হরি আপনি এসে যোগীবেশে করেছ নাম সঙ্কীর্তন।
প্রেমের হরি প্রেমে করেছ নাম বিতরণ ॥" ইত্যাদি।

বিকালবেলা মাষ্টার মশাই ও রবীন্দ্র গঙ্গার ধারে মল্লিকের ঘাট, পরামাণিকের ঘাটে বেড়িয়ে মঠে ফিরে দেখেন 'দানাদের ঘরে' নরেন্দ্র গান গাইছেন। রবীন্দ্রের অনুরোধে নরেন্দ্র 'পীলে রে অবধূত হো মতবারা, প্যালা প্রেম হরিরসকা রে' ইত্যাদি গানটি গান।

সন্ধ্যার পূর্বে রাখাল ও মাষ্টার মশাই বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে গল্প করেন। মাষ্টার মশাই বলেন যে রবীন্দ্র বলির সময় সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুব কেঁদেছিল। রাখালের ব্যথিত হৃদয়তন্ত্রীতে যেন টান ধরে। রাখাল বলেন : "নরেন্দ্র সাধকের ভাবে করেছেন। কিন্তু আমারও মন কেমন করছিল। রবীন্দ্রের ভাব আমি একটু বুঝেছিলাম—নরেন্দ্রকে বলেওছিলাম। আপনি একবার নরেন্দ্রকে বলবেন।"

ঠাকুরঘরে আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। ভক্তেরা সমস্বরে গাইছেন : 'জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব হর হর মহাদেব ॥" শশী ভাবোন্মত্ত হয়ে আরাত্রিক করেন।

৩০ শ্রীযুত মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ১৮৭।

রাত্রে আহারাদির পর পানের ঘরে হাস্যরসের ফোয়ারা ছোটে। পানের ঘর দানাদের ঘরের উত্তরে ও রান্নাঘরের পশ্চিমে। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন শশী, তারক, বুড়োগোপাল ও মাষ্টার মশাই। দেখা গেল বুড়োগোপাল নাচছেন। তারক মাষ্টার মশায়ের গলা ধরে সহাস্যে নেচে নেচে বলছেন: "মাষ্টার মশাই, আপনাকে কেউ চিনলে না!" আমুদে তারকনাথের কাণ্ড দেখেশুনে সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

পরদিন বুধবার। সকালবেলায় জানা যায় যে গত রাত্দুপুরের পর রবীন্দ্র পালিয়েছেন। রবীন্দ্রের জন্য সকলেই দুঃখিত। নরেন্দ্র বলেন: "মহামায়ার অনুগ্রহ না হলে কার সাধ্য রাখে?" শশী বলেন: "তুমি বুঝিয়ে রাখতে পারলেনা?"

নরেন্দ্র: "ওরে, বুঝিয়ে তর্কের দ্বারা কি মানুষকে রাখা যায়? তিনি কি আমাদের তর্কের দ্বারা বশ করেছিলেন? তিনি ভালবাসার দ্বারা বশ করেছিলেন।"

তাঁদের মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসার মোহিনী শক্তির কথা। কাশীপুরে ঠাকুরের পীড়া শুনে হীরানন্দ ছুটে এসেছিলেন সুদূর সিন্ধুদেশ হতে। ঠাকুর তাঁকে বড় স্নেহ করতেন। তাঁর বালকের মত মধুর স্বভাব দেখে ঠাকুর একদিন তাঁর মুখে চুমো খেয়েছিলেন। শশীর মুখে এই ঘটনা শুনে নরেন্দ্র বলেন: "আমায় রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা করছিল, দশ বছরের অভ্যাস যায় কিনা? অভ্যাসের দ্বারা একটা tendency হয়। অনেকবার একটা কাজ করতে করতে tendency জন্মায়।"

কিছুক্ষণ পরে দানাদের ঘরে কয়েকজন সমবেত হন। নরেন্দ্র রাখাল শশী ও মাষ্টার মশাই রবীন্দ্রের সম্বন্ধে কথা বলেন। হরিশ একটু দূরে শুয়ে ছিলেন। মাষ্টার মশাই রাখালের ইঙ্গিত অনুসরণ করে নরেন্দ্রকে বলেন: "(রবীন্দ্র) বলছিল, এঁরা মহাপুরুষ, আমি প্রণাম করি। তবে বলিদান দেখলে আমার প্রাণ কাঁদে।"

রাখাল (মাষ্টার মশায়ের প্রতি): "আর কি বলেছে, এখানকার চেয়ে আমার বাড়ী ছিল ভাল।"

মাষ্টার মশাই: "হাঁ বলেছে বটে, সেখানে নির্জন, জনমনুষ্য আসে না। সেখানে বেশ ঈশ্বর চিন্তা হয়।"

এমন সময় শশী মন্তব্য করেন: "আমাদের কর্মকাণ্ডটা উঠে যায় তো বেশ হয়।"

রাখাল (নরেন্দ্রের প্রতি) : "আচ্ছা, তোমার সমস্ত দিনের ভিতর কি একবারও মন খারাপ হয় নি ?"

নরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলেন : "সাধনের জন্য মানুষ কাটতে পারা যায়। (সকলের হাস্য) খাবার জন্য কাটা আলাদা কথা।"

মাষ্টার মশাই : "আচ্ছা নরেন্দ্রবাবু[৩১], আর কখন এরকম বলি হয়েছিল ?"

নরেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন : "সাধনের জন্য এই first আর এই last।"

৩১ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন : বরানগরের মঠে পরস্পরকে নাম ধরে বা বাবু বলে ডাকা হত। যার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, যেমন সাধারণে পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া থাকে সেইরূপই হ'ত।…'মহারাজ' শব্দটা আলমবাজার মঠের শেষকালে বা বেলুড় মঠে হয়েছে। (মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, পৃঃ ৪৬-৪৭)